শত-জীবনী

বসাক এণ্ড স
১২৭ নং মসজিদ্ বাড়ী
কলিকাতা

বিবাহে ও প্রিয়জনকে

উপহার—

দিবার—

শ্রেষ্ঠ—

উপযুক্ত—

গ্রন্থ

মূল্য দুই টাকা



বসাক এণ্ড সন্স
১২৭, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শত-জীবনী

মহাপুরুষ সাধক ভক্ত ও

আদর্শ ব্যক্তিগণের

শতাধিক জীবনী-সংগ্রহ

শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক

সম্পাদিত

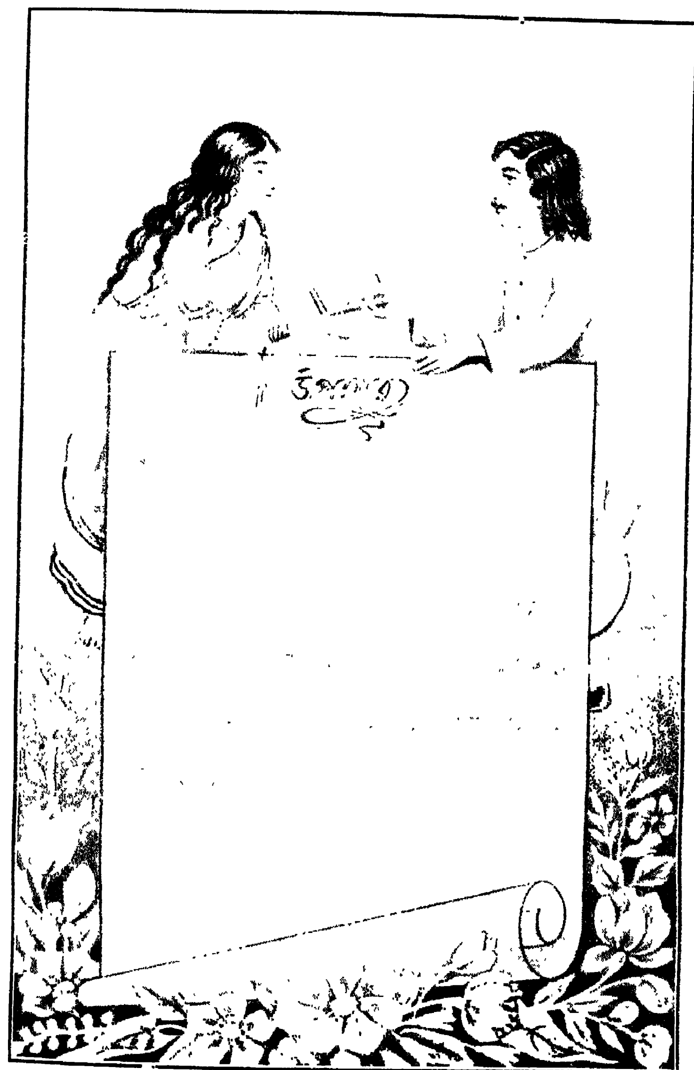


তৃতীয় সংস্করণ

১৩৩৫

PUBLISHER—Chandi Charan Basak
Printer—Mahesh Chandra Patra
BASAK PRESS
127, Musjid Bari Street—*Calcutta.*

এই পুস্তক বহু মূল্যবান
দীর্ঘকালস্থায়ী য়্যান্টিক
কাগজে মুদ্রিত
হইল



Translation—quotation—
copy-right reserved.

প্রথম খণ্ড

মঙ্গলাষ্টকম্

বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালা-বিভূষিতম্।
শ্রীদামদামসুবলস্তোককৃষ্ণার্জ্জুনাবৃতম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্।



যমুনা-পুলিনে

আত্ম-নিবেদন

যাঁহার অমৃতোপম মধুর উপদেশাবলী বাল্য-জীবনে হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির বীজ রোপণ করিয়াছিল—যাঁহার অগাধ স্নেহ-সিন্ধু এই মাতৃ-হীন নীরস জীবনকে মধুময় ও সরস করিয়া রাখিয়াছে—সর্ব্বোপরি যাঁহার সাহিত্য-সেবার উচ্চ আদর্শ প্রথম যৌবনে মুকুলিত হইয়া এই আলস্য-বিড়ম্বিত জীবনকে কর্ত্তব্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে—জ্ঞান-সঞ্চারের পরক্ষণ হইতেই যাঁহাকে একমাত্র সাহিত্য-প্রচার-ব্রতে ব্রতী দেখিতেছি—যিনি শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া সাহিত্য-জগতে কতকগুলি অমূল্য-রত্ন স্থাপন করিয়াছেন—বাণীর বরপুত্র রূপে যিনি অনেক গুলি লুপ্তরত্ন সুপ্ত অবস্থা হইতে সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন——সেই পূজনীয় পিতৃদেবের মহৎ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার বড় স্নেহের "চণ্ডী" জীবনের প্রথম উদ্যম "শান্ত-জীবনী" তাঁহার পবিত্র-নামে উৎসর্গ করিয়া তুচ্ছ জীবনকে ধন্য করিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক

উৎসর্গ

অযাচিত স্নেহে যাঁর বর্দ্ধিত শরীর
অপার্থিব ভালবাসা মমতা অপার—
অসীম করুণারাশি কতই মধুর
প্রবাহিত হৃদয়ের পরতে পরতে—
উপদেশ-বাণী যাঁর ধ্রুব-তারা সম
আশ্বাসিছে অহর্নিশি কর্ত্তব্যের পথে—
কল্যাণের চিরতরে সন্তানের যাঁর
কামনা বাসনা কত কতই ভাবনা—
দেবোপম সৌম্য শান্ত পবিত্র মূরতি
এখন জাগায়ে দেয় পড়িলে তুফানে—
পরম আরাধ্য সেই পিতার উদ্দেশে
অর্পিলাম গ্রন্থ খানি নমি শ্রীচরণে।

চণ্ডী——



পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাক

সূচী

মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তগণ

প্রথম খণ্ড

সূচী

সূচী

পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ

দ্বিতীয় খণ্ড

আদর্শ ব্যক্তিগণ

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচী

সূচী

সরল পদ্যে

গীতা-রত্নামৃত

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন-অনুবাদিত

মূলের অবিকল পদ্যানুবাদ—অতি সরল—অতি প্রাঞ্জল। ছন্দ-পতন বা যতি-পতন একটীও নাই। অল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেও সহজে বুঝিতে পারেন। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত হাফটোন চিত্রে "বিশ্বরূপ-দর্শন"—"কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ"—"দ্বাদশ আদিত্যে শ্রীবিষ্ণু"। ছাপা কাগজ মনের মতন, স্বর্ণাক্ষরে সিল্ক বাঁধাই—নামমাত্র মূল্য ॥৵০ দশ আনা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, এম, এ, বেদান্তভূষণ, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"পদ্যে গীতার অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। গদ্যেও অনেক স্থলে অর্থ-প্রকাশ এত স্পষ্ট হয় না। ছন্দের লালিত্য ও ভাষার সরলতা একাধারে বর্ত্তমান।"

বসাক এণ্ড সন্স
১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শত-জীবনী

বুদ্ধদেব

নেপাল রাজ্যের মধ্যে কপিলবাস্তু দেশে শাক্যবংশে এই বিশ্বপূজ্য মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহার অলৌকিক প্রতিভা কাম-ক্রোধাদি রিপুদমন ও অমানুষিক ত্যাগস্বীকার দর্শনে একদিন সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া শাক্যবংশীয়েরা তাঁহার শাক্যমুনি ও শাক্যসিংহ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু-রাজার বংশ হইতেই শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। পুরাকালে অযোধ্যানগরে সুজাত নামে জনৈক ইক্ষাকু-বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ নামক পাঁচ পুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্যা ছিল।

রাজা সুজাত জেন্তী নাম্নী কোন বিলাসিনীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করেন এবং তাহারই ফলে জেন্তীর গর্ভে 'জেন্ত' নামক এক পুত্র জন্মে। জেন্তীর গর্ভজাত বলিয়া সকলেই উহাকে জেন্ত বলিয়া

আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীরে একপ্রকার ব্রণ উৎপন্ন হইয়া তিনি জন-সমাজে ঘৃণার পাত্র হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ শকটারোহণে তাঁহাকে হিমালয় পর্ব্বতস্থিত একটী গুহার নিকট লইয়া নানাবিধ খাদ্য, পানীয়, শয্যা, কম্বল প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক গুহার মধ্যে রাখিয়া, গুহার মুখ কাষ্ঠ ও বালুকা দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করতঃ কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। গর্ত্তের দ্বার রুদ্ধ থাকায় উষ্ণতা প্রযুক্তই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, কয়েক দিবসের মধ্যেই তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য ও শরীর নির্ব্রণ হইয়া অমিতা অমানুষিক সৌন্দর্য্যলাভ করিলেন। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া একদা একটী ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া গর্ত্তের মুখস্থিত বালুকারাশি পদদ্বারা অপসারিত করিতে লাগিল। এই গুহার সন্নিকটে কোল নামক এক রাজর্ষি বাস করিতেন। তিনি ফল মূল আহরণার্থ তথায় উপস্থিত হওতঃ ব্যাঘ্রকে ঐরূপ বালুকারাশি অপসারিত করিতে দেখিয়া বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তিনি গুহার নিকটবর্ত্তী হইলে ব্যাঘ্র ঋষি-প্রভাবে সভয়ে পলায়ন করিল। ঋষি গুহামুখস্থিত কাষ্ঠখণ্ডগুলি অপসারিত করিয়া, সেই পরমা সুন্দরী শাক্য-কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" অমিতা প্রত্যুত্তরে আমূল বিষয় সকল সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। তাঁহার সেই দেবদুর্ল্লভ অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঋষির অন্তঃকরণে উৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হইল। কাষ্ঠ-মধ্যে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় চির-ব্রহ্মচারীর হৃদয়েও আসক্তি দেদীপ্যমান ছিল। তাই আজি শাক্য-কন্যার সহযোগে রাজর্ষি ধ্যান,

জ্ঞান, অভিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুশীলনে তৎপর হইলেন।

রাজর্ষি শাক্য-কন্যাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আশ্রমস্থলে লইয়া গেলেন। ক্রমে এই কোল ঋষির ঔরসে ও শাক্য-কন্যা অমিতার গর্ভে যমজক্রমে ৩২টী পুত্র জন্মে। পুত্রদের বয়োবৃদ্ধি হইলে অমিতা তাহাদিগকে কপিলবাস্তু নগরে যাইতে আদেশ করেন ও তাহাদের মাতামহ বংশ মহৎবংশ; অমুক শাক্য আমার পিতা,—তোমাদের মাতামহ, অমুক আমার ভ্রাতা এবং পুত্রদের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিয়া কপিলবাস্তু নগরে প্রেরণ করেন। পুত্রগণ কপিলবাস্তু নগরে উপস্থিত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে শাক্যগণ সাদরে তাহাদিগকে আহ্বান ও প্রভূত ধনরত্ন দান করেন। শাক্য-কন্যাদের সহিত ইহাদের পরস্পর বিবাহ সম্পন্ন হইল। কুমারগণ কোল ঋষির ঔরসজাত বলিয়া উহাদের বংশ "কোলীয়-বংশ" নামে খ্যাতিলাভ করে।

কপিলবাস্তু নগরের সন্নিকটে 'দেবদহ' নামক গ্রামে শাক্য-বংশীয় সুভূতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজা বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোলীয় বংশীয় কোন কন্যার সহিত সুভূতির পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহারই গর্ভে মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চূলীয়া, কোলীসোবা ও মহাপ্রজাবতী নামে সাতটী কন্যা জন্মে। রাজা সিংহ-হনুর পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুদ্ধোদন কপিলবাস্তুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি উক্ত দেবদহের রাজা সুভূতির প্রথমা কন্যা মায়া ও কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।

উক্ত শাক্য-বংশীয় শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও কোল-বংশীয় ভার্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে এই বিশ্বপূজ্য মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন মায়াদেবীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একদণ্ডও তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। মায়াদেবীও এতাদৃশ অশেষ সদ্‌গুণালঙ্কৃত স্বামী পাইয়া সতত তাঁহার পদসেবায় ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। মহারাজ শুদ্ধোদন সর্ব্বগুণশালিনী পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকিতেন। বিবাহের দ্বাদশবর্ষ পরে মায়াদেবী গর্ভবতী হইয়া ক্রমে পূর্ণগর্ভা হন। তদনন্তর মায়াদেবী পূর্ণগর্ভাবস্থায় পিত্রালয়ে গমনকালীন পথিমধ্যস্থিত লুম্বিনী নামক উপবনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, উহা পরিদর্শনার্থে সেই স্থানে অবতরণ করেন ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে, গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। অনন্তর তথায় বৃক্ষমূলে শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমা তিথিতে এই বিশ্ব-পূজ্য মহাপুরুষকে প্রসব করেন। খৃষ্টীয় প্রায় ৫০০ অব্দের পূর্ব্বে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্তর্নিবিষ্ট।

পুত্রমুখ দর্শনে শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুত্রের নাম সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তম দিবসে মায়াদেবী মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। অতঃপর সিদ্ধার্থের প্রতিপালনের ভার তাহার মাতৃষ্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হইল।

রাজা শুদ্ধোদন, পুত্রের জাত-কর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। পুত্রের

লক্ষণ-দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন রাজ-জ্যোতিষীদিগের দ্বারা পুত্রের জাতকোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়া, তদীয় অলৌকিক ভবিষ্য-জীবন জ্ঞাত হইলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সংসার-ত্যাগের বিষয় অবগত হইয়া, সাতিশয় দুঃখিত হওতঃ তৎপ্রতি-বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন পৃথিবীতে এই মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন, সেই সময় এই জগতে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সহসা সমস্ত বিশ্ব কি এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইল, সুস্নিগ্ধ সমীরণ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবলোক হইতে সুস্বর-লহরী আসিয়া মর্ত্ত্যলোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থের আগমনে সমস্ত বিশ্ব যেন শান্তি-সলিলে ভাসমান হইল। রাজা, রাজ-কুমারের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহাকে এক প্রমোদ উদ্যানের মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন ও চিত্ত-বিনোদনার্থ যাবতীয় মনোরঞ্জনকারী আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়া দিলেন। কিন্তু ভবিতব্য কে পরিবর্ত্তন করিবে! কুমার একদা রাজাজ্ঞা লইয়া নগর ভ্রমণে সারথিসহ বহির্গত হইলে নগরে বৃদ্ধ, রুগ্ন, শব এবং সন্ন্যাসী দর্শন করিলেন।

বৃদ্ধের পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত, হস্তপদাদি শিথিল ও অর্দ্ধভঙ্গ দেহ দেখিয়া সারথিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলেন যে, বার্দ্ধক্যে অর্থাৎ শেষ জীবনে মনুষ্যের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। রুগ্ন অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তি রোগের ভীষণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ও হা-হুতাশ করিতেছে দেখিয়া, কারণ অবগত হইয়া জানিলেন, ব্যাধির ভীষণ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায়, ঐ ব্যক্তি ঐরূপ করিতেছে।

ইহাতে বুঝিলেন; মনুষ্যমাত্রেই সকলকেই একদিন না একদিন ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইবে। ঐরূপ শব ও সন্ন্যাসীর বিষয়ও অবগত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ সকলের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল; ভাবিলেন—সকলই মায়া, বিলাস ক্ষণিক, সংসার অসার। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার কিছুই অবগত নন, সংসার-কারাগারে আবদ্ধ। বৈরাগ্য বাহ্যাড়ম্বর নহে, বৈরাগ্য যশের জন্য নহে, উহা প্রাণের জিনিষ। বৈরাগ্য মহান্ অন্তঃকরণরূপ উর্ব্বরা ভূমিরও জ্ঞান-বৃক্ষের সুপক্ক ফল।

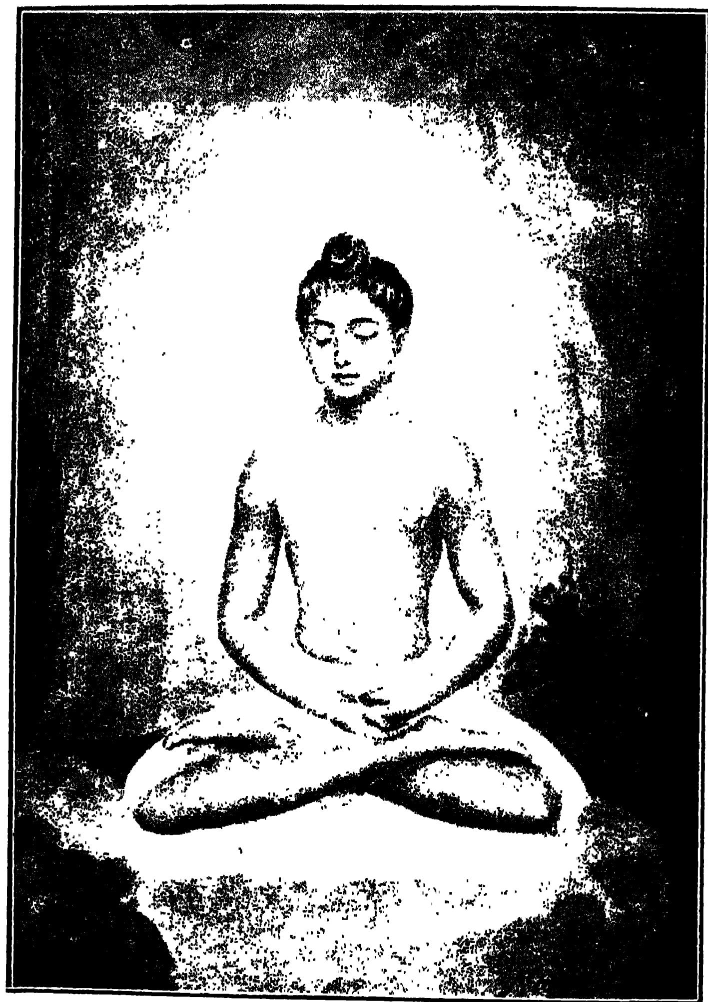
যখন সংসারের সকল পদার্থই অনিত্য ও অস্থায়ী; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-স্বজন কেহই সঙ্গের সাথী নয়; তখন কিসের মায়া, কিসের মমতা, কিসের স্নেহ; আমি সকলই জলাঞ্জলি দিয়া ঐ পথের পথিক হইব। ঐ সন্ন্যাসীর মত হইতে পারিলে মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে। ইনি পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-বাসনা, ভোগ, বিলাস সকলই পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এইরূপ নানা চিন্তায় বিবিধ বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। সিদ্ধার্থের তীব্র বৈরাগ্য কে রোধ করিবে? তিনি বিপুল বিভব সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একদা রজনীযোগে পিতা, পত্নী, নবজাত কুমার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী-বেশে বহির্গত হইলেন

কা'ল যিনি রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন, আজ তিনি স্বইচ্ছায় রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নী এবং নবজাত সুকুমার সকলই পশ্চাতে রাখিয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। পরে তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তী বৈশালী নামক নগরে উপস্থিত হইয়া রুদ্রক নামক জনৈক ঋষির শিষ্য হন ও তাঁহারই নিকট শাস্ত্র ও যোগশিক্ষা করিয়া পাঁচ জন শিষ্যসহ গয়াজেলাস্থ উরু-বিল্ব নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তথায় ছয় বৎসর কাল ঘোরতর কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। অনন্তর কাশীর সন্নিকটস্থ সারনাথ নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও বহুশিষ্য সংগ্রহ করেন, এমন কি মহারাজ বিম্বসার ও তাঁহার শত সহস্র প্রজা উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এইরূপে অচিরে সিদ্ধার্থের নাম দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আত্মার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সুখ, দুঃখ, ইন্দ্রিয় ও ইচ্ছার গতি অতিক্রম করিয়া বোধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ "বুদ্ধ" হইলেন।

বুদ্ধদেব মগধে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পিতার চরণ দর্শনোদ্দেশে কপিলবাস্তুতে পুনরাগমন করেন এবং তথায় পিতৃদত্ত একটী মঠে থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ ও যোগশিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাজবাটীর অনেকেই এবং রূপে গুণে অতুলনীয়া তদীয় ভার্য্যা "গোপাও" এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

তিনি বর্ষাকালে ন্যগ্রোধ মঠে থাকিয়া ও অবশিষ্ট আট মাস

(শীত, গ্রীষ্মে) দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতেন। বৌদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, এই বিশ্ব-সংসার তাঁহাদিগের মতে একত্রিংশ লোকে বিভক্ত। ঐ সকল লোক উপর্য্যুপরি অবস্থিত। নরক, আসুরিক, প্রেত ও পশুলোক নামক চারিটী দণ্ড লোক অর্থাৎ উপরোক্ত একত্রিংশ লোকের মধ্যে এই চারিটীতেই কুকর্ম্মহেতু দণ্ড ভোগ হইয়া থাকে। এই দণ্ড লোক চতুষ্টয়ের উপর নরলোক স্থাপিত, তদুপরি ছয়টী স্বর্গ। রূপনামে স্বর্গের উপরেও ষোড়শটী লোক আছে। এই স্থানবাসীই ব্রহ্মলোকবাসী বলিয়া খ্যাত। ইহারা সকলেই নিষ্পাপ। এই ষোলটী রূপলোকের উপর চারিটী অরূপ লোক। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরোক্ত ছয় স্বর্গের মধ্যে চতুর্থ স্বর্গের নাম তুষিত। পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে বুদ্ধ এই তুষিতস্বর্গে অবস্থিত ছিলেন। এই ধর্ম্মের মূলমত পুনর্জ্জন্মবাদ। মনুষ্যদিগের কর্ম্মের ফলাফল দেখিয়া, তাহাদের জন্মের বিভিন্ন ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভাল কর্ম্ম করিলে ভাল জন্ম এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ জন্ম হয়। যতদিন না পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ফল সকল পুণ্যানুষ্ঠানে ধৌত হয়, ততদিন মনুষ্যকে এই প্রকারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন থাকিতে হয়। নির্ব্বাণই জীবের শেষ অবস্থা। নির্ব্বাণ হইলে লোক জন্ম-মৃত্যু হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়। অনেকে জৈনদিগকেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মধ্যে গণনা করেন। জৈনদিগের মতে সম্ভাব্য পদার্থ সাত প্রকার। যথা ;—(১) ভাব, (২) অভাব, (৩) ভাবাভাব, (৪) নির্লক্ষণ, (৫) নির্লক্ষণ ভাব, (৬) নির্লক্ষণ অভাব এবং (৭) নির্লক্ষণ



বুদ্ধদেব

পৃঃ—২৭

ভাবাভাব। এই হেতু সাধারণ জৈনদিগকে সাতবাদী অর্থাৎ সপ্ত-বাদী ও সপ্তভঙ্গি কহিয়া থাকে।

বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধদেব ৫০৬ বার বিবিধ আকারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের মতে স্ত্রী-লোকেরা কখন বুদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি ৫০৬ বারের মধ্যে একবারও স্ত্রী-রূপে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। ইহাতেই একপ্রকার বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার ধর্ম্ম একান্তই স্ত্রী-জাতির বিরোধী। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমধর্ম্ম!" সেই সময় যজ্ঞে পশুহনন ও অন্যান্য নানা তামসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া, বুদ্ধের করুণ হৃদয়ে দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি রাজার পুত্র হইয়া সমস্ত ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবের দুর্গতি বিনাশের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হীনবেশে পর্য্যটন করিয়া, অহিংসা পরমধর্ম্ম ও নির্ব্বাণমুক্তির পন্থা প্রচার করিয়া লোক-বিশ্রুত হন। এখনও জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক এই মতাবলম্বী। বুদ্ধদেব বাল্যকালে নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া, যৌবনের প্রারম্ভে পিতা শুদ্ধোদনকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঊনিশ বৎসর বয়সে শাক্যবংশোদ্ভবা দণ্ডপাণির কন্যা গোপানাম্নী পরমাসুন্দরী কুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর কিছু-দিন সংসারে অবস্থিত থাকিয়া, যখন ইহাকে ক্ষণভঙ্গুর, নশ্বর ও অশান্তির আলয় জ্ঞান করিলেন, তখন অতুল ভোগৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধব সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করণানন্তর ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ

করিলেন। পুরবাসী সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র "রাহুল" জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই মহাপুরুষ নানাস্থান পর্য্যটনানন্তর বুদ্ধ গয়াধামে কিছুকাল যোগ-সাধনা করেন;—তথায়ও মনের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, অনশনে দীর্ঘকাল-ব্যাপী ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া পূর্ণানন্দে মাতিয়া জগতে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই অখণ্ডনীয় জ্বলন্ত সত্য প্রচার করিতে করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুশী-নগরের কোন শালবৃক্ষের তলদেশে উদরাময়রোগে স্ব-স্বরূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, মগধরাজ অশোক ২৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ৬৪০০০ হাজার বৌদ্ধ-যাজকের ভরণ পোষণের ভার লইয়াছিলেন এবং ৮৪০০০ হাজার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে সিংহলদ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপ, তিব্বত, মধ্য এসিয়ার দক্ষিণাংশ, চীন, কোরিয়া, জাপান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম সবিস্তার প্রচারিত হয়।

শাক্যবংশের রাজকুলে সমুদ্ভূত হইয়া বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ, বৃক্ষ-তলে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ও বৃক্ষতলে বসিয়াই নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া জগতে নির্ব্বাণ-মুক্তির পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জগতে "ধর্ম্ম" এই মহাবাক্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নাম সমগ্র পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে।

জৈন-সম্প্রদায়—জিন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতাবলম্বী জাতি। কোন কোন পুরাণে জৈনধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়, এজন্য বোধ হয় জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং ইহা হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। এই ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ৮।৯ শতাব্দীতে উন্নত ছিল। জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র; কিন্তু ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের অনেক সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দিগম্বরেরা এক্ষণে আহারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহাদের ধর্ম্মমতসম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রথমতঃ কল্প-সূত্র ও আগম এই দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়তঃ একাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, চারি মূলসূত্র, পঞ্চকল্পসূত্র, ছয়ছেদ্দ, দশপয়ন্ন, নন্দী-সূত্র, অনুযোগ দ্বারসূত্র। গ্রন্থগুলির কতকগুলি টীকা, নিরুক্ত, চূর্ণী ও ভাষ্য এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম পঞ্চাঙ্গসূত্র। তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ও কতক-গুলি মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই সকল গ্রন্থে ৬০০০০০ শ্লোক আছে। ইহারা জিনের উপাসনা করে। জৈনেরা যুগকে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; অর্থাৎ যখন উত্তম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কালের অবস্থা অতি অধম হয়, তখন অবসর্পিণী শেষ হইয়া উৎসর্পিণী আরম্ভ হয় ও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়; এবং ক্রমে অত্যুত্তম হইলে, আবার অবসর্পিণী আরম্ভ হয়। এই দুই বিভাগের প্রত্যেক ভাগে ২৪ জন করিয়া জিন বা তীর্থঙ্কর, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নয় বলদেব,

নয় বাসুদেব এবং নয় প্রতি বাসুদেব আবির্ভূত হন। জৈনেরা বলে জগতের লয় নাই। ইহাদের মতে মনুষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; নিত্য-সিদ্ধ, মুক্তাত্মা ও বুদ্ধাত্মা। ইহাদের পাঁচটী প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য আছে, যথা—

১। বধ করিও না বা ক্লেশ দিও না।

২। মিথ্যা বলিও না।

৩। চুরি করিও না।

৪। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হও।

৫। অনুপযুক্ত আশা করিও না।

ইহারা কোন কোন হিন্দু দেবতার পুজা করে। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা বলে, জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। অধোগতি (নিম্নলোক) ইহার উপর সপ্ত-নরক ও তদুপরি দশপাবন লোক, তদুপরি পৃথিবী, তদুপরি জ্যোতির্লোক, এই দুয়ের মধ্যে ব্যন্তরলোক ও বিদ্যাধরলোক। জ্যোতির্লোকের উপর ষোড়শ দেবলোক, তদুপরি অহমিন্দ্রলোক, সর্ব্বোপরি মোক্ষলোক। এই স্থানে অনাদিচিত্ত পরমেষ্ঠী অবস্থান করেন। জৈনদিগের সংযম প্রসিদ্ধ। জীবের প্রতি দয়াও তাহাদের যথেষ্ট। এমন কি, জীবহত্যা ভয়ে তাহারা মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া কথা বলে, পিপীলিকাকে আহার দেয়, পিঠ পাতিয়া ছারপোকার কামড় সহ্য করে ; ইত্যাদি অনেক প্রকার অহিংসার পরিচয় এই ধর্ম্মে পাওয়া যায়।

ধ্রুব

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। এই উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুই মহিষী ছিল। দুইজনের মধ্যে সুরুচিই রাজার অধিকতর প্রিয়া ছিল। তাঁহারই প্ররোচনায় রাজা সুনীতিকে বনবাস দেন। একদা রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া ঘটনাক্রমে সুনীতির কুটীরে উপস্থিত হন। তথায় রাজসহবাসে সুনীতির গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভেই ধ্রুবের জন্ম হয়। তৎপরে একদা সুরুচির পুত্র রাজার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিল, তদ্দৃষ্টে ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তদীয় বিমাতা সুরুচি, ধ্রুবের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তিরস্কারচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "বৎস! এই উচ্চাভিলাষ ত্যাগ কর। তুমি হীনা সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের তুমি উপযুক্ত নহ। মৎপুত্র উত্তমই এই স্থানের উপযুক্ত।" ধ্রুব, বিমাতার এই কঠোর বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, জননীসকাশে গমন করিবামাত্র সুনীতি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার অবমাননা করিয়াছে?" ধ্রুব তখন মাতৃ-সমীপে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সুনীতি ইহা শুনিয়া পুত্রকে কহিলেন, "বৎস! সুরুচি যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। তুমি অভাগিনীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমিও অভাগা। সুরুচি অনেক পুণ্য করিয়াছে, এজন্য

সে রাজার অতি প্রিয়। তুমি এখন যে অবস্থায় আছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। যদি সুরুচির বাক্যে তোমার ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" ধ্রুব শুনিয়া মাতাকে কহিল, "মাতঃ! বিমাতার বাক্য এখনও আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। আমি অন্য কোন স্থান প্রার্থনা করি না; এরূপ স্থান আমি প্রার্থনা করি, যে স্থান আমার পিতারও দুর্লভ।" কথিত আছে, একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিতা হইলে ধ্রুব, হরি-পদ-প্রাপ্তির আশায় গৃহ ত্যাগ করে। ধ্রুব গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যপথে ক্রমাগত পূর্ব্ব-দিকে গমন করিতে করিতে, কুশাসনে উপবিষ্ট সাতজন মুনিকে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদনানন্তর কহিল, "আমি উত্তানপাদ-তনয়, সাতিশয় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াই আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম।" মুনিগণ কহিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম চারি অথবা পাঁচ বৎসর হইবে, তোমার শরীরও নির্ব্যাধি। অতএব এই নির্ব্বেদের কারণ ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" মুনিগণ তখন ধ্রুব-প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "তোমার অভিলাষ কি আমাদিগকে বল।" ধ্রুব কহিলেন, "আমি অর্থ বা রাজ্যপ্রার্থী নহি। আমি এমন একটী স্থান প্রার্থনা করি, যে স্থান অপরের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। আপনারা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ দিন্, যাহাতে আমি শীঘ্র ঐ স্থান লাভ করিতে পারি।" ধ্রুব যে সকল মুনিগণের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিল, তাঁহারা সপ্তর্ষি। অতঃপর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে

ধ্রুবকে বিষ্ণুর আরাধনার জন্য উপদেশ দিলেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

"হিরণ্যগর্ভপুরুষ-প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান-স্বভাবিনে॥"

ধ্রুব এই মন্ত্র লাভ করতঃ ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বপাপ-নাশক যমুনাতীরস্থ মধুনামে এক পুণ্য বনে গমনানন্তর অনন্যকর্ম্মা হইয়া, ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করিল। শত্রুঘ্ন মধু রাক্ষসের পুত্র লবণ-রাক্ষসকে এই স্থানে বধ করিয়া মথুরা নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ধ্রুবের কঠোর তপস্যার ফলে নদ, নদী, সমুদ্র ও সকল পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। এমন কি, ইন্দ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্ত বালক ধ্রুবের এই কঠোর তপোনুষ্ঠানদর্শনে ভীত-চিত্তে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ধ্রুবসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ধ্রুব সম্মুখে ইষ্টদেবকে সন্দর্শন করিয়া কহিল, "ভগবন্! আমি বালক, আপনার স্তব স্তুতির কিছুই জানি না, অথবা সামর্থ্যও নাই। আপনি এই বর দিন্, যেন আমি আপনার স্তব করিতে পারি।" ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ধ্রুবের জ্ঞান পরিস্ফুট হইল। তখন ভগবান্ কহিলেন, "বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণতনয় ছিলে ও অনন্যচিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে; তৎপরে জনৈক রাজ-পুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হওয়ায়, তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, রাজার পুত্র হইতে বাসনা করিয়াছিলে; সেই হেতুই উত্তানপাদের গৃহে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছ। তুচ্ছ স্বর্গাদি ত সামান্য কথা, মানব আমার আরাধনা করিলে, অবিলম্বে মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। অদ্যাবধি ত্রৈলোক্যের উপরে, সকল তারা ও গ্রহগণের উপরিভাগে তোমার স্থান হইল। তোমার স্থান ধ্রুবলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। তোমার মাতাও তারকারূপে তোমার নিকটে অবস্থিতি করিবে।” এই বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে, ধ্রুব গৃহে আসিয়া পিতার নিকট হইতে রাজ্যলাভ করে। ধ্রুবের দুই পত্নী—ভ্রমি ও ইলা। ভ্রমির গর্ভে কল্প ও বৎসর এবং ইলার গর্ভে উৎকলের জন্ম হয়। ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম, মৃগয়ায় যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হয়। ধ্রুব এই জন্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, পিতামহ মনু ধ্রুবকে এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন। ইহাতে কুবের সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে ধ্রুব, “বিষ্ণুপদে যেন মতি থাকে” এই বর প্রার্থনা করে। কুবের “তাহাই হউক” বলিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। অনন্তর ইনি ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া বিষ্ণুদত্ত স্বনামখ্যাত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

প্রহ্লাদ

ভগবান্ বরাহ-অবতারে হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিলে, তাঁহার সহোদর হিরণ্যকশিপু শোকে ও দুঃখে মগ্ন হইয়া, কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণ করিলেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া দেবদ্বিজে হিংসা করিতে লাগিলেন। সেই দৈত্যেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অনুচরেরা প্রজা-নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা উপজীব্য বৃক্ষ সকল ছেদন ও প্রজাগণের গৃহদাহন করিতে লাগিল। অসুররাজ ত্রিভুবন অধিকার করিয়া লইলে, দেবগণ স্বর্গত্যাগ করিয়া, অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দৈত্যবরের পরম সুন্দর চারিটী সন্তান উৎপন্ন হইল। তন্মধ্যে প্রহ্লাদই শ্রেষ্ঠ। তিনি মহতের উপাসক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং দাসের ন্যায় নত হইয়া আর্য্যজনের পাদ-পদ্ম সেবা করিতেন। তিনি দীনজনের প্রতি সন্তানোচিত বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিতেন; কিন্তু অভিমান ও অহঙ্কার-হীন ছিলেন। তাঁহার চিত্ত বিপদে বিচলিত হইত না,—বালকের চিত্ত বাল্যলীলা পরিহার পূর্ব্বক কেবল ভগবানের প্রতি রত থাকিত। ভগবানের চিন্তায় তাঁহার চেতনা ক্ষোভিত হইলে, তিনি কখন রোদন করিতেন, কখন বা আহ্লাদিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেন, আবার কখন গান

ও নৃত্য করিতেন, কখনও বা পরমানন্দে রোমাঞ্চিত শরীরে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। এ হেন অদ্ভুত হরিভক্ত বালক পুত্রের প্রতি তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

তিনি পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইবার কারণ শুক্রাচার্য্যের পুত্র ষণ্ডামার্কের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদা হিরণ্য-কশিপু, প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বল দেখি এ সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি?" তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, "পিতঃ! হরিপাদ-পদ্মসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে, দানব-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক অনুচরগণকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার শত্রুভক্ত এই বালককে এই দণ্ডে বধ কর।" তাহাতে তাহারা প্রহ্লাদকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। কেননা, তখন তিনি ভগ-বানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া রহিলেন। শূলবিদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া, দৈত্যপতি তাঁহাকে বিষপ্রদান করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু বিষ-পানেও তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল না। তাহার পর অসুররাজ তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি দগ্ধীভূত হইলেন না। তখন দৈত্য-বর, প্রহ্লাদকে সাগর-নীরে নিক্ষেপ করিলেন, উচ্চপর্ব্বত হইতে ফেলাইয়া দিলেন, সিংহ-মুখে ও হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু হইল না। তদনন্তর তিনি পুনরায় অধ্যয়ন জন্য প্রহ্লাদকে ষণ্ডামার্কের করে সমর্পণ করিলেন। প্রহ্লাদ অন্যান্য বালকদিগের

সহিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। ষণ্ডামার্কের অনুপস্থিতি-কালে প্রহ্লাদ সমপাঠীদিগকে ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন।

তাঁহার উপদেশের সার এই—মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্লভ; উহা কদাচ লভ্য হইয়া থাকে, আবার তাহা নিতান্ত অস্থির। মনুষ্যের আয়ুঃসংখ্যা শতবৎসর, কিন্তু অজিতাত্মাদিগের কেবল তদর্দ্ধমাত্র, যেহেতু তাহারা নিশাভাগে নিরর্থক শয়ন করিয়া থাকে। সেই অর্দ্ধমাত্র পরমায়ুমধ্যেও আবার বাল্য কৈশোরে ক্রীড়া করিতে করিতে বিংশতি বৎসর, এবং বৃদ্ধাবস্থায় অশক্তিনিবন্ধন আর বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশিষ্ট দশবৎসর মাত্র, তাহা আবার দুঃখপরিপূর্ণ কাম এবং মোহের বশীভূত হইয়া মত্ততা ও বিষয়বাসনায় বিনাশ করে। অতএব ভ্রাতৃগণ! তোমরা এখন হইতেই বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণের শরণাপন্ন হও, নিরন্তর হরিকথা গান কর, তাঁহার পাদপদ্মের সুধা পান কর।

দৈত্যবালকেরা প্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ-করতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বয়স্য! তুমি এ সুন্দর উপদেশ কোথায় শিক্ষা করিলে?"

প্রহ্লাদ কহিলেন, "মহর্ষি নারদ আমার মাতাকে ও আমাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মানাত্মবিবেক এই দুই তত্ত্বোপদেশ কহিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপিও আমার চিত্তে প্রতিভাত রহিয়াছে। হে বয়স্যগণ! মনুষ্যসকল যে দেহের নিমিত্ত কাম্যকর্ম্ম দ্বারা ভোগ কামনা করে, সেই দেহ কুক্কুরাদির ভক্ষ্য এবং ক্ষণভঙ্গুর। ফলতঃ কি দান, কি যজ্ঞ, কি শৌচ, কি ব্রত কিছুই ভগবানের

প্রীতিজনক নহে। কেবল নির্ম্মল ভক্তিযোগ দ্বারাই তিনি প্রীত হয়েন।”

প্রহ্লাদের উপদেশে দৈত্য-বালক সকলেই হরিভক্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে ষণ্ডামার্ক তদ্বিষয় নৃপ-সন্নিধানে নিবেদন করিলেন। দৈত্যরাজ শ্রবণমাত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলে, প্রহ্লাদ আসিয়া পিতার পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তখন নৃপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “রে বালক! তুই বার বার আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিস্ কেন বল্?” তাহাতে প্রহ্লাদ বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন, “পিতঃ! আমি আপনাকে ঈশ্বর-সদৃশ ভক্তি ও মান্য করি এবং আপনার সকল আজ্ঞাই পালন করি; কেবল সেই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ভগবানকে ভুলিতে পারি না।” তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, “তোর ভগবান্ কোথায়?” প্রহ্লাদ কহিলেন, “তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন।” তাহাতে দানবেন্দ্র বলিলেন, “তোর ভগবান্ যদি সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তবে এই স্তম্ভের মধ্যে কেন নাই?” প্রহ্লাদ কহিলেন, “ঐ যে আছেন।” দৈত্যপতি “কৈ কৈ” বলিয়া যেমন রোষভরে বলপূর্ব্বক সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, অমনি স্তম্ভ হইতে অভূতপূর্ব্ব এক মহাভয়ানক শব্দ নির্গত হইল এবং ভগবান্ নর-সিংহরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে ধারণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ বিশাল নখাঘাতে বক্ষঃ বিদীর্ণকরতঃ তাহার প্রাণসংহার করিলেন। তৎপরে দৈত্যারি হরি, সেই ভয়ঙ্কর মহাতেজোময় নর-সিংহবেশে সভাস্থিত

সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অমনি গন্ধর্ব্বগণ দুন্দুভিধ্বনি ও দিব্যাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া, নরসিংহের স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদ ভক্তিভরে আত্মহারা হইলেন। কিন্তু ভগবান্ নৃসিংহদেবের রোষোদ্দীপ্ত উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অপর কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহসী হইলেন না। হিরণ্যকশিপুর পর প্রহ্লাদ রাজা হইলেন। এখন তিনি আর বালক নহেন। তাঁহার পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। তিনি বলিকে রাজ্যভার দিয়া তীর্থযাত্রা করেন। অবশেষে তিনি তপস্যাদ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন।

শঙ্করাচার্য্য

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদ্যাধিরাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের শিবগুরু নামে এক পুত্র জন্মে। শিবগুরুর ভার্য্যা * সুভদ্রা। এই শিব-গুরুর ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। কথিত আছে, উহারা শঙ্করের আরাধনা করিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, পুত্রের নাম শঙ্কর রাখেন।

শিবগুরু শঙ্করাচার্য্যের তৃতীয় বৎসর বয়সের সময় পরলোক গমন করেন। এই সময় শঙ্কর তাঁহার জননীর মুখনিঃসৃত পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া অদ্ভুত স্মরণশক্তি প্রভাবে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলেন। সপ্তম বৎসরে এই মহাপুরুষের উপনয়ন হয়। অষ্টম-

* আনন্দগিরি লিখিত শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ নিজ পত্নী কামাক্ষী দেবীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন। তাঁহাদের বিশিষ্টা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। বিশ্বজিৎ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিশ্বজিৎ কিয়ৎকাল গৃহাশ্রমে থাকিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বনগমন করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করি-লেন। এদিকে বিশিষ্টা স্বামীকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃ-করণে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্টা এক পুত্ররত্ন লাভ করেন। সেই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি পার্থিব সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। জগতে এমন কোন্ জননী আছেন, যিনি একমাত্র পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিয়া কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনে অনুমতি দেন? তাই আজি শঙ্কর-জননী সন্ন্যাস ধর্ম্মের পূর্ব্বে তাঁহাকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন-জন্য আদেশ করিলেন।

একদিন শঙ্করাচার্য্য জননীর সহিত কোন আত্মীয়ের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনকালীন নদী পার হইয়া আসিতেছিলেন। যাইবার সময় নদীতে অল্প জল ছিল; কিন্তু প্রত্যাগমনকালীন উহা জলে পূর্ণ দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য উপযুক্ত অবসর পাইলেন এবং সেই সুযোগে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া জননীকে এই বলিয়া সম্বোধন করেন, মাতঃ, যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য অনুমতি না দেন, তবে এখনই আমি জলমগ্ন হইব। জননী পথিমধ্যে একাকিনী এইরূপ বিপদাশঙ্কা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনে অনুমতি দেন। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য কৌশলে মাতার নিকট অনুমতি লইয়া অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমকালে গুরু পাইবার উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে নর্ম্মদাতীরে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ স্বামী নামে জনৈক সিদ্ধ পুরুষ অবস্থান করিতেন। শঙ্করাচার্য্য ইঁহারই নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং সর্ব্বদর্শন অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহারই অনুমতিতে কাশীধামে গমন করেন।

এই সময় শঙ্করাচার্য্য একদিবস ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইয়া

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হন। তখন ব্রাহ্মণ বাটীতে ছিলেন না; তিনিও দরিদ্রতা-প্রযুক্ত ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার্থ উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং শঙ্কর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ম্রিয়মাণা হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। পরে অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই বলিয়া তাঁহাকে আমলক ফল প্রদান করিয়া গ্রহণ করিতে বলেন। শঙ্করাচার্য্য বিপ্র-পত্নীর এরূপ আক্ষেপপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, এবং দয়াপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কমলার স্তব করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবী শঙ্করের আহ্বানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী পতিসহ অতুল ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া যাহাতে সুখে কালযাপন করেন, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। ফলতঃ তাহাই হইল। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীর অকস্মাৎ সুবর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হইল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় অচিরে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

শঙ্করাচার্য্য একজন লোকবিখ্যাত শৈবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা ভারতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনিই এক সময় অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত ভাষ্যের প্রচারদ্বারা নাস্তিকতা ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত ভারতকে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর, নানা প্রকার অসদ্ধর্ম্ম হইতে সনাতন বৈদিকধর্ম্ম রক্ষার্থ শঙ্করাচার্য্যরূপে মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ-

হন। ইঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও অমানুষী শক্তিবলে একদিন ধর্ম্মহীন অধঃপতিত ভারত নবজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিদ্বেষী ছিলেন ও তিনি বৌদ্ধদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইঁহার অলৌকিক ত্যাগস্বীকার, অখণ্ডনীয় যুক্তি, সারগর্ভ উপদেশ ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপে একদিন সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহার মস্তিষ্ক-প্রসূত শত সহস্র অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ অদ্যাপি হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেছে। এই মহাপুরুষ ঠিক কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার স্থির নিশ্চয় হয় নাই। শঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থে ইঁহাকে বিধবার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখা যায়।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ৩৫০—৪৯০ খৃঃ মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কেরলদেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা মাধবাচার্য্য ও আনন্দগিরি প্রণীত "শঙ্কর-বিজয়" ও "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থদ্বয়ে আচার্য্য-জীবনীর অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কাশীধামে অবস্থান করিয়া, অনেক বেদপারগ পণ্ডিতদিগকে স্বমতে আনয়নানন্তর স্বয়ং চণ্ডালরূপী শঙ্কর কর্ত্তৃক অদ্বৈতমতে উপদিষ্ট হন। একদা আচার্য্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার কালীন পথিমধ্যে কুক্কুর চতুষ্টয়ের গলরজ্জুধারী জনৈক চণ্ডালকে সম্মুখে দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "গচ্ছ দূরং"। চণ্ডাল পথ না ছাড়িয়া কহিল, "বেদ উপনিষদ্ কহিয়া থাকে যে, পরব্রহ্ম অদ্বিতীয়,

অনবস্থ, অসঙ্গ ও সত্য; কিন্তু আপনাতে উহার ভেদবুদ্ধি দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আপনি দেহ বা দেহীর সংস্পর্শ ভয় করিয়াই, আমাকে পথ ছাড়িতে বলিলেন; কিন্তু আপনার ও আমার আত্মাতে কি কোন প্রভেদ আছে? সুরনদী ও সুরাতে প্রতিবিম্বের কি কোন প্রভেদ লক্ষিত হয়? অজ্ঞান মোহবশতঃ আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। পুরাণপুরুষ বিভিন্ন শরীরে অবস্থিত থাকিলেও তিনি এক, অশরীরী ও পূর্ণ। কি আশ্চর্য্য! মহাত্মারাও মোহকূপে পড়িয়া, এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন!" শঙ্করাচার্য্য, চণ্ডালরূপী মহাপুরুষকে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনার উপদেশবাক্যে বুঝিলাম, আপনি অন্ত্যজবংশীয় নহেন—আপনি একজন আত্মতত্ত্ববিৎ। অতিশয় বিচক্ষণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা অভেদ-বুদ্ধি হইতে দেখা যায় না। যে কোন ব্যক্তি আপন দৃঢ় বুদ্ধিবলে সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মসম জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি ব্রাহ্মণ হউন অথবা চণ্ডাল হউন, আমার বন্দ্য। মৃত্তিকা ও চেতন হইতে চিন্ময় পরম পুরুষকে যিনি এক বলিয়া জানেন ও আপনাকে তদংশ জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও আমার গুরু। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য নিমেষ মধ্যে সেই সারমেয় অথবা সেই চণ্ডালকে আর দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি সম্মুখে ভগবান্ চন্দ্রমৌলিকে চতুর্ব্বেদের সহিত অবস্থিত দেখিয়া, পুলকিতান্তঃকরণে যোড়হস্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি বাদরায়ণসদৃশ আমার অনুগ্রহ পাত্র। তুমি

উপনিষদ্ পারগ। আমার আদেশে তুমি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ন কর।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, অপর সমস্ত মিথ্যা, এই উপদেশ প্রচারার্থ তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় ভাষ্য সঙ্কলন করেন। বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি পাটলিপুত্র নগরে পূর্ণবর্ম্মরাজার অভিষেক দেখিয়াছিলেন। ৫৯০ খৃঃ পূর্ণবর্ম্মের রাজত্বকাল। সুতরাং ঐ সময়ই আচার্য্যের আবির্ভাব ধরিতে হইবে। অতঃপর তিনি প্রয়াগ, মাহিষ্মতী, শ্রীবলী, শৃঙ্গেরী, কালহস্তী, তিরুপতি, কাঞ্চীবুরু, কান্নান, চিদম্বর, কুম্ভকোণ, শ্রীরঙ্গম, জম্বকেশ্বর, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে পর্য্যটনানন্তর দেবদর্শন মঠস্থাপন করিয়া, অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ইঁহার অসামান্য দেবতাবৎ ক্ষমতা ও কার্য্য দর্শনে অনেকেই ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য বদরিকাশ্রমে মঠ স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরের বিজিলবিন্দু নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় মণ্ডন মিশ্র নামক জনৈক মহাপণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তিনি সন্ন্যাসীদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একদিবস শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মিশ্র মহাশয় শ্রাদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং স্বয়ং ব্যাসদেব তথায় মন্ত্রবলে আহুত হইয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্য্যকে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন এবং অনেক বচসার পর ব্যাসদেব কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আহারান্তে

বিচারে যিনি জয়ী হইবেন, তাঁহারই মত অবলম্বন করা হইবে। মণ্ডন মিশ্রের ভার্য্যা সারসবাণী * এই ব্যাপারে মধ্যস্থ থাকিবেন। বিচারে মণ্ডন মিশ্রই পরাজয় স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মত অবলম্বন করেন। সারসবাণী পতিকে এবম্বিধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিয়া, নিজে ব্রহ্মলোকে গমনোদ্যত হন। শঙ্করাচার্য্য সারসবাণীকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। সারসবাণী শঙ্করাচার্য্যকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জানিয়া প্রথমে কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে চান। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে এরূপ কুৎসিত কামশাস্ত্রের আলাপ করিতে দেখিয়া বিশেষ অপ্রতিভ হন এবং বলেন, "মাতঃ, আপনি ছয় মাস মাত্র অপেক্ষা করুন, আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি কামশাস্ত্র শিক্ষার্থে বহির্গত হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র শিক্ষার্থে বহির্গত হইয়া পথি মধ্যে এক রাজার মৃত দেহ দেখিয়া, যোগবিদ্যা-প্রভাবে রাজার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এদিকে শঙ্করাচার্য্যের নিজ দেহ রক্ষার্থে চারি জন শিষ্য নিযুক্ত রহিলেন। রাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া শঙ্করাচার্য্য যদিও রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন, তথাপি রাণী উপস্থিত রাজার আচার ব্যবহারে পরিতুষ্টা না হইয়া ক্রমশঃ কেমন একটু সন্দিহান হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি কর্ম্ম-চারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা নগর পরিভ্রমণ করিয়া

* শঙ্কর দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে, ব্রহ্মা মণ্ডন মিশ্ররূপে ও সরস্বতী সারসবাণী রূপে অবতীর্ণ হন।"

যদি কোথাও মৃতদেহ দেখিতে পাও, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ দাহ করিয়া ফেল তাহারা অনুসন্ধানে শঙ্করের শবদেহ দেখিতে পাইয়া শিষ্যদের নিকট হইতে জোর করিয়া লইয়া, সৎকারের আয়োজন করে। তৎক্ষণাৎ শিষ্যেরা রাজ-বেশধারী—শঙ্করাচার্য্যের নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করেন। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া দেখেন, তাঁহার নিজদেহ চিতায় সজ্জিত হইয়া জ্বলিতেছে। তিনি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া রাজদেহ হইতে নিজদেহে প্রবেশ করিয়া প্রজ্বলিত চিতা হইতে লাফাইয়া পড়েন এবং নিজ দেহের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া নৃসিংহ দেবের স্তব করিতে থাকেন। তিনি অমৃত-বারি বর্ষণে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। এইরূপে কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া শঙ্করাচার্য্য সারসবাণীর নিকট গমন করিলেন। সারসবাণী বিচারের পূর্ব্বেই পরাভব স্বীকার করিয়া পুনরায় ব্রহ্মলোকে যাইতে উদ্যত হন। তাহাতে আচার্য্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করেন এবং তথায় মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিতে বলেন।

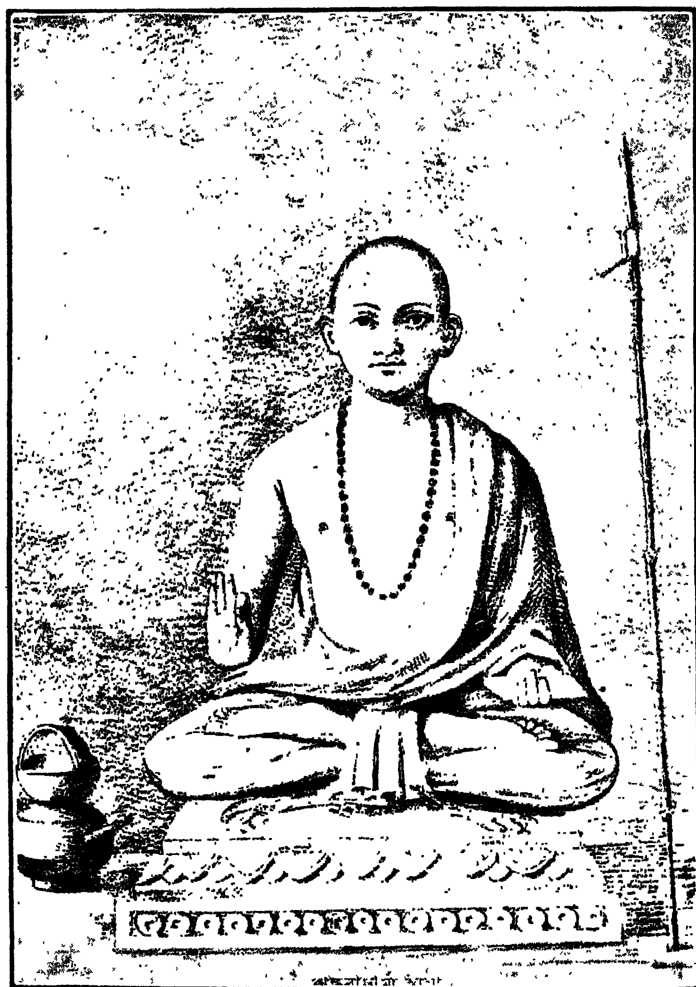
তদনন্তর গোকর্ণ, উজ্জয়িনী, বাহ্লীক হইয়া কাশ্মীরে শারদা-পীঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, বদরিকাশ্রমে ও তথা হইতে কেদারনাথে গমন করেন। পরে কাঞ্চীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ব-স্বরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কাঞ্চী-পুরে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিস্থানে অদ্যাপি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

শঙ্করের অনেক বিপক্ষ ছিল। তিনি একদা প্রব্রজ্যা হইতে

প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী পীড়িতা হইয়া একাকিনী শয্যাগত আছেন; নিকটে আত্মীয়-স্বজন থাকিলেও শুশ্রূষা দূরের কথা, কেহই একদিনের জন্যও তত্ত্বাবধান করে নাই। জননীর এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। এমন কি, তাঁহার জননী লোকান্তরিত হইলে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহার সৎকারাদিতে কিছুমাত্র সাহায্য করা দূরে থাকুক, মুখাগ্নির জন্য অগ্নিপ্রদানও করিল না। তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য ক্রোধে আপন উরুস্থলে চপেটাঘাত করায় অগ্ন্যুদ্গম হয় এবং সেই অগ্নিতে আপন গৃহ-প্রাঙ্গণেই জননীর সৎকার করেন। জননীর মৃত্যুর পর যখন তিনি গৃহ-ত্যাগী হইয়া যান, তখন স্বগ্রামবাসীদিগকে মনের দুঃখে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া যান যে, এই গ্রামে ভিক্ষুকে আর ভিক্ষা পাইবে না, লোক সকল অধর্ম্মাচারী হইবে এবং আপন গৃহ-প্রাঙ্গণেই তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজনের সৎকার করিবে। বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্তও ঐ স্থানের লোক আপনাপন গৃহপ্রাঙ্গণেই মৃতব্যক্তির সৎকারাদি করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য জ্যোতিষবিদ্যাও ভালরূপ জানিতেন। তিনি বাক্-সিদ্ধ ছিলেন। ইহার পর হইতে অনেকেই সন্ন্যাসী হইতে লাগিলেন এবং এই সময় বিস্তর ব্রহ্মচারী সরস্বতী ইত্যাদি উপাসক-মণ্ডলীরও সৃষ্টি হয়।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, বেদান্ত পাঠ প্রভৃতি ইহার সাধনা এবং অদ্বৈতবাদ প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চ-



শঙ্করাচার্য্য

পৃঃ—৪৯

রত্নভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ভাষ্য, সাধন-পঞ্চক, যতি-পঞ্চক, আত্মবোধ, আনন্দলহরী, অপরাধভঞ্জন, মোহমুদ্গর, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে লিখিতে পারিলাম না। কেবল মোহমুদ্গর খানি পাঠক পাঠিকার অমূল্যরত্ন বিবেচনায় তাহাদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মোহমুদ্গর

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজ-কর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥ ১

রে মূঢ়! ধনের তৃষ্ণা কর পরিহার,
কায় মনে কর ধনে বিতৃষ্ণা-সঞ্চার।
নিজ কর্ম্মফলে তুমি লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর সদা চিত্ত-বিনোদন॥ ১

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।

কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২

কে তব কামিনী আর কে তব কুমার ?
আহা মরি এ সংসার কিবা চমৎকার।
কোথা হ'তে আসিয়াছ, আর তুমি কার
এই ভাবে তত্ত্ব কর ব্রহ্ম-তত্ত্ব সার ॥ ২

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩

ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব কর মন,
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন।
অতএব ত্যজিয়ে সংসার মায়াময়,
ত্বরায় করহ ব্রহ্ম-পদেতে আশ্রয় ॥ ৩

নলিনীদলগত-জলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ৪

পদ্ম-পত্রে জল-বিন্দু যেমন চঞ্চল,
সেইরূপ এ জীবন অতীব চপল।
অতএব ক্ষণমাত্র সাধু-সঙ্গ কর,
সেই তরি তরিবারে এ ভব-সাগর ॥ ৪

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং,
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং ॥ ৫

ভগবৎ-তত্ত্ব সদা করহ ভাবনা,
ক্ষণস্থায়ী ধন-আশা না কর কামনা।
গ্রাসিছে সংসার হের ব্যাধি-বিষধর,
তাই শোকে সব লোক হয় জরজর ॥ ৫

যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৬

যেমন জনম হয় তেমনি মরণ,
জননী জঠরে পুনঃ করয়ে শয়ন।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়,
তবে হবে মানবের কবে সুখোদয় ॥ ৬

দিন-যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৭

দিবস যামিনী সন্ধ্যা প্রাতঃকাল আর
শিশির বসন্ত আদি আসে বার বার ।
কাল করে এই খেলা, ক্ষয় পায় আয়ু,
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশা-বায়ু ॥ ৭

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং ।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥ ৮

গলিত শরীর আর মস্তক পলিত,
দশন স্খলিত মুখ অত্যন্ত কুৎসিত !
যষ্টি ধরি চলিতেও কাঁপে থর থর,
তবু আশা-ভাণ্ড ত্যাগ নাহি করে নর ॥ ৮

সুরবরমন্দির-তরুতল-বাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৯

দেবতা মন্দিরে কিম্বা তরুতলে স্থান,
ভূতলে শয়ন মৃগ-চর্ম্ম পরিধান।
সমুদয় পরিজন ভোগ পরিত্যাগ,
কাহার না সুখকর এমন বিরাগ? ৯

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহ-সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ ১০

শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু বিগ্রহ-সন্ধিতে,
এ সবে কিছুতে যত্ন না করিবে চিতে।
যদি বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা করিবে অচিরে,
সর্ব্বভূতে সমভাব ভাব ধীরে ধীরে ॥ ১০

অষ্ট-কুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ,
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।

ন ত্বং নাহং নায়ং লোক—
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১১

অষ্ট-কুলাচল আর এ সপ্ত-সমুদ্র,
ব্রহ্মা পুরন্দর কিম্বা দিনকর রুদ্র।
তুমি আমি, বিশ্ব-মাঝে সকলি স্বপন,
তবে কেন বৃথা শোকে হও হে মগন ॥ ১১

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ,
ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥ ১২

তুমি আমি আদি সর্ব্ব স্থানে এক হরি,
বৃথা কেন কর ক্রোধ ধৈর্য্য পরিহরি।
অতএব পরিহার কর ভেদ-জ্ঞান,
সর্ব্বত্রই আত্ম-রূপী হের ভগবান্ ॥ ১২

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১৩

বালক সকল সদা খেলায় চপল,
তরুণীতে অনুরক্ত যুবক সকল।
সংসার চিন্তায় মগ্ন দেখ বৃদ্ধগণ,
পরম-ব্রহ্মেতে লগ্ন নহে কোন জন॥ ১৩

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ॥ ১৪

অনর্থ অর্থেরে কেন নিত্য ভাব মনে,
এ সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাহি ধনে।
প্রাণ-প্রিয় পুত্রেও ধনীর হয় ভয়,
সর্ব্বত্রই এই রীতি জানে জগন্ময়॥ ১৪

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ,
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর-দেহে,
বার্ত্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ ১৫

যদবধি করে নরে ধন উপার্জ্জন,
সদা অনুরক্ত থাকে পরিবারগণ।

পরে যদি জরায় জর্জ্জর হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা তাঁরে করে নাকো কেহ ॥ ১৫

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়া—
স্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ১৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি পরিহর,
'আমি কে' এরূপে নিত্য আত্ম-তত্ত্ব কর।
আত্মজ্ঞান-বিহীন যতেক মূঢ় জন,
হয় তারা ঘোরতর নরকে মগন ॥ ১৬

ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৭

ষোড়শ ছন্দেতে শ্লোক করিয়া রচিত,
শিষ্যগণে উপদেশ হইল কথিত।
যদি কার নাহি জন্মে বিবেক ইহায়,
কে বা বল ইহাপেক্ষা শিখাইবে তায় ॥ ১৭

যীশুখ্রীষ্ট

যীশুখ্রীষ্ট একজন অদ্বিতীয় সাধু ও বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ মিশনরি এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল নামে অভিহিত হয়। মিশনরিগণ বলেন, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র; তিনি পাপীদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট অর্থে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। রোমীয় সম্রাট্ অগস্ত কৈসারের অধিকারকালে হিরোদ রাজার শাসনাধীনে বেথ্‌লেহেম্ নগরে কুমারী মরিয়মের গর্ভে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। এই দিন হইতে খৃষ্টাব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত বড়ই রহস্য-জনক। যখন যোসেফের সহিত মরিয়মের বিবাহ হয়, তখন মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন। উভয়ের সহবাসে যোসেফ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অবিবাহিত অবস্থাতেই গর্ভবতী হইয়াছেন। কাজেই তিনি দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া গোপনে পত্নীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং পৃথক্ থাকিতে বাসনা করেন। যোসেফের এবম্বিধ চিত্তের ভাব বুঝিয়া পরম-পিতা তাঁহার নিকট দেবদূত পাঠাইয়া দেন। যোসেফ নিদ্রিতা-বস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ঐ দেবদূত তাঁহাকে বলিতেছেন, "মরিয়মের গর্ভে ভ্রূণরূপী যে শিশু বিদ্যমান রহিয়াছে—তাঁহাকে

পবিত্রাত্মা বলিয়া জানিবেন। যতদিন না ঐ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন আপনি মরিয়মকে এ সংবাদ দিবেন না। আপনি মরিয়মকে পরিত্যাগ না করিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন এবং ঐ শিশুর নাম যীশু ( ) রাখিবেন।" যোসেফ দেবদূতের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

যীশুর জন্ম সময়ে অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে যথেচ্ছাচারী রাজা-হিরোদ মনে মনে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং পাছে ঐ শিশু ভবিষ্যতে তাঁহার পরম শত্রুরূপে অভ্যুদিত হয়, এই ভয়ে তিনি ঐ শিশুর ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হন; তদনুসারে তিনি ঐ শিশুর মৃত্যু অলঙ্ঘনীয় করিবার জন্য বেথ্‌লেহেম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের যাবতীয় শিশুর সংহারার্থ আদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় জনৈক দেবদূত আসিয়া নিশাযোগে নিদ্রিত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়া সতর্ক করিয়া দেন ও বলেন, তোমরা এখনই এই শিশুকে লইয়া মিশর রাজ্যে পলায়ন কর। এইরূপে যীশুর জীবন রক্ষা হয়।

অতি শৈশবকাল হইতেই যীশু প্রেমিক, নম্র ও শান্ত ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই য়িহুদী বালক স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি Son of the law বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "জর্ডান" নদীতীরে সংসার-বৈরাগী মহাযোগী যোহনের নিকট দীক্ষিত (বাপ্তাইজ) হন। কিন্তু যোহন, যীশুকে আপনা হইতে উচ্চতর



শিশুকে লইয়া মিশর রাজ্যে পলায়ন

পৃঃ—৫৮

জ্ঞান করিতেন; তিনি বলিতেন, যীশুর পাদুকা বহনের যোগ্য তিনি নহেন। যীশুর নিষ্কলঙ্ক সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যোহনের হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল। তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি নিষ্পাপ-দেহ যীশুকে প্রথমে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কি না সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। পরে যীশু কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাকালীন আকাশ হইতে তাঁহার প্রতি দৈববাণী হয় যে, "ইনিই প্রতিশ্রুত মেসায়া অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র।" অতঃপর যীশু অন্ধ-জগতে আলোক বিতরণার্থ,—পাপীতাপীদিগের উদ্ধারার্থ আত্মোৎসর্গ করেন।

তিনি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে যোগবলে মৃত লাজারাসকে পুনর্জ্জীবিত করায়, সান্হেদ্রিন্গণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহার ধ্বংস সাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাতে যীশু ইফ্রাইম্ নামক বনপ্রান্তে গমনানন্তর আত্মরক্ষা করেন। এইরূপে তাঁহাকে নানাকারণে প্রপীড়িত করায় একদিন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বিদ্বেষী য়িহুদীদিগকে অভিসম্পাত-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites" এই ঘৃণাসূচক বাক্যে অপমানিত হইয়া য়িহুদীগণ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেশে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইলে, য়িহুদীনৃপতি এবং ধর্ম্মদ্রোহী যাজকগণ কর্ত্তৃক এই মহাপুরুষ নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত,

পীড়িত ও অবশেষে বিচারার্থ নীত হইয়া, প্রধান বিচারপতি পীলাটকর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মহাপুরুষ সাক্ষাৎ দয়ার অবতার ও পাপীর পরিত্রাতা ছিলেন। যখন ইঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়, তখনও ইনি সহাস্যমুখে পরমপিতা পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "হে পিতঃ! আমাকে বধকারী এই সকল লোক অজ্ঞান। ইহারা কি করিতেছে জানে না। ইহাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" এই মহাপুরুষের প্রধানতঃ দ্বাদশটী শিষ্য ছিল। ইনি সমাধি হইতে পুনরুত্থান করিয়া ভক্ত-প্রাণ শিষ্যদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন ও তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চল্লিশ দিনের পর স্বর্গারোহণ করেন।

যীশু অনেক অলৌকিক ও অমানুষিক কার্য্যকলাপ দেখাইয়া, জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। একদা তিনি পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মৎস্য দ্বারা পাঁচ হাজার লোককে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন অন্ধকে দর্শন-শক্তি, বোবাকে বাক্-শক্তি, খঞ্জকে চলৎ-শক্তি, বধিরকে শ্রবণ-শক্তি, এমন কি মৃতব্যক্তির জীবনদান পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা "নিউটেষ্টামেণ্ট" অর্থাৎ নূতন ধর্ম্মনিয়ম এবং "ওল্ডটেষ্টামেণ্ট" অর্থাৎ পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম। য়িহুদী ও মুসলমানগণ প্রথমটীকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া স্বীকার করেন না। পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম হিব্রু ভাষায় লিখিত। তাহা কি য়িহুদী, কি খ্রীষ্টান, কি

মুসলমান সকলেই শিরোধার্য্য করেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, ঈশ্বর প্রথমেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করেন, এই প্রকারে আলোক, অন্ধকার, জল, স্থল, সমুদ্র, নদ্যাদির সৃষ্টি হইল। অতঃপর জলচর, খেচর, পশ্বাদি সৃজন করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহার স্বরূপ মনুষ্য সৃজন করিলেন। ঐ আদি মনুষ্যের নাম আদাম ও তৎপঞ্জরোদ্ভূতা নারীর নাম হবা বা ইভ। ইহারা ইডেন নামক সুন্দর উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শয়তান কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুর অধীন হন। ইহাদিগের দ্বারা ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে পাপেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতঃপর ঈশ্বর পাপীদিগের হত্যা করিবার জন্য একচত্বারিংশ-দিবসব্যাপী জলপ্লাবনে নোয়ানামধেয় জনৈক পুণ্যাত্মা ও সেম্, হাম ও যাফেৎ নামক তাহার পুত্রত্রয় এবং পুত্রবধূত্রয় ও সমস্ত জীবের এক এক যুগ্ম রক্ষা প্রাপ্ত হন। তাহার পর আবার ক্রমে ক্রমে মনুষ্যাদি জীব-জন্তুর উৎপত্তি হয়।

লুক, মার্ক, মথি, যোহন, যাকব, পিতর ও পান প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ খ্রীষ্টলীলা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত আদিপুস্তক প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থপ্রণেতা মূসা বলেন, ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়া, সপ্তমদিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই দিন শনিবার। য়িহুদীগণ অদ্যাপি শনিবারকে পবিত্র দিন বলিয়া, সেই বারে ঈশ্বরভজন ভিন্ন গৃহস্থালীর অন্য কোন কর্ম্ম করেন না। যীশুখ্রীষ্ট শুক্রবারে মৃত ও

কবরস্থ হন, কিন্তু তিনি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবারে পুনরুত্থান করেন। তদবধি খ্রীষ্টানগণ উক্ত বিশ্রামবার শনিবারের পরিবর্তে রবিবার পালন করিয়া থাকেন। এস্থলে বাইবেল লিখিত ঈশ্বরের দশটী আজ্ঞা লিখিত হইল। যথা ;—১ম,—আমাবিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না। ২য়,—প্রতিমাপূজা করিও না। ৩য়,—অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইও না। ৪র্থ,—বিশ্রামবারকে পবিত্ররূপে মান্য করিবে। ৫ম,—পিতামাতাকে সম্মান করিবে। ৬ষ্ঠ,—নরহত্যা করিও না। ৭ম,—ব্যভিচার করিও না। ৮ম,—চুরি করিও না। ৯ম,—কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না। ১০ম,—কাহারও কোন বস্তুতে লোভ করিও না। যাবতীয় অধার্ম্মিকতাই পাপ। পাপের ফল মৃত্যু। পাপের ফলভোগ না করিলে বা উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে। যেহেতু তিনি পাপীদিগের পরিত্রাণের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টে বিশ্বাস-স্থাপনা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের উপায় নাই। প্রভু যীশু বলিতেছেন, "হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক সকল! তোমরা আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকেও তৃষ্ণানিবারণার্থ বিনা-মূল্যে সুশীতল অমৃতজল দিব।" প্রেমময় ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি এবং যাহারা অতন্দ্রিত হইয়া আমার অন্বেষণ করে, তাহারাই আমায় পায়। একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তৎপুত্র খ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়াই অনন্ত জীবন।

যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপহরণে অসমর্থ। খ্রীষ্ট আমাদের যজ্ঞ। প্রভুর নাম দৃঢ়দুর্গস্বরূপ, ধার্ম্মিক লোক তন্মধ্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। খ্রীষ্ট কহিতেছেন, "আমিই পথ্য, সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না গেলে কেহই পিতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা কর, পাছে পরীক্ষাতে পড়। আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর; প্রেম ঈর্ষা করে না, আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, আশুক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, অধর্ম্মে আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ করে, সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে।" আহা! দয়ার অবতার জীবত্রাতা যীশুকে যখন ক্রুসে হত করা হয়, তখন দরবিগলিতধারে রক্তধারা প্রবাহিত, শান্ত, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ও স্বর্গপানে উন্মীলিত চক্ষু, গদ্‌গদ ভাব এবং পাপীদিগের জন্য পিতার নিকট প্রার্থনাযুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের সার কথা বলিয়া, যীশু দেহপরিত্যাগ করিলে, সেই পবিত্রময় প্রেমময় জগৎপতির নিকট পুনর্গমন দৃশ্য কল্পনা করিলে, প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

মহম্মদ



মহম্মদ "কোরাণ-সরিফ' ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। "লা ইলাহা ইল্লিল ল্লা মহম্মদ রসুন আল্লা।" আরবের বিখ্যাত ইসমাইল-বংশীয় আব্দল্লার ঔরসে ও আমিনার গর্ভে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর মক্কানগরে মহম্মদের জন্ম হয়। ইনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া আরববাসীদিগের নিকট পরিচিত। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আব্দল্লা পরলোক গমন করেন। স্বামীবিয়োগ-বিধুরা আমিনাও শোকে অধীরা হইয়া দ্বিতীয় বৎসরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। মহম্মদের পালন ভার তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের হস্তে ন্যস্ত হইল। বৃদ্ধের জীবলীলা অবসানে তাঁহার খুল্লতাত "আবু-তালিব্ আবদল্ মোত্তলিব্ হন" ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগহেতু ইনি কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। খুল্লতাত ইহাকে মেষ পালকের কার্য্যে নিযুক্ত করতঃ মরুভূমি হইতে বন-জাম আহরণ করিতেন। তিনি দীনদুঃখীদিগের সহিত ভ্রমণ করতঃ দারিদ্র্যকষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরে খুল্লতাতের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে বোগদাদ, বসোরা প্রভৃতি অনেক স্থানে গমন করেন। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বণিক ও তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচারকারী দস্যুদলকে দমন করিবার জন্য সদলে যাত্রা করেন। এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও

দস্যু দমন করতঃ তাঁহার যৌবন-জীবনে যুদ্ধ-বাসনা বলবতী হইয়াছিল।

পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি খদিজানাম্নী এক ঐশ্বর্য্যবতী বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তখন হইতে ইনি ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোযোগী হন। খদিজার গর্ভে অনেক গুলি সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল। তন্মধ্যে তাঁহার কন্যা ফতিমাই দেশবিখ্যাত। ইনি আবুতালিব আব্দলের পুত্র আলীবন্ আবি তালিবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মহম্মদ বিশেষ চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। আরববাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত। এই সকল সন্দর্শন করতঃ তিনি ব্যথিত হৃদয়ে চিন্তা করিতেন যে, যদি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক ধর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত করা যায়, তাহা হইলে দেশের পক্ষে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। তদনুসারে তিনি বিবাহের পরবর্ত্তী পঞ্চদশবর্ষ কাল সকল পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তায় অতি-বাহিত করিতেন এবং চিত্ত বিনোদনার্থ অহরহঃ হেবার নামক পর্ব্বত-গুহায় আসিয়া নিবিষ্টচিত্তে আপনার অভীষ্ট পথানুবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেন।

অতঃপর তিনি নির্জ্জন হীরাশৈল-শৃঙ্গে আসিয়া ঈশ্বর আরাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক-বৎসরব্যাপী যোগাবলম্বনে মহম্মদ যোগসিদ্ধ হইলেন। কথিত আছে যে, তিনি তথায় ঈশ্বর-দূত গ্যাব্রিয়লের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করতঃ "কোরাণ" প্রচার ও ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ পুনরায় জনসমাজে আসিয়া স্বীয় পরিবারস্থ সকলকেই আপন ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর সকলে তাঁহাকে,আল্লার-দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহম্মদ মক্কানগরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে থাকেন। তথাকার লেবিস্ নামক জনৈক বিখ্যাত আরবী কবি তাঁহার অমানুষিক জ্ঞানের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন।

এই সময়ে তাঁহার পত্নী খদিজার বিয়োগ হইলে, মহম্মদ পুনরায় আবুর কন্যা আয়েসার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে মহম্মদ নিজ, "একেশ্বরবাদী" মত প্রচার করিলেন। প্রথমে ইঁহার স্ত্রী এবং দুই একজন লোক ব্যতীত আর কেহ এই মত গ্রহণ করেন নাই। শেষে ইঁহার শিষ্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, ইনি ৬২২ খৃষ্টাব্দে, ১৬ই জুলাই মক্কা হইতে মদিনা নামক নগরে পলায়নপূর্ব্বক জীবনরক্ষা করেন। তদবধি হিজরি সাল গণনা আরম্ভ হয়। পরে আত্মরক্ষার্থ ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ অল্পকালমধ্যে আরবদেশ অধিকারপূর্ব্বক ইঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। অবশেষে সিরিয়া জয় করতঃ উৎসাহিত হইয়া, ইনি অনেকগুলি নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

তিনি ৬২৮ খৃষ্টাব্দে কিনান-আবি-অল হোকাইফ্ ও হোরয়-রাজকে খাইবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হোকাইফ্ পত্নী সফিয়া বিন্ হোরয়ের পাণি-গ্রহণ করেন। ইঁহার মৃত্যু-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, এই সময়ে জৈনাব নাম্নী জনৈক খাইবার-দেশীয় রমণী তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করে। কোথাও বা তাঁহার তেষট্টি বৎসর বয়সে জ্বররোগে মৃত্যুর বিষয় লিখিত আছে দেখা যায়।

মহম্মদ "কোরাণের" মধ্যে চারিটীর অধিক দারপরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক লেখকের মতে কেহ কেহ বলেন, মহম্মদ পনরটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা "বিশ্বকোষ" দৃষ্টে তাঁহার দ্বাদশটী পত্নীর নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মহম্মদের পত্নীগণ

১। খুদিয়া—খয়ালিদের কন্যা, দেহত্যাগ ৬১৯ খৃষ্টাব্দে।
২। শুদা—জমাখার কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭৪ খৃষ্টাব্দে।
৩। আয়েসা—আবুবকরের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭৭ খৃষ্টাব্দে।
৪। হাফ্সা—উমর খত্তার কন্যা, দেহত্যাগ ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে।
৫। উম্ শালমা—আবু উম্ময়ের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে।
৬। উম্ হাবিবা—আবু সোফিয়ানের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে।
৭। জৈনব—জহশের কন্যা, "মহ্তদের দাস জৈয়দের" বিধবা-পত্নী।
৮। জৈনব—খুজীমার কন্যা, দেহত্যাগ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে।
৯। মৈমুনা—হরিতের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭১ খৃষ্টাব্দে।
১০। জবারিয়া—হরিতের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭০ খৃষ্টাব্দে।
১১। সফিয়া—হোরয়বিন্ আখতারের কন্যা, দেহত্যাগ ৬৭০ খৃষ্টাব্দে।
১২। মরিয়া কোপ্তী—ইজিপ্টদেশবাসিনী, দেহত্যাগ ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে।

বৌদ্ধসাধক দীপঙ্কর

দীপঙ্কর একজন বিখ্যাত বৌদ্ধসাধক ছিলেন। ইনি ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নাম চন্দ্রগর্ভ। ইনি বৌদ্ধদিগের দুরূহ ন্যায়দর্শন এবং তন্ত্রশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাস্ত করতঃ তীর্থিকদিগের শাস্ত্রে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন।

ইনি অল্প বয়সে সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্ম, ধ্যান ও বৌদ্ধদিগের তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য কৃষ্ণ গিরির রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। তথায় তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞানবজ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্ম, ধ্যান ও অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্বলিত ত্রিশিক্ষায় রত থাকিয়া ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দন্তপুরীতে আগমন করতঃ মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে সম্যক্ দীক্ষিত হইয়া 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি প্রাপ্ত হন।

পরে একত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন ও নানা বিষয় শিক্ষাহেতু মনের চাঞ্চল্য দূরীকরণার্থে এবং ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকান্তিকতা লাভার্থে অর্ণবযানে সুবর্ণ-দ্বীপস্থ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির

নিকট গমন করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে তিনি একটী বণিকপোতে আরোহণ করিয়া সুবর্ণ-দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করণানন্তর দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন। অতঃপর বোধগয়া মহাবোধির মঠে আসিয়া উপস্থিত হন ও তথায় মহানন্দে ধর্ম্ম চিন্তায় দিনপাত করিতে থাকেন।

দীপঙ্কর তন্ত্রশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং চিরকাল দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি তিব্বত দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ধর্ম্মসাধনে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এমন কি, তথাকার "বুস্তন" নামীয় জনৈক মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত তাঁহার যাজকপদে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার যশোবিভা ভারতের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ইনি তিব্বতে থাকিয়া অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং তিব্বত-ভাষায় অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে পনর বৎসর কাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিয়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে জৈয়ঙ্গনগরে দেহ-রক্ষা করেন।

হায়! বহু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া দীপঙ্কর ধরাধাম পরিত্যাগ করতঃ অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি চীন ও তিব্বত দেশবাসী লামাগণ আজিও তাঁহার চরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

রামানুজ স্বামী

রামানুজ স্বামী ১০১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শ্রীপরম্বতুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তোণ্ডীর মণ্ডলের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী। তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। রামানুজ বাল্যকালে পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপূর্ণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া তাঁহারই নিকট বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তিনি বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ক্রমে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তি আরো গাঢ়তর হইতে লাগিল। এমন কি, তিনি ভক্তিবলে সময়ে সময়ে বিষ্ণুপ্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি 'মতুরা' নামক স্থানে আসিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভক্তিমার্গ আশ্রয় করতঃ মুক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর গুরুদেবের সহিত কাঞ্চীপুরে আসিয়া বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে অবস্থিতি করেন। এই সময় তিনি বেদান্ত-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্কর মত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রচার দ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ করেন। তদনন্তর

তিনি কাঞ্চীপুর হইতে তিরু-পতিতে আসিয়া পবিত্র গঙ্গাতীরে কিছুদিন মহানন্দে যোগাভ্যাসে থাকিয়া সিদ্ধ হইলে, তথাকার বেঙ্কটেশদেবের পূর্ব্ব প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির সংস্কার করেন।

এই সময়ে ত্রিশিরাপল্লীর রাজা কৃমিকান্ত চোল স্বামীজীর আচার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ও সাধারণকে উত্তেজিত করতঃ পূর্ব্ব ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিতেছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হওত তাঁহার ধ্বংস সাধনের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। স্বামীজী আত্মরক্ষার্থ শ্রীরঙ্গ ছাড়িয়া মহীশূরের অন্তর্গত মেলকোট নামক স্থানে গমন করিলেন। তথাকার অধিপতি বল্লালরাজ জৈনধর্ম্মাবলম্বী, উদারচরিত ও পরম সাধু ভক্ত ছিলেন।

কথিত আছে, রামানুজ স্বামী যে সময় মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে বল্লাল-রাজ-কন্যাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছিল। বহুদেশ দেশান্তর হইতে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, গুণী প্রভৃতি আসিয়া নানারূপ প্রক্রিয়া ও দৈবকার্য্য করিয়াও কেহই তাঁহার আরোগ্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। এমন কি, অবশেষে রাজা কন্যার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীজী এ সংবাদ শুনিবা-মাত্র স্বয়ং রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কন্যার বিষয় রাজমুখে সবিশেষ অবগত হইয়া, কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধুভক্ত বল্লাল-রাজ তৎক্ষণাৎ কন্যাকে সাধু সন্নিকটে আনয়ন করিলেন। স্বামীজী কন্যাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মদৈত্যকে তাড়াইয়া দেন। রাজা কন্যার পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যলাভ ও স্বামীজীর এবম্বিধ অমানুষিক ক্ষমতা

দেখিয়া, তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "বিষ্ণু-বর্দ্ধন" নামে অভিহিত হইলেন। ইহাতে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় রাজা জৈন-গুরু ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া স্বামীজীর সহিত শাস্ত্রীয় তর্কযুক্তি করিতে বলেন। জৈন পণ্ডিতেরা ইহাতে স্বীকৃত হওত অবশেষে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। আবার কেহ কেহ অপমানজনিত ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

রামানুজ স্বামী যাদবপুরী অবস্থান কালে তথায় নারায়ণ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই নামানুযায়ী আজিও সেই স্থান "তেজ নারায়ণপুর" নামে বিখ্যাত। এই সময় ক্রমিকান্ত চোলের মৃত্যু হয়। স্বামীজী এই সংবাদ পাইয়া আবার শ্রীরঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন এবং রঙ্গনাথ স্বামীর পূজাপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া সকলকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচার ও সাধারণকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। স্বামীজী কাঞ্চীপুর, তিরুপতি, মহারাষ্ট্র, দত্তাত্রেয়-ক্ষেত্র, দ্বারকাতীর্থ, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, সারদাপীঠ, অযোধ্যা, গয়াধাম, করমণ্ডল, পদ্মনাভ, সিংহাচল প্রভৃতি নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীরঙ্গে ফিরিলেন। তদবধি তিনি সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইনি জীবনের অবশিষ্টকাল পরমার্থ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়া কত শত পাপী তাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামীজী একশত কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ব স্বরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহার রচিত অনেক গুলি গ্রন্থ আছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ স্বামী শেষ অবতার বলিয়া গণ্য। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"শ্রীমান্ রামানুজ স্বামী "শেষ অবতার"।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার ॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা শিক্ষামাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামল সুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য ॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া ॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা-অবিদ্যা-দুঃখ-সাগরেতে ভাসে ॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দুহস্ত তুলিয়া ॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চ স্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি ॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহাত্তর জন।
শিখিলা যে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্ ॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥
তাহার তাহার শিষ্য পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিকা পৃথিবীতে ॥"

মহাত্মা কবীর

কবীর সাহেবের কতকগুলি দোহা রামনামপূর্ণ এবং কতকগুলিতে সত্যনাম ও শব্দযোগ অভ্যাসের কথা দৃষ্ট হয়। এজন্য কাহার কাহার ধারণা যে, পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে দুইজন কবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথম কবীর শব্দযোগী এবং দ্বিতীয় কবীর রামভক্ত। তাহার পর সময় পরিবর্ত্তনের ও রাজ্যবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী লোকেরা একমাত্র কবীরের সত্তা বর্ত্তমান রাখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বিবরণ, দোঁহা ও রচনাদিতে বহু বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়।

কথিত আছে, কবীর সাহেব যবনবংশোদ্ভব জোলা জাতীয় ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে একজন সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই জন্মে বস্ত্র কিনিবার জন্য এক জোলার বাটীতে গমন করিয়া বস্ত্র না পাইয়া, বাটীতে প্রত্যাগমন করেন এবং সেই দিন হইতেই পীড়িত ও শয্যাশায়ী হইয়া ২।৩ দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে সেই জোলাকে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, এই হেতু জন্মান্তরে তিনি জোলাজাতীয় মনুষ্য হইলেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গুরু রামানন্দের এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য একদা আপন বিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনার্থে গমন

করেন। কন্যাটীর ভক্তিতে প্রীত হইয়া গুরু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তুমি পুত্রবতী হও। কন্যাটী যে বিধবা, গুরু তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। পরে তিনি যখন শুনিলেন যে, শিষ্যসুতা পতি-হীনা; তখন তিনি কহিলেন, "আমার কথা কখনই অন্যথা হইবে না, তুমি আমার আশীর্ব্বাদে পবিত্র গর্ভ ধারণ করিয়া, এক পরম সাধু সন্তান প্রসব করিবে।" ব্রাহ্মণ-দুহিতা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া যথাকালে পুত্র প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু লোকাপবাদভয়ে ভীতা হইয়া সন্তানটীকে কাশীর নিকটবর্ত্তী লহরাতালাও নামক সরোবরে গোপনে ভাসাইয়া দেন। নুরি নামক এক জন জোলাজাতীয় মুসলমান-নারী সেই সন্তানকে পাইয়া প্রতিপালনার্থ লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু শিশুটী তাহাকে কহিল, "আমাকে কাশীতে লইয়া চল।" নুরী, শিশুর মুখে কথা শুনিয়া, তাহাকে উপদেবতা মনে করিয়া, পথিমধ্যে ভয়ে ফেলিয়া পলাইল। অর্দ্ধক্রোশ গিয়া নুরী দেখে,—সেই শিশু সম্মুখে; তখন শিশু তাহার ভয় ভঙ্গ করিয়া কহিল, "তুমি আমাকে প্রতিপালন কর কোন ভয় নাই।" তাহার কোন সন্তানাদি না থাকায় শিশু উক্ত জোলার ঘরে পুত্রবৎ লালিত-পালিত হইতে লাগিল। পালিতা মাতা, শিশুর নাম কবীর রাখিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, কবীর বস্ত্র বয়ন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জোলাদিগের রীতি অনুসারে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। একদা গৃহে অন্ন নাই, তিনি একখানি বস্ত্র প্রস্তুত করতঃ বিক্রয়ার্থ বাজারে গমন করিলেন। তখন শীতকাল; শীতভীত বস্ত্রহীন একজন কাঙ্গালী, কবীরের হস্তে বস্ত্র দেখিয়া

তাহা যাচ্ঞা করিলে, কবীর অবিচারিতভাবে প্রফুল্লমনে তখনি তাহাকে তাহা প্রদান করিলেন। পরক্ষণে যখন তাঁহার মনে পড়িল যে, গৃহে অন্ন নাই, তখন ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানভঙ্গে রিক্তহস্তে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার পালিতা মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতকরতঃ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি এ সব খাদ্য কোথায় পাইলে?" মাতা উত্তর করিলেন, "সে কি রে! তুই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই সকল খাদ্যদ্রব্য আনিয়া আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলি, এখন আবার এরূপ কথা বলিতেছিস্ কেন?" কবীর কহিলেন, "মা! তুমি পরম ভাগ্যবতী, ভগবান্ আমার বেশ ধারণ করিয়া, তোমাকে দর্শন দান করিয়াছেন।" এই বলিয়া কবীর মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

জীবন ক্ষণভঙ্গুর। গুরুরূপী কর্ণধার ভিন্ন ভবসাগরে এই দেহতরীকে কে সঞ্চালন করিবে?—এই প্রশ্ন সতত কবীরের মনে উদিত হইত। তজ্জন্য তিনি সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা তিনি গুরু রামানন্দের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যথাবিধানে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার নিকট মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু গুরুজী কবীরকে যবন-জাত বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, তাহাতে কবীর সাহেব নিরুপায় হইয়া একদিন রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারদেশে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। পরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরুদেব

গঙ্গাস্নানার্থ মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইবার কারণ যখন বাটীর বাহিরে আগমন করিলেন, তখন গুরুর পদদ্বয় কবীরের গাত্রস্পর্শ করিল। যবন স্পর্শ হইল বলিয়া গুরু রামানন্দ "রাম কহ, রাম কহ" বলিয়া উঠিলেন। সেই রামনাম গুরুমন্ত্র জ্ঞান করিয়া, কবীর দিবা-বিভাবরী জপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা জনশ্রুতি মাত্র; কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ক কোন প্রমাণ নাই। কথিত আছে, ভগবান্‌কে দর্শন করিবার কারণ কবীরের মন নিতান্ত ব্যাকুল হইলে, দয়াময় ভগবান্ অনুকূল হইয়া সদ্‌গুরু রূপে তাঁহাকে দর্শনদান ও শব্দযোগ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

কবীর নিন্দক মৎমরো জীবো আদ অনাদ।
হামত সদ্‌গুরু পাঁইয়া নিন্দক কি পারসাদ॥

সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া কবীর সাহেব প্রকৃত সাধু ও সিদ্ধপুরুষ হইলেন। তখন তিনি হিন্দু মুসলমানদের তীর্থ-ব্রতাদির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দিল্লীর বাদসাহ সিকন্দর লোডির নিকট কবীরের নামে মুসলমান-ধর্ম্ম নিন্দার জন্য দারুণ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে বাদসাহ তাঁহাকে দূত কর্ত্তৃক লইয়া গিয়া যমুনাজলে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কবীরের কিছুই হইল না। তদনন্তর তিনি কবীরকে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিলেন; তাহাতেও কবীর মরিল না দেখিয়া, বাদসাহ ভীত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন।

কবীর সাহেব প্রাতুর্ভূত হইয়া এই জগতে অতি সহজসাধ্য এক অভিনব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কলির অল্পায়ু-বিশিষ্ট, অজ্ঞান ও তুর্ব্বল মানবগণকে তাহাদের অসাধ্য, বিশেষতঃ অতি কষ্টসাধ্য রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি কঠিন যোগসাধনা হইতে অব্যাহতি এবং নানাবিধ প্রাচীন কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে সহজ উপায়ে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি শব্দ-যোগ শিক্ষাদান করেন। কবীর সাহেব বলেন, ভগবান "শব্দরূপে" সর্ব্বঘটেই বিদ্যমান আছেন। শব্দযোগিগণ সাধনাবলে আপন আপন শরীরাভ্যন্তরেই সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং গুরুরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করেন। তিনি আরও বলেন, ভগবানকে মনুষ্যগণ কোনরূপেই দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গণের গোচর করিতে বা ধ্যানধারণায় আনিতে পারে না; এজন্য দয়াময় পরমেশ্বর জীবের উদ্ধারার্থে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সৌম্য মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। এইরূপ গুরুই সিদ্ধগুরু এবং সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর ঈশ্বরত্বের আভাস, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি নিজে কখন ভগবান্‌কে দেখিতে পান নাই, তিনি কিরূপে শিষ্যগণকে ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারেন? অতএব ঈশ্বরদর্শনকারী যে গুরু ভগবানকে দেখাইয়া দিতে পারেন, সেই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই সেবা, পূজা ও আরাধনা করা কর্ত্তব্য এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহারই প্রতি প্রীতি ও ভক্তি-প্রকাশ করা আবশ্যক।

সাক্ষাৎ গুরু ভিন্ন জগতে প্রত্যক্ষ আর কোন ঈশ্বর নাই।

মনুষ্য, মনুষ্যকেই ভালবাসিতে পারে, জড়কে বা মৃত ব্যক্তিকে ভালবাসিতে পারে না; একজাতীয় বস্তুতেই প্রেম হয়। গুরুকে ভালবাসিলে গুরুর তুল্য হইল, গুরুর তুল্য হইলেই যথেষ্ট হইল। গুরুরূপী ঈশ্বর যদি অবিকল মনুষ্যের ন্যায় ভাবাপন্ন না হইতেন, তাহা হইলে যোগসাধনপক্ষে মনুষ্যদিগের অনেক ওজর আপত্তি থাকিত এবং সেরূপ হইলে বোধ হয়, কোনকালেই মনুষ্য গুরুসদৃশ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইত না।

এইরূপ কবীর সাহেব এ জগতে অনেক লীলা করিয়া, একদা গোরক্ষ পুরের মগর গ্রামে তাঁহার শিষ্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে বস্ত্রাবৃত হওত কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে, মুসলমানগণ তাঁহার পবিত্র শরীর কবর দিতে এবং হিন্দুগণ দাহ করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে সহসা কবীর সাহেব দিব্যদেহে তথায় আবির্ভূত হওত সকলকে কহিলেন, "তোমরা বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছ কেন? অগ্রে শবাচ্ছাদিত বস্ত্র খুলিয়া দেখ, তাহার পর যথাকর্ত্তব্য করিও।" ইহা শুনিয়া তাহারা আগ্রহ-পূর্ব্বক শবাবৃত বস্ত্র উন্মোচন করিলে, কবীরের দেহ দেখিতে পাইল না;—দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি পুষ্প দৃষ্টিগোচর হইল। অমনি কবীর সাহেব অন্তর্হিত হইলেন। পরে কাশীর রাজা তদৰ্দ্ধ নিজ রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক দাহকরতঃ সেই ভস্মরাশি তথায় নিহিত করিলেন, এই স্থানকে কবীরচৌরি বলে। মুসলমানাধিপতি পাঠান বিজলিখান অপরার্দ্ধ কবীরের মগরগ্রামে প্রোথিত করিয়া, তদুপরি এক সমাধি নির্ম্মাণ

করেন। এই উভয় স্থানই কবীরপন্থীদিগের তীর্থস্থান। কবীরপন্থীরা কহেন, কবীর সাহেব তিনশত বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১২০৫ সংবতে কবীরের জন্ম হয় এবং ১৫০৫ সংবতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কবীর সাহেবের লিখিত অনেকগুলি দোঁহা আছে। দোঁহাগুলি প্রাণের সহিত কথা কয়, মনের সহিত মিশে, আবার ঘোর সংসারীর মোহান্ধকার ঘুচায়। প্রকৃতই তাঁহার দোঁহাগুলি ভবঘোর—নিবারক মোহভঙ্গকারী সুধাময় উপদেশ বাক্য। তাই সাধারণের হিতার্থে জ্ঞানগর্ভ কয়েকটী দোঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবীর সাহেবের দোঁহা

কবীর তে নর অন্ধ হায় গুরুকো কহতে আউর।
হরিকে রুটে ঠৌর হায় গুরু রুটে নহি ঠৌউর॥ ১

হে কবীর! যে ব্যক্তি গুরুকে গুরু জ্ঞান না করিয়া অন্য কোন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ করে, সে ব্যক্তি অন্ধ। ভগবান্ রুষ্ট হইলে, গুরুর শরণাপন্ন হওয়া যায়, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর নিস্তার নাই। ১

ঝুটে গুরুকি পক্ষকো ত্যজৎ ন কিজে বার।
দ্বার না পাওয়ে শব্‌দকা ভটকে বারম্বার॥ ২

মিথ্যা গুরুর অনুসরণে আশু ক্ষান্ত হও; তাহা না হইলে শব্দরূপী ভগবানের দ্বারের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইবে না; সুতরাং

ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া, বারম্বার ভবসাগরে নিমজ্জিত হইবে। ২

কান ফুঁকা গুরু হদকা বেহদকা গুরু আওর।
বেহদকা গুরু যব মিলে তো লাগে ঠিকানা ঠৌর॥ ৩

কাণ ফুঁকা গুরু সামান্য, অসামান্য গুরু যিনি,—তিনি অন্য রকম। সেই অসামান্য গুরু যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই পরিত্রাণের একটা স্থির নিশ্চয় হইল, ইহা জানিও। ৩

গুরু সমান দাতা নেহি যাচক শিষ্য সমান।
চার লোক কি সম্পদা সো গুরু দিন্‌হি দান॥ ৪

গুরুতুল্য দাতা নাই এবং শিষ্যের সমান যাচক নাই। কেননা, চারিলোকের যে সম্পত্তি ভগবান্, গুরু শিষ্যকে সেই সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। ৪

কবীর যোহি গুরুতে ভয় না মেটে ভ্রান্তি মন্ কি না যায়।
গুরুতো য়্যায়সা চাহিয়ে যো দেই ব্রহ্ম দরশায়॥ ৫

হে কবীর! যে গুরু হইতে মনের ভ্রম এবং ভবভয় ভঞ্জন না হয়, এমন গুরুতে প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিতে পারেন, সেই গুরুই অন্বেষণ করা আবশ্যক। ৫

মালা ফেরত মন খুশী তাতে কছু না হোয়।
মনমালাকে ফেরতে ঘট উজিয়ারী হোয়॥ ৬

কাষ্ঠমালা হস্তে ফিরাইলে যদিও তাহাতে কাহার কাহার মনস্তুষ্টি হয়, কিন্তু ফলে কোন লাভ নাই। যদি মনমালা ফিরাইতে

পারা যায়, তাহা হইলে ঘট অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তর দীপ্তিশীল হয়। ৬

কবীর অজপা সুমিরণ হোত হেয় কহ শাস্ত কহি ঠোর।
কর জিহ্বা সুমিরণ করে ইয়ে সব মনকি দৌড়॥ ৭

কবীর বলেন, অজপা স্মরণই সাধকের একমাত্র স্থান, তদ্ভিন্ন মালা জপা এবং রসনা দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করা মনের দৌড় মাত্র ; প্রকৃত কায তাহাতে কিছুই হয় না। ৭

কবীর মনমালা সদ্‌গুরু সেই, পবন সুরবিনতা পোনয়।
বিনু হাতে নিশিদিন্ ফিরে ব্রহ্মজপ তাঁহা হোয়॥ ৮

কবীর বলিতেছেন, সদ্‌গুরু মনোরূপমালা জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের গ্রথিত মালা, বিনা হস্তে দিবারাত্রি ফিরিবে, তাহাতে ব্রহ্মনাম জপ হইবে। ৮

চলো চলো সব কোই কহে পহুচে বিরলা কোই।
এক কনক অরু কামিনী দুর্গম ঘাটি দোই॥ ৯

ঈশ্বরের নিকটে চল চল সকলেই বলে, কিন্তু পৌঁছিতে পারে এমন ব্যক্তি অতি বিরল। যেহেতু কামিনী-কাঞ্চন রূপ দুই প্রবল ঘাটি অতিক্রম করিয়া গমন করা, নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার। ৯

কবীর হাউস্ করে হরি মিলন্‌কি আওর সুখ চাহে অঙ্গ।
পীড়্ সহে বিনু পদুমিনী পুতন লেৎ উচ্ছঙ্গ॥ ১০

কবীর বলেন, হরিকে লাভ করিতে সাধ হয় বটে, কিন্তু শরীরের সুখও ইচ্ছা করে। স্ত্রীলোক সন্তান কামনা করে, কিন্তু প্রসব

বেদনা সহ্য করিতে ইচ্ছা করে না। প্রসব-কষ্ট সহ্য না করিলে যেমন পুত্রলাভ করা যায় না, তেমনি সাধনকষ্ট সহ্য না করিলেও হরিকে পাওয়া যায় না। ১০

এক রাহে সে হোতে হৈঁ পুত আউর মূত।
রাম ভজে তো পুত হৈঁ নহিঁ তো মূতকা মূত॥ ১১

পুত্র এবং মূত্র একই পথ হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু যদি রাম ভজনা করে, তবেই পুত্রকে পুত্র বলা যায়, নচেৎ উহা মূত্রের মূত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ১১

আয়ে হ্যাঁয় সো যায়েঙ্গে রাজা রঙ্ক ফকির।
এক সিংহাসন চড় চলে এক বাঁধে যাত জিঞ্জির॥ ১২

রাজা, গরীব ও ফকির সকলে আসিয়াছে, সকলেই যাইবে। কিন্তু কর্ম্মের গুণদোষে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যাইবেন, কেহবা শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া যাইবে। ১২

তন কো যোগী সব কোই করে মন যোগী করে না কোয়।
সহজে সব সিধ পাইয়ে যো মন যোগী হোয়॥ ১৩

শরীরকে সকলে যোগী সাজাইয়া থাকে, কিন্তু মনকে যোগী কেহই করে না। যদি মনকে যোগী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ১৩

এ ছাড়া তাঁহার আরো অসংখ্য দোঁহা আছে। "বসাক এণ্ড সন্সের"—সাধু তুলসী দাস, মহাত্মা কবীর, মীরাবাই, সহজীবাই প্রভৃতির দোঁহাবলী দেখুন।

মীরাবাই

মীরাবাই মারবার প্রদেশের (রাজপুতানার) অন্তর্গত মেরতা গ্রামের অধিপতি রাঠোর-বংশীয় রতিয়া রাণার কন্যা ও চিতোরের রাণা কুম্ভের পত্নী। ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ও রূপে গুণে সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয়া ছিলেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ইনি আবির্ভূত হন। শৈশব হইতেই ইঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়াছিল। ইনি রাজমহিষী হইয়াও ভোগবাসনা-বিষয়লিপ্সা সকলই পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম-পরায়ণা হইয়া অহরহঃ নাম কীর্ত্তনে দিনাতিপাত করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই মীরাবাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজপুতানার গৃহে গৃহে মীরার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। সকলেই মীরার নিকট আসিতে, দেখিতে ও কথোপকথন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ভক্ত-বৎসলা মীরা তাহা ভালবাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে থাকিয়া, উপবনে দেবালয়ে সরোবর-তীরে হরিগুণ গানে বিভোর থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও সুললিত কণ্ঠধ্বনি একত্রে মিলিত হইয়া দর্শক মাত্রকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি ধূলাখেলা ছাড়িয়া সঙ্গিনীগণ সহ হরিসংকীর্ত্তনে রত থাকিতে ভালবাসিতেন, মীরা পুষ্পমালা গ্রহণপূর্ব্বক যখন কুসুমাভরণভূষিতা ও চন্দন-চর্চ্চিতা হইয়া

ভক্তির মোহন-মন্ত্রে হরিগুণ গান করিতেন, তখন তাঁহাকে যিনি দেখিতেন তিনিই দেববালা বলিয়া অভিবাদন করিতেন—যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এইরূপে মীরার রূপলাবণ্য ও সঙ্গীতখ্যাতি অচিরে দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশ বিদেশ হইতে ভক্তগণ কিন্নরকণ্ঠী মীরার সুস্বরলহরী শুনিবার জন্য ব্যাকুল-প্রাণে দলে দলে মেরতায় আসিতে লাগিল। মীরার পিতা যথোচিত অভ্যর্থনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

চিতোরের যুবরাজ কুম্ভ-রাণার কর্ণে মীরার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও সঙ্গীত-শক্তির কথা প্রবেশ করায় তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। মনে বড় সাধ—একবার মীরার ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও তাঁহার কল-কণ্ঠের মধুর-কাকলী শ্রবণ করিয়া চক্ষু ও কর্ণ সার্থক করিবেন। তিনি সাহিত্যসেবী, সুকবি, প্রেমিক ও নম্র ছিলেন। মারবারে তাঁহার মাতুলালয় ছিল; তিনি প্রজা ও লোকনিন্দা ভয়ে মাতুলালয়ে যাইবার ছল করিয়া ছদ্মবেশে মীরার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। তখন কুসুমালঙ্কৃতা চন্দন-চর্চ্চিতা মীরা বহুলোকাকীর্ণ হইয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। রাণা মীরার সৌন্দর্য্য যাহা দেখিলেন ও কণ্ঠস্বর যাহা শ্রবণ করিলেন, তাহাতে চিত্র-পটের ন্যায় স্থির ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইলে সকলেই নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন, কেবল কুম্ভ-রাণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মীরার পিতা রাণার আকার প্রকার দেখিয়া ও তাঁহাকে কোন

সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব মনে করিয়া তথায় অবস্থান করিতে ও আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন। রাণা কহিলেন, মহাশয়! আপনার কন্যার সঙ্গীত-সুধা এখনও আমার কর্ণে মধু-বর্ষণ করিতেছে; শ্রবণ-লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। মীরার পিতা তাঁহাকে ২।৪ দিন তথায় অবস্থান করিয়া সঙ্গীত শ্রবণের জন্য অনুরোধ করেন ও মীরাকে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন। রাণা তাহাই চাহিতেছিলেন, কাযেই তিনি স্বীকৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি রাণার অতৃপ্ত দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর আরো বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কুম্ভ-রাণা প্রকৃতিস্থ হইয়া মীরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ও আসিবার কালীন একটী হীরক-অঙ্গুরী প্রদান করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, মীরা! এ স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া আমি চিতোরে কি করিয়া ফিরিয়া যাইব? মীরা! আর আমি আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না, বল মীরা! বল, চিতোরের রাজ-মহিষী হইতে তোমার কি কোনও আপত্তি আছে? মীরা শ্রবণমাত্র তাঁহার চরণতলে নিপতিতা হইয়া কহিলেন, মহারাণা! মার্জ্জনা করুন, না জানিয়া আমরা আপনার চরণে শত সহস্র অপরাধে অপরাধী। দাসীর অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করুন।

মহারাণা মীরাকে তুলিয়া হৃদয়ে ধরিলেন ও বলিলেন, বল মীরা! বল, কুম্ভ-রাণার এ সাধ পূর্ণ হইবে ত? মীরার পিতা অজ্ঞাতসারে এই শেষ কথাটী শুনিয়া কুম্ভ-রাণার পরিচয় পাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা



সঙ্গীত-সুধা এখনও আমার কর্ণে মধু-বর্ষণ করিতেছে

পৃঃ—৮৬

করিলেন এবং অচিরে মীরাকে মহারাণার করে সম্প্রদান করিলেন।

মীরা চিতোরেশ্বরী হইলেন বটে, কিন্তু নিজের সুখ হারাইলেন। রাজ-প্রাসাদের অনন্ত-ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মীরা শ্বশুরালয়ে থাকিয়া মুক্ত-প্রাণের উদার সঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতে না পারায় অশান্তিতে রোগাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাণা মীরার এইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অন্যমনা করিবার জন্য কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করাইলেন। মীরা প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সুকবি হইয়া উঠিলেন। এমন কি, কুম্ভ অপেক্ষা তাঁহার রচনা অধিকতর প্রসাদগুণশালিনী হইতে লাগিল। এই সময় তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময় ভক্তিরসাত্মক রচনার অবতারণা করেন এবং জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দেরও টীকা রচনা করেন। ইহাতেও মীরার অশান্তি ঘুচিল না দেখিয়া ও কারণ অবগত হইয়া রাণা মীরার ইচ্ছানুক্রমে রাজপুরীর মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং তাঁহারই প্রার্থনা-ক্রমে বৈষ্ণববেশী সকলকেই গোবিন্দ-জীউর মন্দিরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন।

এখন মীরার আর সে ভাব নাই, সে অশান্তি নাই, তিনি দিবারাত্র বৈষ্ণবদিগের সহিত সম্মিলিত হওত হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

একদিকে যেমন মীরা পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনই কুম্ভ-রাণা অশান্তিতে জড়ীভূত হইতে লাগিলেন।

চিতোরের রাজমহিষী হইয়া অসঙ্কুচিতভাবে সর্ব্বসমক্ষে সঙ্গীত করিবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি মীরার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। একদা নিদ্রাযোগে রাণা স্বপ্ন দেখিলেন, চিতোরের রাজকুল-দেবতা তাঁহাকে আদেশ করিয়া বলিতেছেন, "সাবধান, মীরা কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিণী পরমসতী, ভক্তির সজীব নির্ঝরিণী; তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ করিও না।" নিদ্রোত্থিত হইয়া রাণা স্বীয় সন্দেহজনিত অপরাধ জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং মীরাকে ডাকাইয়া কহিলেন, মীরা! তুমি অদ্য হইতে গোবিন্দদেবের মন্দিরে বা চিতোরের প্রকাশ্য রাজপথে যেখানে ইচ্ছা সর্ব্বসাধারণের সহিত মলিত হইয়া প্রেমোল্লাসে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে।

রাজপ্রাসাদে গোবিন্দজীউর মন্দিরে সকলে আসিতে সাহস করিত না। এখন প্রকাশ্য রাজপথে থাকিয়া সকলেই মীরার সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, দিল্লীর-সম্রাট আকবর তান্‌সেনকে সঙ্গে লইয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বর্ণনার মূলে কোন সত্যতা নাই, কারণ আকবর ১৫৪২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ১২২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কি করিয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে পারেন! ভক্তমাল গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

প্রকৃত ঘটনা—কোন উদাসীনবেশী মহারাজ মীরার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বহুমূল্য মুক্তামালা গোবিন্দজীউর কণ্ঠে অর্পণ করেন। ক্রমে

ইহা রাণা-কুম্ভের কর্ণে উঠিলে, তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ মুক্তার মালা দেখিতে আসিলেন। ঐ মালার মূল্য অন্যূন দশলক্ষ টাকা হইবে। সন্দিগ্ধচিত্ত মহারাণা ভাবিলেন যে, কেবল গান শুনিয়া, কেহ দশলক্ষ টাকা প্রদান করিতে পারে না। নিশ্চয়ই মীরার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য প্রলোভন স্বরূপ ঐ মুক্তামালা উপহার দিয়াছেন। আরো ভাবিলেন, হয় ত মীরা অপার্থিব সম্পদ সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিয়াছে। এইরূপ নানা চিন্তায় চিত্ত আন্দোলিত করিতে করিতে মীরা দুশ্চরিত্রা বোধে রাণা তরবারির আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি মীরাকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে বলেন। মীরা আর কোন কথা না কহিয়া গভীর নিশীথে ভক্তিভরে গোবিন্দ-জীউকে প্রণাম করিয়া সকলের অলক্ষিত ভাবে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। পতিব্রতা মীরা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদীগর্ভে নিমজ্জিতা হইলেন। মীরা নদীগর্ভে পতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন ও স্বপ্নে দেখিলেন, একজন বনমালা-বিভূষিত গোপালরূপী বালক তাঁহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিতেছে। পরে ঐ বালক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিল, মীরা! তুমি পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। পতির আজ্ঞা পালন করাই সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমার অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহা এখনও শেষ হয় নাই। অতএব উঠ, সংসারক্লিষ্ট নরনারীকে ভক্তির পবিত্র গাথা শুনাইয়া কর্ত্তব্য পালন কর।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া মীরা যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি আর নদীগর্ভে নাই, সৈকত-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মীরা এক্ষণে হরিগুণ গান করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। সঙ্গে সেই বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ পথে খাদ্য যোগাইতে যোগাইতে পথ প্রদর্শক-স্বরূপ চলিলেন। এইরূপে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। মীরার আগমনে সমস্ত বৃন্দাবন যেন কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

মীরা বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বারকার শ্রীমন্দিরে কৃষ্ণপ্রতিমা দর্শনকালে মীরা প্রেমাশ্রুবারি দিয়া প্রতিমার চরণ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। মীরার প্রেম-ভক্তিতে প্রতিমা বিভক্ত হইলে, মীরা তন্মধ্যে অন্তর্হিত হন। মতান্তরে কথিত আছে, মীরা চিতোরের গোবিন্দ জীউর সহিত ঐরূপভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছেন।

মীরাবাই একেশ্বরবাদী ছিলেন। নানকপন্থী ও কবীরপন্থীদিগের সহিত ইঁহার মতের কতক মিল আছে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও মীরার পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

যবন হরিদাস

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের সন্নিকটে বুড়ন গ্রামে ১৩৭৯ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে সুমতি ঠাকুরের ঔরসে ও গৌরী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, জননী গৌরী দেবীও তখন স্বামীর সহিত সহমরণে* প্রাণ-পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নিরাশ্রয় বালক হরিদাস যবন কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বাল্যকাল হইতে হরিদাস ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তিনি দীক্ষিত হইয়া একে একে মুসলমান-ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থ-পাঠে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অতঃপর বৈষ্ণব-প্রবর অদ্বৈতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তাঁহার নিকট ভক্তি-বিষয়ক অনেক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন। প্রথমে অদ্বৈত তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, পরে তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করতঃ প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী জানিয়া হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া হরিদাস সকল কায-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সতত হরিনাম করিতেন। সুধাসম হরিনাম দিবারাত্র জপ করিতে তাঁহার বাসনা বলবতী হওয়ায়, তিনি ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী

* স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দেহ বিসর্জ্জন করার নাম সহমরণ।

অরণ্যে এক কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মনের সাধে একমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস মুসলমান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা হিন্দুর ন্যায় হরিনাম করিয়া হিন্দুর সহিত মিশায় ও হিন্দু-ধর্ম্মের পোষকতা করায়, স্থানীয় কাজী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরে ইঁহাকে পুনরায় মুসলমান-ধর্ম্মে আনয়নার্থ বিশেষরূপ চেষ্টা করেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হওয়ায় তিনি ইঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতেও ইনি কোন ক্রমে হরিনামত্যাগে স্বীকৃত না হওয়ায়, কাজীর পরামর্শে নবাব অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ইঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া হত্যা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞানুসারে পাইকগণ বেত্রাঘাত করিলেও ইঁহার মৃত্যু হইল না; কিন্তু ইনি গভীরধ্যানে অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে থাকায় লোকে মনে করিল যে, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে কাজীর পরামর্শে ইনি নবাব কর্ত্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। অতঃপর ইনি ভাসিতে ভাসিতে তীরে উঠিয়া, নবাবকে দেখিয়া হাস্য করিলেন। তখন নবাব ইঁহাকে প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং ইঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া, ইঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণে অনুমতি দিলেন।

অতঃপর হরিদাস সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বলরাম আচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়া মহানন্দে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি শান্তিপুরে আসিয়া ভাগীরথী-তীরে নবোল্লাসে হরিপ্রেমে মাতিয়া উঠিলেন। হরিদাস প্রত্যহ লক্ষাধিক হরিনাম না করিয়া জল-গ্রহণ করিতেন

না। জনৈক জমীদার হরিদাসের পরীক্ষার্থ সাধনের বিঘ্ন উৎপাদন মানসে একদা রজনীতে এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে কুটীরে পাঠাইয়া দেন। রমণী কুটীরে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও তাঁহার জপ শেষ হইল না দেখিয়া, সে প্রাতে স্বগৃহে গমন করিল এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় আগমন করিল। দ্বিতীয় রাত্রি ঐরূপেই জপে অতিবাহিত হইল, তৃতীয় রাত্রিও ঐরূপে অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতে হরিদাস তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, রমণী তাঁহার পদতলে নিপতিতা হইয়া, আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইনি তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই কুটীরবাসী হইয়া হরিনাম জপ করিতে আদেশ করিয়া, নিজে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

ইহার পর হরিদাস নবদ্বীপে গমন করতঃ বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ ইঁহার প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া চমকিত হওত ইঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাস তথায় গিয়া উপস্থিত হন ও সাধুগণে বেষ্টিত হইয়া পরমসুখে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

হরিদাসের অন্তিম কালে চৈতন্যদেব শিষ্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তনাদি আরম্ভ করিলে, হরিদাস তাঁহাদের সমক্ষে হরিনাম জপ করিতে করিতে দেহ রক্ষা করেন। অতঃপর চৈতন্যদেব তাঁহার পবিত্র-দেহ সমুদ্রতীরে আনয়নপূর্ব্বক বালুকাগর্ভে সমাহিত করেন।

গুরু নানক

"নানক সাহ অথবা বাবা নানক" ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণস্থিত কানাকুচা গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দ্বিপ্রহর রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী, তিনি ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদী তাঁহাদের উপাধি। নানক অল্পবয়সে ও অল্পসময়ের মধ্যেই স্বীয় অমানুষী শক্তির বলে সংস্কৃত, পারসী ও গণিত-বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও চিন্তাশীল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য ও সাংসারিক ভোগসুখে তাঁহার নিতান্ত বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মে রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন; তজ্জন্য নিজ হইতে চল্লিশটী টাকা দিয়া নানককে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টার কোন ফল বা সে অনুরোধ প্রতি-পালিত হইল না। নানক, পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া, অনাহারী উদাসীন ফকিরদিগকে ভোজন করাইলেন।

কালুবেদী পুত্রের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন এবং পুত্র এখনও ব্যবসায়ে অনুপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহাকে গৃহপালিত গো-মহিষাদি চারণে ও অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যাঁহার মন ধর্ম্মোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, ঈশ্বর-প্রেমে অনুপ্রাণিত, তাঁহার গতি রোধ করে, কার সাধ্য?

নানক সাহ যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে উদার ও বিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বা তাঁহার গুরুই বা কে ছিলেন, এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই। যাহা হউক, তিনি যোগমার্গে যে খুব উন্নত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যোগাসনে বসিয়া তিনি অবলীলাক্রমে অনাহারে তিন চারিদিন থাকিতে পারিতেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি তীর্থ-পর্য্যটন কালে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একদা বুদ্ধা নামক কোন ব্যক্তিকে নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে বলেন। বুদ্ধা তাঁহার কথামত পুষ্করিণীতে গিয়া দেখেন, তাহাতে আদৌ জল নাই, মাটি ধূলাবৎ শুষ্ক হইয়া আছে। পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানককে পুষ্করিণীর অবস্থা জ্ঞাপন করেন। ইহা শুনিয়া নানক বলিলেন, "যাও পুনরায় গিয়া দেখ, উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।" বুদ্ধা পুনরায় গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন; বাস্তবিকই পুষ্করিণী উত্তম পানীয়জলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। অচিরে এই সংবাদ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপিয়া পড়ায়, গ্রামবাসীরা সকলেই দলে দলে নানক সাহকে দেখিতে আসিলেন। শুষ্ক পুষ্করিণী হঠাৎ স্বচ্ছ বারিপূর্ণ দেখিয়া সকলেই বিস্ময়-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং নানকের গুণ-গরিমা শ্রবণ করিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইলেন। শুষ্ক পুষ্করিণী হঠাৎ জলপূর্ণ হওয়ায়, তত্রস্থ

লোকেরা উহার অমৃত সায়র নাম দিয়াছিল। সেই অমৃত সায়রই আজকাল "অমৃত-সর" নামে অভিহিত। ইহা শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

রামদাস নামীয় একজন শিখগুরু ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পুষ্করিণী উত্তমরূপে খনন করাইয়া উহার মধ্যস্থলে নানকের স্মরণ চিহ্ন-স্বরূপ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেই মন্দিরের সংস্কার করিয়া সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। ইহা সুবর্ণ-মন্দির বা আধুনিক ভাষায় গোল্ডেন টেম্পল (Golden temple) বলিয়া খ্যাত।

তিনি অন্ধবিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন। যাহাতে হৃদয়ে শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ও উদারভাবে ঐশ্বরিক-তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সারকার্য্য বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইত।

একদা নানক শিষ্য সমভিব্যাহারে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ কালীন, পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে মুসলমান বিবেচনা করিয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। নানক তাহাদেরই কথামত দ্বারে উপবেশন করেন ও শিষ্যদিগকে বলেন, "কোন চিন্তা করিও না, ভগবান স্বয়ং আমাদিগকে এইখানেই ভোগান্ন প্রদান করিবেন।"

সন্ধ্যা সমাগমে নানক স্তব স্তুতি আরাধনা ও কাতরোক্তি দ্বারা ভগবানকে আনয়ন করেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, রাত্রিকালে ভগবান স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-পাত্রে ভোগান্ন প্রদান করিয়

যান। নানক প্রসাদ পাইয়া ভক্তি-গদ্‌গদভাবে দেবতাকে অভিবাদন করেন ও তথায় গঙ্গাজলের অভাব থাকায়, তিনি গঙ্গাজল প্রার্থনা করেন। তাঁহার কাতরোক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান মৃত্তিকায় পদাঘাত করতঃ গঙ্গা আনয়ন করিয়া অন্তর্হিত হন। প্রাতঃকালে পাণ্ডারা নানকের নিকট আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া ও নূতন কূপ দর্শন করতঃ স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই ঘটনা অচিরে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই কূপ এক্ষণে গুপ্ত-গঙ্গা নামে বিখ্যাত। ইহা শিখ অতিথিগণের আশ্রয় স্থান।

নানক সন্ন্যাসী-বেশে ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, আরবের উপকূল অতিক্রম করতঃ ফকিরদিগের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিলেন; কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সর্ব্বত্রই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসী-বেশ ত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীতটে "কর্ত্তারপুর" নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা তাঁহার প্রধান ভক্ত ক্রোড়িয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই অনুরোধে নানক এই ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্যসম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া, জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে কর্ত্তারপুর নগরে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নানক সাহ তাঁহার প্রধান শিষ্য অঙ্গদকে আপনার বেশভূষা অর্পণ করিয়া জীবলীলা সাঙ্গকরতঃ

নিজ পবিত্রদেহ রক্ষা করেন। ঐ স্থানে বৎসরে একটী করিয়া মেলা হইয়া থাকে।

নানক, মৌলাযৌনা নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের সুলখ্না নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলখ্নার গর্ভে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীচন্দ্র উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। নানকের লিখিত আদিগ্রন্থে তদীয় মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। নানক শব্দযোগী ছিলেন। কবীর-পন্থীদিগের সহিত এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

নানকের মতে সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অনাবশ্যক। ইঁহার শিষ্যগণ শিখনামে পরিচিত। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ শিখ হইয়াছে।

শিখ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-গুরু দশজন। ১ম গুরু নানক। ২য় নানকের শিষ্য অঙ্গদজী। ৩য় অঙ্গদের শিষ্য অমরদাস। এই-রূপ পর পর ৪র্থ রামদাস, ৫ম অর্জ্জুন, ৬ষ্ঠ হরগোবিন্দ, ৭ম হররায়, ৮ম হরকিষণ, ৯ম তেগবাহাদুর, ১০ম গুরুগোবিন্দ। ইনিই শিখদিগের শেষ গুরু। ইঁহার পর আর কেহ গুরু-পদ প্রাপ্ত হন নাই।

চৈতন্য মহাপ্রভু

ইঁহার পূর্ণনাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। চৈতন্যদেব একজন অদ্বিতীয় ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। যে সময়ে বৌদ্ধগণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার-দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে যত্নপর হইয়াছিলেন,—ইহার অনতিবিলম্বেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিকমতের সূত্রপাত হয়। তান্ত্রিক-গণও তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া, পশুহিংসা ও সুরাপানাদি ব্যভিচারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া তুলে। তৎ-কালে বৌদ্ধ, যবন ও তান্ত্রিকদিগের অত্যাচারে ভারতের ধর্ম্মভাব বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি-দিগের যারপরনাই কষ্ট হইতে লাগিল ও তাঁহারা হিংসাপূর্ণ, ভক্তিহীন ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তি ও সর্ব্বজীবে দয়াধর্ম্ম এই মুখ্য-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক, বিদ্যানিধি, নিত্যা-নন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় স্বধর্ম্মানুরাগী বৈষ্ণব জন্ম-গ্রহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয় নাই। তাঁহারা পাষণ্ডদিগের প্রবল অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সন্নিধানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জগৎপিতা জগদীশ্বর ভক্তের কষ্টে

আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না। অত্যল্পকালমধ্যেই ভারতাকাশে চৈতন্য চন্দ্রের উদয় হইল। বৈষ্ণবসম্প্রদায়দিগের মধ্যে চৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক বৈষ্ণব-কবি চৈতন্যচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে, শাক্ত ও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসকল তাঁহাকে সাধুভক্ত ও ধর্ম্মপ্রচারক ভিন্ন অপর কিছুই বলিতে চান না। যাহা হউক, নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পর মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারক বা আদর্শ-পুরুষ ভারতের অথবা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব ভক্তগণ চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনার্থ অনন্তসংহিতা, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের যে সকল লক্ষণ লিখিত আছে, তাহার সহিত চৈতন্যচন্দ্রের জীবনীর অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিবার এমন কিছু বিশেষ বাধা দেখা যায় না। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব লইয়া অনেক বাদানুবাদের পর নিম্নলিখিত মতে ইহার মীমাংসা হয়।

"চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ" অর্থাৎ চৈতন্য-দেব কেবলমাত্র ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তিনি পূর্ণ বা অংশা-বতার নহেন। এই মীমাংসা হইবার পরই জনৈক অশেষ শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত, উপরোক্ত শ্লোকের বিপরীত ব্যাখ্যাকরতঃ তাঁহার

ঈশ্বরত্ব স্থাপন করেন। চৈতন্যচন্দ্রের জীবনী আদি ও অন্তলীলা ভেদে দ্বিবিধ। অন্তলীলাও আবার মধ্য ও শেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভব জিতমিশ্রের বংশে জগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উপেন্দ্র মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র পাঠসমাপনান্তে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপে বাস করেন। ইঁহার অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, বৈদিককুলোদ্ভব নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আপন কন্যা শচীদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। জগন্নাথ ও শচীর প্রথমে সন্তানভাগ্য তাদৃশ সুপ্রসন্ন ছিল না। কারণ, প্রথম হইতেই একটী একটী করিয়া আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে ও সকলগুলিই অকালে কালকবলিত হয়। ইহার অল্পকাল পরে শচীদেবীর গর্ভে বিশ্ব-রূপের জন্ম হয়। ইনিই চৈতন্য-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ। অতঃপর ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে সিংহলগ্নে নবদ্বীপধামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। কথিত আছে, চৈতন্য-দেবের জন্মসময়ে চন্দ্র-গ্রহণ হইয়াছিল। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে বালককে জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রানুসারে বিশ্বম্ভর নাম প্রদত্ত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ব-রূপ তাঁহাকে নিমাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন! তাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরপ্রযুক্ত পল্লীস্থ রমণীগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, কেহ কেহ বা গৌরচন্দ্র বলিয়াও ডাকিতেন। ১৪০৮ শকে বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে মহাসমারোহে নিমাইয়ের অন্নপ্রাশন সমাহিত হইল এবং তৎপরবর্ষেই অর্থাৎ ১৪০৯ শকে ৫ই বৈশাখ চূড়াকরণ শেষ হইল। বাল্যকালে নিমাই সাতিশয়

চঞ্চল ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যে পল্লীস্থ সকলে যারপরনাই উৎপীড়িত হইত ও তাঁহার পিতামাতার নিকট সর্ব্বদাই অভিযোগ উপস্থিত করিত। চৈতন্যের বাল্যজীবনে এমন কোন অলৌকিক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে তাঁহার পূর্ণ ঈশ্বরত্বের প্রতিপাদন হয়। তবে বৈষ্ণব কবিগণ, তাঁহাদিগের গ্রন্থে অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা করেন। যাহা হউক, চৈতন্য একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপ ভিন্ন জগতের মধ্যে কাহাকেও ভয় করিতেন না। বিশ্ব-রূপ বাল্যকাল হইতেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রাত্রিকালে গৃহত্যাগ করতঃ পিতামাতাকে শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জগন্নাথ মিশ্র মনে করিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলে পাছে নিমাইও ঐ পথের অনুসরণ করে, এই আশঙ্কায় নিমাইয়ের বিদ্যাশিক্ষায় কিছু অমনোযোগী হইলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভাবলে ও অসাধারণ স্মরণশক্তি হেতু যাহা শিক্ষা করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না এবং চতুষ্পাঠীতে তাঁহার সমকক্ষ কোন ছাত্রই ছিল না। এই সময়ে ১৪১৬ শকে নিমাইয়ের উপনয়ন হয়। কিয়দ্দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র সমস্ত পরিজনবর্গকে কাঁদাইয়া, জীবন-লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যে পুত্রবধূমুখ-নিরীক্ষণ আর ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক, এক্ষণে শচীদেবীর সাতিশয় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। যারপরনাই কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল,—তাহার উপর অবুঝ নিমাইয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই তিনি অবসন্ন

হইতেন। কথিত আছে, এই সময়ে নিমাই অলৌকিক শক্তিবলে গঙ্গাতীর হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া, মাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অল্পবয়সে সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। কোন পণ্ডিত ন্যায়ের টীকা লিখিয়া নিমাইয়ের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "চৈতন্যের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে ?" তাহাতে চৈতন্যদেব নিজ টীকা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যশঃসৌরভে সমগ্র নবদ্বীপ আমোদিত হইয়া উঠিল ও তৎসঙ্গে তাঁহাদেরও অর্থকষ্ট দূর হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপ-নিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে সশিষ্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার শ্রীহট্টগমনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে বাসকালীন তদীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীবিয়োগ-বার্ত্তাশ্রবণে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। অতঃপর মাতার অনুরোধে নবদ্বীপের প্রধান রাজ-পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের একটী প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি শান্তিসুখে বঞ্চিত হইয়া, মস্তিষ্কের অপ্রাকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং মনোবিকার নিবারণার্থ গয়াধামে গমন করেন। চৈতন্যচন্দ্র গয়াধামে গমন করিয়া, গদাধর-পাদ-পদ্মে পিতৃ-পিণ্ড প্রদানানন্তর কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, অহর্নিশ হরিগুণগানে নিযুক্ত থাকি-

তেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীও যোগীর সম্মিলনে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রকাশ হইল। ইনি ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বর প্রেমে অভিভূত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন ও ক্রন্দন করিতেন। এই সময়ে চৈতন্যদেবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইল। অকিঞ্চিৎকর ভোগ-বিলাস ও পাণ্ডিত্য-গৌরবে মন এখন উঠিবে কেন? এখন সেই শ্রীহরির চরণের জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত হইয়াছে;—প্রাণ শান্তি-সমুদ্রে ভাসিতে চাহিতেছে। এইরূপ সুগভীর গাঢ়-চিন্তায় বাতুল হইয়া চৈতন্য, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চৈতন্যদেবের ঈদৃশ ভাব অবলোকনে পরিজনবর্গ অতীব দুঃখিত হইলেন এবং নবদ্বীপবাসীমাত্রেই পণ্ডিত-প্রধান তর্কপ্রিয় চৈতন্যদেবের ভাবান্তর দর্শনে বিস্মিত হইলেন। চতুষ্পাঠীতে মন নাই, অধ্যাপকতা ভাল লাগে না, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বাক্যালাপ করেন না, কেবল নবদ্বীপস্থ ভক্তমণ্ডলীর বিশেষতঃ শ্রীবাস, অদ্বৈত, নিমাই, হরিদাসাদির সহবাসেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কখনও বা ভক্তগণের পদধারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা ভাবাবেশে বিভোর হইয়া 'কৃষ্ণ কৃপা কর, কৃষ্ণ কৃপা কর' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, কখন বা রাধাভাবে আপনাতে প্রেমের উচ্চভাব আনিয়া, জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মধুরভাবে সম্ভোগ করিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই সঙ্কীর্ত্তনাদি হইত ও ভক্তগণ তথায় সমবেত হইতেন। ভক্তগণ চৈতন্যের ঈদৃশ অলৌকিক ভাবদর্শনে ও প্রেমোচ্ছ্বাস অবলোকনে বিস্মিত হইতেন এবং ক্রমে চৈতন্যকেই ভক্তশ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া, প্রবীণেরাও মান্য ও ভক্তি করিতে লাগি-

লেন। নিতাই রাঢ়া-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ এবং বাল্যাবস্থা হইতেই ভক্ত-সন্ন্যাসী ছিলেন। চৈতন্যের সহিত নিতাইয়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল এবং চৈতন্য নিতাইকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অদ্বৈতও চৈতন্যের একজন মহাভক্ত ছিলেন। আবার শ্রীবাস ও যবন হরিদাসাদির ইতিহাসও অলৌকিক, ইঁহারা সকলেই চৈতন্যের মহাভক্ত এবং প্রেমিক ছিলেন। ইঁহারা গৌরাঙ্গদেবের পারিষদ ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে ইঁহারা গৌরাঙ্গ-গণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নাগরিক ভক্তদ্রোহিগণের উৎপীড়নসত্ত্বেও পরিজনবর্গের বাধা-বিপত্তিতেও চৈতন্যদেবের হরি-সঙ্কীর্ত্তন নবদ্বীপে এত বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল যে, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মোপদেশ ও হরি-ভক্তির কথা শ্রবণেচ্ছায় দলে দলে নর-নারী আসিতে লাগিল। নবদ্বীপ প্রেমভক্তিতে পরিপ্লুত হইল। শোকতাপক্লিষ্ট মানবেরা শান্তি-সমুদ্রে বিচরণ করিবার জন্য, চৈতন্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন বিষয় বুদ্ধি, স্বার্থপরতাদি লোপ পাইবার উপক্রম হইল, এমন কি ঘোর কলি অন্তর্হিত হইয়া যেন সত্যযুগ আগমন করিল। চৈতন্যের সহচর নিতাই ও যবন হরিদাস দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া মধুর হরি-নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে যেমন এক দিকে সাধু-গণের আনন্দ, তেমনি অন্যদিকে পাষণ্ড-গণের অসহনীয় বিদ্বেষ হইয়াছিল। বিশেষতঃ জগাই মাধাই সমধিক আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া, নিতাইকে সংহার করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু অভি-লষিত বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়ায় উহাদের দ্বিগুণ আক্রোশ হইয়া-

ছিল। নিত্যানন্দদেবও উহাদের অধর্ম্মের প্রতিকারার্থে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছিলেন। একদা পথিমধ্যে জগাই মাধাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, নিতাই বলিলেন ভাই জগাই মাধাই! একবার "হরি বল"। ইহাতে মাধাই সক্রোধে ও সজোরে কলসীর কানা নিতাইয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিল। আঘাতে শতধারে শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু নিত্যানন্দ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া, সানন্দচিত্তে বলিলেন ভাই! মেরেছ, বেশ ক'রেছ, একবার "হরি বল"। তাহাতে মাধাইয়ের ক্রোধ বর্দ্ধিত হওয়ায় সে কহিল, "কি, আবার হরি বলিস্" এই কথা বলিয়া নিতাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন জগাই তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিল, "ওরে মাধাই, সর্ব্বনাশ হ'বে, এমন সন্ন্যাসীকে কখন প্রহার করিস্ না।"

জগাইয়ের হৃদয় বিগলিত ও মোহে ভাসিল। সে আশ্চর্য্য ক্ষমা, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও দেবতার ন্যায় ভাব দেখিয়া, নিতাইয়ের পদ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং "ঠাকুর, আমি বড় পাষণ্ড, আমায় দয়া কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎপরে হরিদাসপ্রমুখাৎ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের প্রহারসংবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, সপারিষদে তথায় আগমন করিলেন; মাধাইও অপ্রতিভ, লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিল এবং পাপ অনু-শোচনায় তাহার হৃদয়ে এক অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; গৌরা-ঙ্গকে দেখিয়া সে ভাব আরো উত্তেজিত হইল, জগাইও সাধুভাব-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, পাপপথ পরিত্যাগের বাসনা করিল। নিত্যা-

নন্দ, চৈতন্যদেবের ক্রোধ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ভাই! রাগ করিও না, জগাই আমার প্রাণের দোসর, আজ জগাই আমার জীবন রক্ষা করিল।" চৈতন্য শান্ত হইলেন এবং অতিশয় আনন্দিত ও জগাইয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনদানে কহিলেন "ভাই জগাই! আজ তুমি আমায় কিন্‌লে, নিত্যানন্দের একগাছি কেশ আমার প্রাণস্বরূপ, এ হেন নিত্যানন্দের প্রাণ তুমিই রক্ষা ক'রেছ।" মাধাইয়ের হৃদয়ের বেগ আর সম্বরণ হইল না, সে দ্রুতবেগে চৈতন্যচরণে নিপতিত হইয়া কহিল, "দয়াল ঠাকুর! প্রভু! রক্ষা কর, তোমা ভিন্ন পাষণ্ড মাধাইয়ের পরিত্রাতা আর নাই।" চৈতন্য বলিলেন, "তুমি মহাজনের শরীরে আঘাত ক'রেছ, অগ্রে নিত্যানন্দের প্রসন্নতা লাভ কর, পরে তোমাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিব।" মাধাই, নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিল। দুরাচার দস্যু—যাহাদের ভয়ে নদীয়াবাসীরা শশব্যস্ত থাকিত, এ হেন জগাই মাধাই, মহাপুরুষের কৃপায় নবজীবন লাভ করিল। নবদ্বীপে ধর্ম্মভাব ও হরিসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। সামান্য নবদ্বীপে আর কত হইবে, এজন্য সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ, শচীদেবীকে কাঁদাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার আশা নির্ম্মূল করিয়া, নবদ্বীপধাম আঁধার করিয়া, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ চব্বিশ বৎসর বয়সে কালনার সিদ্ধমহাপুরুষ কেশবভারতীর নিকট দণ্ডগ্রহণ বা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। নানা দেশে ভক্তগণসহ হরিনাম প্রচার করিয়া, অবশেষে নীলাচলেই চৈতন্যদেব

জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস করেন। নীলাচলের রাজা ও তদীয় সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, উভয়েই চৈতন্যপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবাবের উজীর 'রূপ' তদীয় ভ্রাতা 'সনাতন' 'স্বরূপ'প্রভৃতিও চৈতন্যের পথানুসরণ করেন। তাঁহারা অতুলবৈভব মান-সম্ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের শিষ্য হন এবং চৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনধামে গিয়া বাস ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন। কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেম ও ভক্তি দর্শনে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইবার পর, কখন স্ত্রীলোকের হাতে পর্য্যন্ত খান নাই। ছোট হরিদাস নামক জনৈক শিষ্য কোন রমণীর নিকট ভিক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া, চৈতন্যদেব তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বাঙ্গালায় হরিনাম প্রচার করিতেন। রথ-যাত্রা উপলক্ষে বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেকে চৈতন্যচরণ-দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতেন। চৈতন্যদেবের মতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিভেদ ছিল না। যে হরিনাম বলিত, সেই ধার্ম্মিক বা বৈষ্ণব। যিনি নামে প্রচারক ও বিশেষ ভক্তিমান্, তিনিই গোস্বামী। এই মহাপুরুষের দেহত্যাগ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দেহ পাওয়া যায় নাই, জগন্নাথদেবের সহিত মিলিত হইয়াছে। যাহা হউক, অশেষগুণসম্পন্ন প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক চৈতন্য যে অসাধারণ ব্যক্তি, সে বিষয় সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল ঈদৃশ ভক্তের পথাবলম্বীরা বৈষ্ণবধর্ম্ম বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। গৌরচন্দ্র

চব্বিশ বৎসর গৃহবাস করিয়া, ছয় বৎসর নানাতীর্থে পর্য্যটন করিয়া, আঠার বৎসর নীলাচলে থাকিয়া, লোকশিক্ষা ও স্বধর্ম্ম প্রচার করেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ও বিস্তর শিষ্য ছিলেন। ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি যে কোথায় গমন করিলেন, তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে শচীদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পর বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। শেষ জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের উপর ঐ সেবার ভার অর্পণ করতঃ দেহত্যাগ করেন।

আজিও নবদ্বীপে যে চৈতন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত।

উদ্ধারণ ঠাকুর

উদ্ধারণ ঠাকুর চৈতন্যদেবের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। ১৪০১ শকে ত্রিবেণী-তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে শ্রীকর দত্তের ঔরসে ভদ্রাবতীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকর দত্ত একজন শাণ্ডিল্য গোত্র-ধারী প্রসিদ্ধ বণিক্ ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থো-পার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ সমস্ত বিষয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হন। সেই সময় তিনি একটী জমী-দারী খরিদ করিয়া নিজের নামানুসারে উহার নাম উদ্ধারণপুর রাখিয়াছিলেন। আজও কাটোয়ার সন্নিকটে উহা বিদ্যমান আছে।

ইনি পরম সাধু-ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ ধর্ম্ম-প্রচারার্থে সপ্ত-গ্রামে আসিলে তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ইঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত ও বৈরাগ্যোদয় হয়। তখন তিনি অতুল ভোগৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া নীলাচলে গমন করেন ও তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৪৬০ শকে মাঘ মাসে সমাধিস্থ হন।

কথিত আছে, একদা পরমারাধ্যা, শিবসাধ্যা, মহাবিদ্যা, শক্তি-স্বরূপিণী জগজ্জননী বালিকাবেশে পথি মধ্যে কোন শাঁখা বিক্রে-তার নিকট হইতে শাঁখা লইয়া উদ্ধারণ ঠাকুরের নিকট হইতে মূল্য

লইতে বলেন। শাঁখারী বলিল, যদি তিনি আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া মূল্য না দেন? তাহাতে বালিকা বলিলেন, তুমি তাঁহাকে বলিবে, আপনার নিকট টাকা না থাকিলে পূর্ব্বদিকের ঘরের পশ্চিম কুলিঙ্গায় আপনার মেয়ের পাঁচটী সুবর্ণ মুদ্রা আছে, তাহা হইতে মূল্য দিতে বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি না দেন, তবে এখানে আমার নিকট আসিয়া শাঁখা ফেরত লইয়া যাইও। ফলতঃ তাহাই হইল, শাঁখারী উদ্ধারণ ঠাকুরের নিকটে গিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। তিান শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, বাপু হে! আমার ত কোন কন্যা নাই; তবে অন্য কেহ শাঁখা লইয়া আমার নাম করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, অগ্রে কুলিঙ্গা দেখিয়া আসি, পরে যাহা ভাল হয় করিব।

উদ্ধারণ ঠাকুর শাঁখারীর কথামত কুলিঙ্গায় সত্য সত্যই পাঁচটী সুবর্ণ-মুদ্রা রহিয়াছে দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ মেয়ে সামান্য বালিকা নহে, নিশ্চয়ই স্বয়ং শক্তি-স্বরূপিণী জগজ্জননী। পরে তিনি শাঁখারীর নিকট আসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বালিকার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি শাঁখারীকে বলিলেন, ভাই রে! তুমি অতি ভাগ্যবান, তুমি মাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না। তখন শাঁখারী বুঝিল, জগদম্বা তাহারই নিকট বালিকারূপে শাঁখা পরিয়াছেন। ইহা জানিয়া শাঁখারী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ও বলিল, মা! তুমি যে বলিয়াছিলে এইখানে এলে আমার দেখা পাবে, কৈ মা। একবার দেখা দাও মা। শাঁখারীর এইরূপ

কাতরোক্তিতে আদ্যাশক্তি দয়াদ্র্য হইয়া শঙ্খ-পরিহিত হস্ত দুইখান তুলিয়া দেখান।

"শ্রীকর-নন্দন দত্ত উদ্ধারণ
ভদ্রাবতী-গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত॥
বিষয় বাণিজ্য সাংসারিক কার্য্য
মল-প্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে রাখিয়া আবাসে
হইলা বিবেকাচারী॥
নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে
সদা ইতি উতি ধায়।
আশা ঝুলি লয়ে ভিখারী হইয়ে
প্রসাদ মাগিয়া খায়॥"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

কাবেরী-নদীতীরস্থ রঙ্গক্ষেত্রের অন্তর্গত বেনকুণ্ড নামক গ্রামে ইহার বাস ছিল। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিদ্যাগৌরবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎকালে কাশীতে যত দণ্ডী দেখা যাইত, ইনি তাহাদের প্রায় সকলের গুরু ছিলেন। ইহার ন্যায় বৈদান্তিক ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতও তৎকালে দৃষ্ট হইত না। প্রকাশানন্দ ঈশ্বরের পৃথক্ অস্তিত্ব অথবা অবতার স্বীকার করিতেন না। ভক্তমালে লিখিত আছে।

"ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে?"

এদিকে ঠিক সেই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহার সহিত প্রকাশানন্দের বিবাদ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ প্রকাশানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট চৈতন্যের ভক্তিপথে গমন করিয়াছে শুনিয়া, প্রকাশানন্দ চৈতন্যের প্রতি বিরূপ হইলেন এবং তাঁহাকে একবার নিকটে পাইলে তিনি দেখিবেন, তাঁহার ভক্তি প্রেম কোথায় থাকে, এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দুইজনে সম্মিলিত হইবার আশা অতি অল্প দেখিয়া তিনি অধৈর্য্য হইলেন। তৎপরে একটী যাত্রীকে পাইয়া, তদ্দ্বারা একটী শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুকে মূঢ় বলিয়া গালি দিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ তদুত্তরে একটী

উপদেশসূচক শ্লোক লিখিলেন। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীর রাজা, তাঁহাকে উপদেশ দান? তজ্জন্য এবার স্পষ্টরূপে গালি দিয়া একটী শ্লোক পাঠাইলেন। মহাপ্রভু গালাগালির উত্তর আর কি দিবেন, তাই তিনি নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু তিনি উত্তর না দিলেও তাঁহার জনৈক শিষ্য শ্লোকের উত্তর দিলেন। অনন্তর প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের ফাঁদে পড়িয়াছেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ছিলেন, ইহাতে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল—ভাবিলেন, চৈতন্য একজন ঐন্দ্রজালিক। তৎ-পরে চৈতন্য কাশীধামে আগমন করিলে, প্রকাশানন্দ চৈতন্যের অনেক নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। উভয়ের কেহই পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। অবশেষে একদা জনৈক কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সন্ন্যাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলে, গৌরাঙ্গ বিপ্রের আগ্রহে তথায় গমন করেন ও প্রকাশানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে সভায় আসিলে, সহস্র সহস্র শিষ্যে পরিবেষ্টিত প্রকাশানন্দ গৌরাঙ্গকে চিরশত্রু জানিয়াও অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। পরে গৌরাঙ্গের বিনয়নম্রবচন শ্রবণে ও বিনীত ব্যবহারে, বিশেষতঃ তাঁহার মধুর মূর্ত্তিদর্শনে প্রকাশানন্দ মোহিত হইলেন। অতঃপর দুইজনে তর্ক আরম্ভ হইয়া পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল, শেষে বেদান্তের কথা উঠিলে, মহাপ্রভু কহিলেন,—

"গৌণ বৃত্তে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য॥" (চৈঃ চঃ)

এইবার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের দোষ বলায় মহাগোল বাধিল; প্রকাশানন্দ কহিলেন, শঙ্করের দোষ প্রদর্শন কর? তখন মহাপ্রভু আশ্চর্য্যভাবে— "—প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।

শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ।"

প্রকাশানন্দ সহজে ছাড়িবেন কেন, বলিলেন, তোমার দূষণ শুনিলাম, এক্ষণে—"মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।"

তখন—"মুখ্যার্থ লাগাল প্রভু সূত্র সকল॥" (চৈঃ চঃ)

প্রকাশানন্দের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তিনি দেখিলেন, যিনি শঙ্করের ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। দেখিলেন,—বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্য্যে কেহই চৈতন্যের তুল্য নয়। তখন তিনি সহস্র সহস্র শিষ্য সম্মুখে চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়াই ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। সেই সময়েই গৌরাঙ্গ তাঁহার অন্তরে ভক্তিবীজ প্রদান করিলেন। ক্রমে তাঁহার সাধন ভজন গৌরব্যতীত আর কিছুই রহিল না। গৌর গৌর করিয়া তিনি উন্মত্তপ্রায় হইলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে, প্রকাশানন্দকে বৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি করিলেন ও সেই সময় বলিলেন, আজ হইতে তোমার নাম প্রবোধানন্দ হইল। তৎপরে বৃন্দাবনে গিয়া প্রকাশানন্দ নন্দকূপে বাস করিতে লাগিলেন। নন্দকূপে প্রকাশানন্দের সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইনি চৈতন্যচন্দ্রামৃত বা বৃন্দাবনশতক ও সঙ্গীতমাধব গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশানন্দের ভক্ত হওয়া ও তাঁহাকে ভক্ত করা এ উভয়ই অদ্ভুত কার্য্য। বৈদান্তিককে ভক্তি দান—মহাপ্রভুর অদ্ভুত লীলা।

গোরক্ষনাথ

ইনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। কবীর সাহেবের বীজেক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময়েই গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। হিন্দীতে কবীর ও গোরক্ষনাথের কথোপকথন-বিষয়ে প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়; ইহাতেই বোধ হয়, তিনি ঐ সময়ের লোক অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক লোক তাঁহার অসাধারণ যোগ কৌশল দেখিয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কি নৃপতি, কি সামান্য দরিদ্র ব্যক্তি, সকলেই গোরক্ষনাথের সমাদর করিতেন। তিনিও সেইরূপ সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কণ্‌ফট্‌ যোগীরা ইঁহাকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যথা—

"আদিনাথকে নাতী মচ্ছন্দ্রনাথকে পূত।
মৈঁ যোগী গোরখ অবধূত।"

এই প্রবাদ বচনে ইনি মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়। আবার হঠযোগ-প্রদীপিকা গ্রন্থে ইনি নয়নাথের এক নাথ অর্থাৎ নয়জন গুরুর মধ্যে এক জন বলিয়া উল্লেখ আছে। যাহা হউক, গুরু গোরক্ষনাথ হঠযোগের অনেকটা প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং তিনি কতক-পরিমাণে পাতঞ্জলের মতও প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মতে জাতিভেদ ছিল না; যোগীই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যোগ-সাধন দ্বারা মানব সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইনি মহাযোগী এবং মহাসিদ্ধ হইয়াও হঠযোগ-সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গোরক্ষ-কল্প, গোরক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-সহস্র, গোরক্ষ-পিষ্টিকা প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়, অবশিষ্ট গ্রন্থ কালসহকারে লুপ্ত হইয়াছে। ইঁহার নামানুসারে ইঁহার জন্মস্থান গোরখপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

নরোত্তম ঠাকুর

নরোত্তম ঠাকুর একজন মহাভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রামপুর-বোয়ালিয়ার কিছু দূরে গড়েরহাট পরগণায় খেতরী নামক গ্রামে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইঁহার জন্ম তারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট ছিলেন, তখন ইহার আবির্ভাব হয়।

রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ জমীদার ইঁহার পিতা ও নারায়ণী ইঁহার মাতা ছিলেন। শৈশবেই নরোত্তমের অদ্ভুত প্রতিভা ও অসাধারণ গুণ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল।

ইনি চৈতন্যদেবের এক জন ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা শুনিয়া নরোত্তম গৌর-প্রেমে মজিলেন। বালক খেলা ধূলা ছাড়িয়া সর্ব্বদা গৌর-চরিত্র শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত আছে যে, মহাপ্রভু রামকেলীতে আগমন করিয়া পদ্মার অপর পারে দণ্ডায়মান হওত কৃষ্ণাবেশে "নরোত্তম! নরোত্তম!" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে নরোত্তমের জন্ম হয়। মহাপ্রভু পদ্মানদীর নিকট নরোত্তমের জন্য প্রেমধন গচ্ছিত রাখেন। একদা নরোত্তম নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নরোত্তম! কল্য প্রত্যূষে তুমি পদ্মাতে স্নান করিতে যাইও,

তথায় মহাপ্রভুর গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।” নরোত্তম স্বপ্নাদেশে প্রত্যুষে উঠিয়া পদ্মাতে স্নান করিতে যান।। স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। মহাপ্রভুর দয়ায় তাঁহারই গচ্ছিত প্রেমধন পাইয়া তিনি নূতন ভাবাপন্ন হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি ভাবাবেশে কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন।

নরোত্তম ১৬ বৎসর বয়সের সময় খেতরা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। রাজার পুত্র হইয়াও তিনি শূন্য পদে পথ হাটিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

“আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায় হইল ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥”

এইরূপে বহুকষ্টে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হওয়ায় তিনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন। একদা সাধু দর্শনে বহির্গত হওত লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল এবং মনে মনে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতি-বাহিত হইলে নরোত্তম যখন শুনিলেন, লোকনাথ গোস্বামীর দৃঢ় সঙ্কল্প যে তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, তখন তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নরোত্তম বহুদিন তাঁহার

সেবা শুশ্রূষা ও অনেক সাধ্য সাধনার পর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন।

নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া "ঠাকুর মহাশয়" আখ্যা প্রদান করেন। এই সময় হইতে তিনি "নরোত্তম ঠাকুর" নামে অভিহিত হন।

নরোত্তম পিতা মাতার চরণ দর্শনোদ্দেশে খেতরীতে আগমন করেন ও তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে যান। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অল্পদিন হয় অপ্রকট হইয়াছেন। দেখিলেন মহাপ্রভুর পাদুকা, শয্যা, জলপাত্র, বসিবার আসন প্রভৃতি সকল চিহ্নই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্তা।

নরোত্তম শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাটী কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ত্রিবেণীতে উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে আগমন করেন ও তথা হইতে খানাকুল অভিরাম গোস্বামীর বাটী হইয়া নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলা-চিহ্ন আরো সজীব রহিয়াছে। অতঃপর নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া প্রভৃতি যে যে স্থানে প্রভুর লীলা বা তাঁহার যে কোন ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন, সকল স্থানেই গমন করিয়া পুনর্ব্বার খেতরীতে আগমন করিলেন।

তিনি খেতরীতে আসিয়া বিগ্রহ স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যে যেখানে আছেন, সকলেই

নিমন্ত্রিত হইয়া খেতরীতে আসিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে কীর্ত্তনাদি, পাঠ ও নানা বিষয়ের শ্লোক রচনা আরম্ভ হইল। নরোত্তমের পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনাদিতে বিভোর হইয়া ধন-রত্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। নরোত্তমের প্রস্তাবে অনেকেই একমত হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। তিনি কায়স্থ হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

নরোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত কথা কহিতেন। তাঁহার একটী পদ্যের কিয়দংশ এই,—

"নব-ঘন-শ্যাম ও পরাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার সে মুখ-শশী অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।"

নরোত্তম গাম্ভিলা গ্রামে আপন প্রিয়শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্র-বর্ত্তীর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি পীড়িত হইলেন। গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অত্যাশ্চর্য্যরূপে দেহত্যাগ করেন। দেহ মার্জ্জন করিবেন কি! নরোত্তম বিলাসে লিখিত আছে,—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে॥

দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥"

তিনি কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে অন্তর্দ্ধান হন। উক্ত তিথিতে নরোত্তমের মহোৎসব হইয়া থাকে। তিনি "প্রার্থনা" "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" "হাটপত্তন" "চৌতিশা পদাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রন্থে নরোত্তমের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সে নরোত্তম ভিন্ন ব্যক্তি।

রূপগোস্বামী

রূপগোস্বামী একজন পরম-ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন। ইনি কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশধর। ইঁহার দুই ভ্রাতা ছিল,—সনাতন ও বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামীও ইঁহার শিষ্য ও পরম ভক্ত ছিলেন। রূপগোস্বামী বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নৈহাটীর সন্নিকট রামকেলী গ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল। ইনি বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইনি গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন সাহের উজীর ছিলেন। গৌড়েশ্বর ইহার বিবিধ গুণে পরিতুষ্ট হইয়া ইহাকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করতঃ সাকর-মল্লিক * উপাধি প্রদান করেন। যবনের দাসত্ব করিতেন বলিয়া ইনি কখনও আত্মধর্ম্ম ভুলেন নাই। স্বীয় কাননে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে দুইটী জলাশয় খনন করাইয়া, ইনি তাহাকে কদম্বকাননে পরিণত করিয়া, তাহাতেই যুগলরূপের উপাসনা করিতেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, একদিন প্রত্যূষে মুষলধারে বৃষ্টিপাত ও মেঘের গর্জ্জনে চারিদিক বিকম্পিত হইতেছে, এমন সময় রাজাদেশে রূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতায় রাজবাটীতে গমন করিতে-

---

* সাকর-মল্লিক—সাকর অর্থে জ্ঞানবান ও মল্লিক অর্থে মর্য্যাদাশালী।

ছিলেন, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, একটী কুটীর হইতে কোন ভিক্ষুক-পত্নী তদীয় স্বামীকে গাত্রোত্থান করিয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতে কহিলে ভিক্ষুক কহিল, এখনও প্রভাত হয় নাই এবং এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন সময়ে মনুষ্যের বহির্গমন অসম্ভব, শৃগালাদি পশুরাও এ সময় বাসস্থান ছাড়িয়া বহির্গত হয় না, একমাত্র ক্রীত-দাসেরাই প্রভুর আদেশপালনার্থ এইকালে গৃহ-ত্যাগকরতঃ আদেশ পালন করে। ভিক্ষুকের এবম্বিধ বাক্য-শ্রবণে শ্রীরূপের চৈতন্যোদয় হইল; দাসত্বে তাঁহাকে শৃগালাদি অপেক্ষা হেয় করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তিনি সেই দিনই প্রভুর নিকট অবসর লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন।

ইনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময়েই মহাপ্রভুর সংবাদ পাইয়া, তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালীন শ্রীরূপকে রামকেলী গ্রামে সন্দর্শন করিয়া যান। তৎপরে নীলাচলে যাইয়া শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন; কিন্তু প্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। তথায় থাকিয়া তিনি ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্ধবদূত, উপ-দেশামৃত, হরিভক্তি রসামৃত সিন্দুরবিন্দু প্রভৃতি বিস্তর ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ৪৩ বৎসর বৃন্দাবনে বৈরাগ্যাবস্থায় অতি-বাহিত করেন। ১৪১১ শকে ইঁহার জন্ম ও ১৪৮০ শকে ইঁহার অন্তর্ধান হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ প্রেম ও মাধুর্য্যভাবে পরি-পূর্ণ। রূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতায় একত্র হইয়া ভক্তিরসামৃত-

সিন্ধু রচনা করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত এবং পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাত।

ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মগরিমা আদৌ জানিতেন না। একদা জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার নিকট নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। পরে সেই পণ্ডিত গর্ব্বিতমনে ইঁহার শিষ্য জীবগোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে, তথায় তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হন। অবশেষে এই কথা শ্রীরূপ গোস্বামীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি শিষ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি জয় পরাজয় আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, তবে কেন তুমি সেই জয়াভিলাষী পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া নিজে দীনতার সহিত তাঁহার মান বৃদ্ধি করিলে না? জীব! তুমি এখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মভেদে অসমর্থ।

ইঁহার ভ্রাতা সনাতনও পরে বিষয়বিরাগী হইয়া শেষে কিরূপ ভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিলাম।

সনাতন গোস্বামী

বাঙ্গালায় "রূপ সনাতন" এক নামে বিখ্যাত। ইনিও গৌড়ের নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে, ইনি গৃহে রহিলেন। নিজ বুদ্ধিগুণে ও কার্য্য-কৌশলে ক্রমে ইনি রাজার মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ঘোর সংসারী হইলেন। স্বার্থ-সাধন-জন্য কাহারও সুবিধা অসুবিধা ইনি দেখিতেন না, সুতরাং ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া উঠিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সনাতন নিজ বাসভবন প্রসারণার্থ এক নিঃস্ব ব্যক্তির ভদ্রাসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। উক্ত দরিদ্র ব্যক্তি তাহা কোন মতে দিতে স্বীকৃত না হইলেও, ইনি যে কোন প্রকারে হউক লইবেন মনস্থ করিলে উক্ত ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া, বৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপের নিকট গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করিলেন। তদীয় ভ্রাতা রূপগোস্বামী তাহা শুনিয়া সেই দরিদ্রের হস্তে এক পত্র দেন, তাহাতে সঙ্কেতে লেখা ছিল, যথা—"যরী, রলা, ইরং, নয়" এই আটটী অক্ষর। উক্ত ব্যক্তি সেই লিপি স্বদেশে আসিয়া সনাতনের হস্তে দেন। সনাতন উক্ত আটটী অক্ষরে প্রত্যেক চরণের আদি ও অন্ত অক্ষর ধরিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোক পূরণ করিলেন।

(য) যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, (রী)
(র) রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। (লা)
(ই) ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং, (রং)
(ন) ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥ (য়)

অর্থাৎ যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতির উত্তর কোশলই বা কোথায়? এই সকল চিন্তাকরতঃ মন স্থির কর, আর এই জগৎ যে অনিত্য তাহাও ধারণা কর।

শ্লোকের মর্ম্ম অবগত হইয়া ইঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন ইনি সেই দরিদ্রের আবাসভূমি লাভের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোযোগ ও অর্থলালসা পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজ-কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া, গৃহে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। নবাব ইহাতে রুষ্ট হইলেন এবং রাজকার্য্যে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ইনি মনোনিবেশ না করায় নবাব ইঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তৎপরে ইনি সাত সহস্র মুদ্রা কারাধ্যক্ষকে দিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। অবশেষে চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, বৃন্দাবনে গিয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

সনাতন একদা চৈতন্যদেবের দর্শনোদ্দেশে বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। দৈবযোগে পথিমধ্যে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ায় চৈতন্যদেবের সম্মুখে গমন করা অপকর্ম্ম বিবেচনা করায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন মনস্থ

করিলেন। অতঃপর ইহার চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সনাতন লজ্জায় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে থাকেন ও বলেন, প্রভু! আমি নীচ, তাহাতে আবার ঘৃণিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, অতএব আমাকে স্পর্শ করিবেন না। দয়াবতার চৈতন্যদেব তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমার দেহ অতি পবিত্র, তোমায় ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। চৈতন্যদেব যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, সনাতন! তুমি রথচক্রে দেহ বিসর্জ্জন দিতে মনস্থ করিয়াছ, কিন্তু ভাই! তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবে না। একমাত্র সাধন ভজন ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় নাই। তুমি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর, দেহ নির্ব্ব্যাধি হইবে। ফলতঃ চৈতন্যদেবের কথায় তাহাই হইল।

সনাতন গোস্বামী একদা যমুনায় স্নান করিতে গিয়া স্পর্শমণি দেখিতে পান, তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হইলে তাহার বিশেষ উপকার হইবে। অতএব কোন স্থানে রাখিয়া দেওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি তাহা স্পর্শ না করিয়া, একখণ্ড খাপরা দ্বারা ধরিয়া এক স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। দৈবযোগে মানকরনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহুবৎসর ধরিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীধামে অর্থাকাজ্ক্ষায় শিবারাধনা করায় পশুপতির আদেশ হইল যে, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট হইতে তোমার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইবে। শিবাজ্ঞায় বিপ্র বহুধনের আশা করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের

সাক্ষাৎকার লাভ করিল। ব্রাহ্মণের নাম জীবন; সে তৎসকাশে আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত কহিলে, সনাতন কহিলেন, আমি দরিদ্র ভিক্ষুক মাত্র, ধনসম্পত্তি কোথায় পাইব? কিন্তু জীবন-ব্রাহ্মণের অনেক অনুনয় বিনয় ও কাতরোক্তি দেখিয়া তাঁহার স্পর্শমণির বিষয় স্মরণ হইল। তখন তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, সেই পূর্ব্ব-প্রোথিত স্পর্শমণিটী তাহাকে উত্তোলন করিয়া লইবার জন্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। বিপ্র তাহা লইয়া ভাবিল, সনাতন কেনই বা তাহা লয় নাই এবং উহা দান ঘৃণার দ্রব্যভাবে করিল, নিজেও তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। এই সকল ভাবিয়া তাহার মনে হইল, অবশ্য সনাতন ইঁহাপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন লাভ করিয়াছে, তাই ইহা তাহার আবশ্যকে আসিল না। ইত্যাকার নানা বিষয় ভাবিয়া সেও সেই স্পর্শমণি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের জন্য এতদূর আসিয়াছি ভাবিয়া নিজকে ধিক্কার দিল। অনন্তর সে সনাতনের নিকট মন্ত্র ভিক্ষা চাহিল। সনাতন তাহাকে সংসারে থাকিয়া গৃহে গিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে কহিলেন। তখন বিপ্র সেই স্পর্শমণি যমুনায় নিক্ষেপ করিল। ইহা দেখিয়া সনাতন, ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই কথা শুনিয়া স্পর্শমণিলাভার্থ সাংসারিক লোক সকল যমুনা আলোড়ন করিল; না পাইয়া শেষে হস্তীপদে জিঞ্জীর পরাইয়া অনুসন্ধান করা হইলে, হস্তীপদস্থ জিঞ্জীর স্বর্ণে পরিণত হইল; কিন্তু স্পর্শমণি কেহ অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হইল না।

জয়দেব

বীরভূমজেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্বগ্রামে প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল জয়দেব গোস্বামী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম বামাদেবী। এই ভোজ-দেব, বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগ উপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষের বংশ-জাত। জয়দেব "গীতগোবিন্দ" নামক বিশ্ববিখ্যাত মধুর গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় এমন মধুর সুললিত ভাবপূর্ণ কাব্য কোন দেশে কোন কবি রচনা করেন নাই। তাই বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় উল্লেখ-যোগ্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও মাইকেলের "মেঘনাদ বধ কাব্য"। যে গৃহে এই দুই খানি গ্রন্থ নাই সে গৃহ শোভাশূন্য।

জয়দেবের বাল্য লীলা ও শিক্ষাদির বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি যৌবনকালে অবিবাহিতাবস্থায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থিতি করতঃ ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করিতেন। তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন বাসগৃহ ছিল না। তিনি সচরাচর বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন। তিনি পরমবৈষ্ণব এবং জগন্নাথ-দেবের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। কোন সময়ে অপুত্রক এক বিপ্রদম্পতী

জগন্নাথের নিকট মানস করিয়াছিলেন যে, "হে দেব ! তুমি আমাদিগকে পুত্রবান্ কর। তোমার কৃপায় আমাদিগের প্রথমে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহা পুত্র হউক বা কন্যা হউক, আমরা তাহাকেই তোমার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিব ; অর্থাৎ সেই সন্তানটী তোমাকে উৎসর্গ করিয়া দিব।" অনন্তর যথাকালে তাহাদের একটী কন্যা জন্মে। কন্যাটী ১০।১১ বৎসর বয়স্কা হইলে, তাহারা তাহাকে জগন্নাথের মন্দিরে আনিয়া জগন্নাথকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। জগন্নাথদেব রাত্রিকালে বিপ্রদম্পতীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, "পদ্মাবতীকে আমার গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা তাহাকে লইয়া গিয়া পুরুষোত্তমপ্রবাসী জয়দেব সন্ন্যাসীর সহিত বিবাহ দাও।" ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী জগন্নাথের আজ্ঞামতে পদ্মাবতীকে লইয়া বৃক্ষতলস্থিত জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জগন্নাথের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন ; সবিশেষ শ্রবণকরতঃ জয়দেব অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, "আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না।" তখন দ্বিজদম্পতী বলিলেন, "জগন্নাথের আজ্ঞা, অতএব আপনি পদ্মাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করুন।" জয়দেব কহিলেন, "জগন্নাথের এ আজ্ঞা বড়ই অসম্ভব ! আমি এ বিষয়ে কখনই সম্মত হইতে পারি না, আপনারা কন্যাটীকে লইয়া জগন্নাথকেই দিন বা যাহা ইচ্ছা করুন।" ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী বলিলেন, "জগন্নাথ যখন পদ্মাবতীকে আপনার পত্নীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাই বলবতী হইবে। কন্যাটী আপনার নিকট রহিল, আমরা চলিলাম।" এই বলিয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জয়দেব পদ্মাবতীকে কহিলেন, "তুমি যথাস্থানে গমন কর, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব না।" তখন পদ্মাবতী বলিলেন, "জগন্নাথদেব অনুমতি করিয়াছেন, আর পিতামাতা তোমার করে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তুমি আমার পতি। আমি কায়-মনোবাক্যে তোমারই পদসেবা করিব।" জয়দেব আর কি করেন, অগত্যা পদ্মাবতীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। এখন জয়দেব আর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নহে—গৃহিণীসংযোগে গৃহবাসী গৃহস্থ হইলেন।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

এই বচন অনুসারে তিনি সস্ত্রীক স্বদেশে কেন্দুবিল্বগ্রামে আসিয়া রাধামাধবনামে যুগল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকরতঃ সেই রাধামাধবের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিগ্রহসেবা করিতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ সংগ্রহার্থ তিনি বৃন্দাবন ও জয়পুর অঞ্চলে গমন করিলেন। এদিকে পদ্মাবতী গৃহে থাকিয়া বিগ্রহ সেবা করিতে লাগিলেন। নানা দেশ পর্য্যটন দ্বারা ভিক্ষাটনে জয়দেব গোস্বামী কিছু অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে চারিজন দস্যু তাঁহাকে ধৃত করতঃ তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সকল কাড়িয়া লইয়া তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া, তাঁহাকে জলশূন্য এক কূপে ফেলিয়া পলায়ন করিল।

সাধু কূপমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন। ঘটনা-ক্রমে গৌড়েশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেন অনুচরগণের সহিত সেই পথ দিয়া

গমন করিতেছিলেন। তিনি কূপমধ্যে মনুষ্যের শব্দ পাইয়া তথায় গিয়া দেখিলেন, একজন মনুষ্য কূপের ভিতর বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লোক দ্বারা কূপ হইতে সেই আহত মনুষ্যকে উত্তোলন করিলেন এবং চিকিৎসাকরণার্থ তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

অনন্তর জয়দেব কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পর, রাজা তাঁহাকে পরম ভাগবত ও অতি সুপণ্ডিত জানিয়া, তাঁহাকে আপন পঞ্চরত্নসভার প্রধান রত্নরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার হস্তে সর্ব্বাধ্যক্ষতা ভার সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে জয়দেব নিজদেশ হইতে রাধামাধব বিগ্রহসহ পদ্মাবতী নাম্নী ভার্য্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ নিকটে রাখিয়া দিলেন।

একদা রাজবাটীতে মহোৎসব উপলক্ষে দরিদ্র, কাঙ্গালী, ভিক্ষুক, অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং নানাবিধ সাধুলোকের সমাগম হইয়াছে; সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত দস্যুচতুষ্টয়ও সাধুবেশে আসিয়াছে। তাহারা জয়দেবকে এখানে সর্ব্বাধ্যক্ষ দেখিয়া ভয়ে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে জয়দেব তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া অধিকতর আদর ও সম্মান পূর্ব্বক বাসা প্রদান করিলেন এবং উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া, আশাতিরিক্ত অর্থ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিলেন। তাহারা এত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল যে, চারিজনে তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। এজন্য জয়দেব রাজবাটীর চারিজন ভৃত্যের মাথায় কিছু কিছু দ্রব্য চাপাইয়া দিয়া ছদ্মবেশী দস্যুচতুষ্টয়ের বাটীতে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ

করিলেন। দস্যুদিগের মনে ভয় হইল। তাহারা ভাবিল, রাজ-ভৃত্যেরা আমাদিগের বাটী দেখিতে যাইতেছে, ইহারা আমাদের বাটী দেখিয়া আসিলে পর, জয়দেব আমাদিগকে সপরিবারে সংহার করিবে। কিয়দ্দূর আসিয়া দস্যুরা রাজভৃত্যদিগকে কহিল, "আমাদের বাটী অনেক দূর, তোমরা কষ্ট করিয়া এতদূর কেন যাইবে? এইখানে মোট রাখিয়া ফিরিয়া যাও। আমরা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিব।" রাজভৃত্যেরা কহিল, "তাহা হইবে না, অধ্যক্ষের আজ্ঞা আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে। তা যা হউক, অধ্যক্ষের সহিত তোমাদিগের কিরূপে আলাপ হইল? এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের আদর এবং সম্মান করিয়া তোমা-দিগকে অধিক দান করিলেন কেন? তাহা আমাদিগকে বল।" এখন দস্যুগণ কহিল, "তোমাদের এই অধ্যক্ষ এবং আমরা পূর্ব্বে কোন রাজার কর্ম্মচারী ছিলাম। আমরা সকলে উচ্চপদস্থ ছিলাম, আর এই অধ্যক্ষ আমাদের অধীনে কর্ম্ম করিত। অধ্যক্ষ একবার একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিল, তজ্জন্য রাজা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা দয়া করিয়া উহাকে সংহার করি নাই, উহার হাত পা কাটিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিই। এক্ষণে আমরা পাছে উহার পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ করিয়া ফেলি, সেই ভয়ে ঐ ব্যক্তি আমাদের এত সম্মান করিয়াছে।" দস্যুগণ এই বাক্য বলিবামাত্র পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, অমনি তাহারা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজভৃত্যেরা দ্রব্যাদি-সহ রাজবাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অধ্যক্ষকে সবিশেষ নিবেদন

করিল। রাজা শুনিয়া চমকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জয়দেবের ছিন্নহস্তপদ পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইল।

কিছুদিন পরে জয়দেব নিজপত্নী এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহ লইয়া নিজদেশে গমন করিলেন। তথায় তিনি গীতগোবিন্দ * পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রাধিকার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে অনেক অনুনয়বিনয় ও স্তবস্তুতি করিতেছেন। এ বিষয়ে বাসুদেবের উক্তিতে জয়দেব এইরূপ রচনা করিতেছেন; যথা—

"স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

এইটুকু লিখিয়া আর লিখিতে পারিলেন না, স্নানার্থে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ বাসুদেব, জয়দেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া, পুঁথি খুলিয়া ঐ গীতার্দ্ধের নিম্নে লিখিলেন,—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

পরে পদ্মাবতী অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিলে, জয়দেববেশ-ধারী শ্রীহরি, রাধামাধবকে তাহা নিবেদন করিয়া দিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। অনন্তর আহারান্তে আচমনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রকৃত জয়দেব, স্নানান্তে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিকে দেখিয়া পদ্মাবতী ভীত হইলেন এবং পত্নীকে আহার করিতে দেখিয়া, জয়-

* বসাক এণ্ড সন্সের প্রকাশিত সুন্দর ছাপা সুললিত বঙ্গানুবাদ সহ জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" পাঠ করুন।

দেবও বিস্মিত হইলেন। পরে বনিতার প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত শ্রবণ-করতঃ জয়দেব পুঁথি খুলিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" ভগবানের শ্রীহস্তলিখিত এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে পদ্মাবতীর পাত্র হইতে প্রসাদ কাড়িয়া খাইতে লাগিলেন এবং পদ্মাবতীর সৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনার পর জয়দেব অতি অল্পদিন মধ্যে আপন মধুরবাক্য-রচনা সমাপ্ত করিলেন। তিনি স্বরচিত গীত উত্তমরূপে গান করিতে পারিতেন।

দেবালয়ে ও সাধুসমাজে তিনি প্রায়ই গীতগোবিন্দ গান করি-তেন। তাঁহার মুখেমুখে শুনিয়া অনেকে গীতগোবিন্দখানি প্রায় মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণভক্ত অনেক বৈষ্ণব লোক তাহা প্রতি-লিপি করিয়া লওয়ায় গীতগোবিন্দ-প্রণেতা মহাকবি জয়দেবের যশঃসৌরভে ভারতবর্ষ আমোদিত হইয়া উঠে।

জয়দেব নিত্য অষ্টাদশক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। পরে তিনি বার্দ্ধক্যদশায় দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতে না পারিয়া, মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলে, গঙ্গাদেবী দয়া করিয়া তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তখন জয়দেব অতিশয় উল্লাসিতচিত্তে ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জয়দেব দেহত্যাগ করিলে পর, তাঁহার বাটীর নিকটে কেন্দুবিল্বগ্রামে তাঁহার সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। জয়দেবের

স্মরণার্থ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসে কেন্দুবিল্বগ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

জয়দেব মহাভাগ্যবান্ কবি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিতে অতি অল্প কবি সমর্থ হন। তাঁহার প্রসাদগুণালঙ্কৃত মধুর অনুপ্রাসচ্ছটাসমন্বিত ললিত গীত শ্রবণে কে না মোহিত হয়? জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধুর সৌরভ ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহার কবিতা অনেকের অনুকরণীয় হইয়াছে।

বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি অনেক কবি অনেক স্থলে জয়দেবের ভাব লইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। আর বঙ্কিম বাবুও তাঁহার উপন্যাসে "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।" এইরূপ পদ অবিকল গীতগোবিন্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

জয়দেবের রচিত সুললিত বঙ্গানুবাদসহ মধুর রসাত্মক "গীতগোবিন্দ" আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

বিল্বমঙ্গল

সনাতন ভট্টাচার্য্য ভোজপুর নগরের একজন সুপণ্ডিত ও সুব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। ধর্ম্মচর্য্যায় এবং শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা ছিল। সনাতন, পূর্ণবয়স্ক হইয়াও এই কারণে দারপরিগ্রহে কৃতপ্রযত্ন হন নাই; বরং কুলীন ও সুবিদ্বান্ বলিয়া অনেকে বহুবার তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে সনাতনের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না অপ্সরীনিন্দিতা রূপবতী চিন্তামণি, সনাতনের গৃহিণী হইলেন।

চিন্তামণিকে পাইয়াও সনাতনের জীবনের গতি ফিরিল না; সনাতন ক্রমে বুঝিলেন, বিবাহ করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। চিন্তা জ্বলন্ত অগ্নি। এ অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে, সনাতনের হৃদয়স্থ ঈশ্বরানুরাগ-রূপ ক্ষীণপতঙ্গটী নিশ্চয় দগ্ধ হইবে, সুতরাং মন খুলিয়া চিন্তার সহিত মিশিতে তাঁহার ভয় হইল। চিন্তা কিন্তু তাহাতে দুঃখিতা নহে।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ভোজপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কর্ম্মদেবী নগরের একজন সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণ যুবক। শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে অতি অল্পবয়স হইতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্রদোষ জন্মিয়াছিল; এমন কি বিল্বমঙ্গলের জন্য কর্ম্মদেবী নগরের এক ক্রোশের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া নিরাপদে বাস করা বড় কঠিন কার্য্য হইয়াছিল।

ভোজপুরের সনাতন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী চিন্তামণির কথা ক্রমে বিল্ব-

মঙ্গলের কাণে উঠিল। অপ্সরীনিন্দিতা রূপবতী চিন্তামণিকে হস্তগত করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইল—পাখী ফাঁদে পড়িল না।

মানব-মন বড়ই কমনীয় পদার্থ। প্রকৃত দৃঢ়চিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এ সংসারে বড়ই বিরল। বিল্বমঙ্গলের পাপপ্রস্তাব প্রথম প্রথম শুনিলে চিন্তামণি ক্রুদ্ধা হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিত। কিন্তু চিন্তার চিত্তের দুর্ব্বলতা ছিল; স্বীয় আকাঙ্ক্ষিত প্রেম উপভোগ করা ঘটিল না বলিয়া, সে নিষ্কামভাবে স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিল না। বিল্বমঙ্গল এই দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, চিন্তালাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

পরে বিল্বমঙ্গলের চেষ্টায় ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, বর্ত্তমানের অভাব মিটাইবার জন্য হতভাগিনী বিল্বমঙ্গলের হস্তে আপনার রূপযৌবন উৎসর্গীকৃত করিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ অধ্যাপকবনিতা ঐহিক অস্থায়ী সুখের জন্য নারীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপপথে পা বাড়াইল। বিল্বমঙ্গলের পাপের মাত্রা আরও কিছু বাড়িয়া উঠিল।

কর্ম্মদেবীর নিম্নে কৃষ্ণবেন্নানাম্নী একটী ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিতা। বিল্বমঙ্গলের আবাসবাটী এই নদীর উপরেই অবস্থিত। পরপারেও তাঁহার দুই চারি খানি অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তাকে আনিয়া তাহার একখানিতে রাখিয়া দিলেন। চিন্তার রূপরাশি দেখিয়া বিল্বমঙ্গল যেরূপ আকৃষ্ট হইলেন, ইহজীবনে বিল্বমঙ্গল তেমন আকর্ষণ আর কখনও অনুভব করেন নাই। বিল্বমঙ্গলের পাপজাত গভীর প্রেম দেখিয়া, চিন্তা একেবারে গলিয়া গেল,—পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করা ভাল হইয়াছে বলিয়া, চিন্তা পরম পরিতুষ্টা হইল।

এই ঘটনার পর বিল্বমঙ্গলের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধদিন আসিল। অদ্য বিল্বমঙ্গলের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। দিবাভাগে গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া চিন্তার সহিত সম্মিলিত হওয়া তাঁহার আর ঘটিয়া উঠিল না। অহোরাত্রের মধ্যে একঘণ্টা কাল যাহার সঙ্গবিচ্যুত হইলে, বিল্বমঙ্গল সংসার শূন্য দেখিতেন, আজ তাহার সহিত অন্যূন ১২।১৪ ঘণ্টা কাল বিচ্ছেদ! কোন গতিকে মরমে মরিয়া বিল্বমঙ্গল পিতৃ-কার্য্য সমাধা করিলেন; কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্তি হইল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মুষলধারে বারিবর্ষণ এবং বজ্রপাত হইতেছিল; সেই সময়ে নদীপার হইয়া চিন্তা-লাভ করা যে অতি দুরূহ ব্যাপার, হতভাগ্য বিল্বমঙ্গল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তথাপি তিনি চিত্ত শান্ত করিতে পারিলেন না। স্থির করিলেন, যত আপদ্ হউক না কেন, এই রাত্রে চিন্তাকে না দেখিয়া জলগ্রহণ করিব না। প্রবল অসদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমার নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন রাত্রে নানা বিপদসঙ্কুল নদীগর্ভে তখন একখানিও তরণী পাওয়া গেল না; বিল্বমঙ্গল সর্ব্বপ্রকার বিপদের চিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক সন্তরণদ্বারা পার হইবেন স্থির করিয়া, নদীগর্ভে ঝম্ফপ্রদান করিলেন। সেই তরঙ্গায়িত নদী অতিক্রম করিয়া, বিলাসী বিল্বমঙ্গল বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সম্মুখ দিয়া একটী গলিত শবদেহ যাইতেছিল। বিদ্যুতের আলোকে তাহা বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সাগ্রহে বিল্বমঙ্গল তৎপ্রতি ধাবিত

হইলেন। অতিকষ্টে শব অবলম্বনে উন্মত্ত যুবক নদী পার হইলেন। দুর্গন্ধময় ক্লেদাদি-পরিপূর্ণ-দেহে ব্রাহ্মণ চিন্তার উদ্দেশে ছুটিলেন। চিন্তা জানিত না যে, বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া অত গভীর রাত্রে তাহার নিকট আসিবেন। এই জন্য বাটীর দ্বার আবদ্ধ করিয়া, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল বিস্তর ডাকাডাকির পর বাড়ীর কাহারও সাড়া পাইলেন না। মেঘের গভীর গর্জ্জনে এবং বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দে বিল্বমঙ্গলের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাটী মধ্যস্থ নিদ্রিত বা জাগরিত কোন ব্যক্তিরই কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না।

তখন অনন্যোপায় হইয়া বিল্বমঙ্গল প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবার সঙ্কল্প করিলেন। উচ্চপ্রাচীর সহজে উত্তীর্ণ হইবার নহে। প্রাচীরের এক গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশালকায় এক সর্প দেহ বিস্তৃত করিয়া ঝুলিতেছিল। বিল্বমঙ্গল রজ্জুভ্রমে সেই সর্পের দেহ ধারণ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। সু-উচ্চ প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, ক্ষীণদেহ যুবক জ্ঞানহীন হইলেন। পতনের শব্দে চিন্তার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তস্করের আশঙ্কা করিয়া চিন্তা ভয়ে ভৃত্যবর্গকে উঠাইল; সকলে মিলিয়া তখন চোরের সন্ধানে বাহির হইল, কিন্তু প্রাচীরাভিমুখে গমন করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইল। কারণ, বিল্ব-মঙ্গল এরূপ সময়ে সকল বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া চিন্তার বাটী আসি-বেন, চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয় নাই।

তখন সকলে ধরাধরি করিয়া বিল্বমঙ্গলকে গৃহমধ্যে আনিল। চৈতন্য সম্পাদিত হইলে চিন্তা বিল্বমঙ্গলের গাত্রের দুর্গন্ধময় ক্লেদাদি

পরিষ্কৃত করিয়া দিল। সুস্থ হইয়া বিল্বমঙ্গল সকল কথাই চিন্তাকে শুনাইলেন। ঔৎসুক্যনিবারণার্থ চিন্তা তখন বিল্বমঙ্গলকে লইয়া আলোকসমভিব্যাহারে প্রাচীর-সন্নিকটবর্ত্তী নদীতটে গিয়া দেখিল, বিল্বমঙ্গল যে অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন, সেই গলিত শবদেহ এখনও তথায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর তৎকথিত দীর্ঘরজ্জুর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতেও চিন্তার বাকি রহিল না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, চিন্তার মনে অকস্মাৎ সদ্‌বুদ্ধির আবির্ভাব হইল। বিল্বমঙ্গল তাহাকে বিপথে আনিয়া, তাহার ও নিজের পরলোকের পথে যে দুরতিক্রম্য কণ্টক-রাশি উপস্থিত করিয়াছেন, চিন্তা তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। কুলটা তখন যেন সতীতেজে বলিতে লাগিল, "বিল্বমঙ্গল! তুমি আমার জন্য যেরূপ একাগ্রতা দেখাইতেছ, তাহা আমার পক্ষে আশু মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হইলেও আমাদের উভয়ের বিশেষ অনিষ্ট-দায়ক। তুমি আমাকে আমার স্বামিগৃহ হইতে আনিয়া অবধি আমার প্রতি যেরূপ আসক্তি দেখাইতেছ, কুলটা স্বামিদ্রোহিণীর প্রতি সে আসক্তি নিয়োজিত না করিয়া, তুমি যদি শ্রীহরির পাদ-পদ্মে তাহা নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে তোমার ইহ-কাল ও পরকাল পরমসুখে অতিবাহিত হইতে পারিত। আমি ভ্রষ্টা কুলটা, আমার সহিত কোন ভদ্রলোকের কোনরূপ সম্পর্ক না রাখাই কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি আসক্ত হইয়া কেন আমাদের উভয়কে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিলে? তুমি মূর্খ, তাই অস্থায়ী সুখের নিমিত্ত আমার ন্যায় পাপীয়সীর সংসর্গে অধিকতর কলঙ্কিত হইতেছ।

তোমার যদি এক তিল বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে এখন হইতে শ্রীহরির পাদপদ্মে মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা কর। আজ যদি এই অজগরসর্প তোমাকে দংশন করিত, তাহা হইলে তোমার দশা যে কি হইত, তাহা একবার ভাব দেখি! যত দিন এই পৃথিবীতে আছ, কোনগতিকে আত্মবঞ্চনা করিয়া, বিকৃত সুখের অধিকারী হইতে পার বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমার জীবন শেষ হইবে, তাহার পর কি ঘটিবে তাহা কখন কি একবার ভাবিবার অবসর পাইয়াছ? যাহার স্পর্শ নরকের দুঃখভোগ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তুমি অবিকৃতচিত্তে কিরূপে সেই শবের সাহায্যে আমার নিকট আসিবার জন্য এই বিপদ-পরিপূর্ণ রাত্রিতে বাটী পরিত্যাগ করিলে? তাহার পর যে উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলে, তোমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সেখান হইতে পড়িয়াও কোনরূপে প্রাণটা বাঁচাইয়াছ। আমি যদি ভগবান্ হইতাম, তাহা হইলে আমার জন্য এই সকল চেষ্টার পরিণাম-স্বরূপ নিশ্চয়ই তুমি অনন্তকাল বৈকুণ্ঠ উপভোগ করিতে পারিতে।

বিবেকের ক্ষণিক আবির্ভাবে চিন্তা যে সকল সাধু উক্তিপরিপূর্ণ ভর্ৎসনা-বাক্য প্রয়োগ করিল, বিল্বমঙ্গল তাহাতে বিরক্ত হইলেন না। দীর্ঘকাল পাপানুষ্ঠান করিয়া হৃদয় কঠিন হইলেও পাপনিরত যুবক আপন শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলেন;—প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আর পৃথিবীর পাপভার বর্দ্ধিত করিব না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব। সেই রাত্রিতে চিন্তা বা বিল্বমঙ্গল কেহই নিদ্রা গেল না,—উভয়েই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি নাই। সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় কাটিল।

প্রাতঃকালে বিল্বমঙ্গল বৈরাগ্য-ব্রত পরিগ্রহ-পূর্ব্বক বাটী ত্যাগ করিয়া, সাধুসংসর্গমানসে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সদ্‌গুরুর আশ্রয় জুটিল। এক বৎসর তাঁহার সেবা করিয়া, বিল্বমঙ্গল নানা জ্ঞানবাক্য শুনিলেন; কিন্তু তাঁহার উত্তপ্ত হৃদয়ে সুকুমার জ্ঞানরাজির অধিকাংশই ঝলসিয়া যাইতে লাগিল; যে কয়টী ঈশ্বরেচ্ছায় একটু শিকড় লইয়া অবস্থিতি করিল, সেই কয়টীর গুণে বিল্বমঙ্গল ধন্য হইলেন। তখন একবার আত্মপরীক্ষা করিবার জন্য—চিত্ত সংযত হইয়াছে কি না বুঝিবার জন্য, বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবন তীর্থ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। বিলাসী বিল্বমঙ্গল পুনরায় লোকালয়ে আসিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; হৃদয় বিকৃত হইল না,—সংসারসুখে পুনরাসক্তি দেখা দিল না।

কিন্তু কিছুদিন পরে এক অসামান্য-রূপবতী বণিক্‌বধূ গঙ্গা-স্নান করিয়া বাটী ফিরিতেছিল। সন্ন্যাসী দেখিলে, স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রণামাদি করিয়া থাকে; অপরাপর বহু স্ত্রীলোকের সহিত বণিক-বধূও বৃক্ষতলস্থিত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে আসিল। তাহার সুন্দর মুখের প্রতি সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পতিত হইলে, প্রাণটা যেন জ্বলিয়া উঠিল;—পূর্ব্বস্মৃতি একে একে সমস্তই মনে পড়িতে লাগিল। চিন্তার সেই সুন্দর দেহ ও অসামান্য মাধুরীরাশি অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল;—এক বৎসরের যত্নচেষ্টা বিফল হইল। ইহা কি উন্মত্ত করি-রাজকে তৃণগুচ্ছে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াসের পরি-ণাম? সংসারে বীতরাগী সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী, বণিকবধূর পশ্চাৎ লইলেন। সাধ্বী, সন্ন্যাসীর এ ব্যবহার জানিতে পারিলেন না।



সেই সুন্দর দেহ ও অসামান্য মাধুরীরাশি অল্পে অল্পে তাঁহার
হৃদয় অধিকার করিল পৃঃ—১৪৪

বিল্বমঙ্গল, বণিকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না; স্থিরভাবে বহির্ব্বাটীতে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বণিক্‌বধূর পুন-দর্শনলাভ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যাহার মুখচন্দ্রিমা দেখিবার জন্য এত আগ্রহ, সেই সুন্দরীর স্বামী সেই সময়ে কার্য্য হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া, তিনি ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে প্রয়োজন জিজ্ঞাসিলেন। পশুবুদ্ধি ভণ্ড সন্ন্যাসী অকপটচিত্তে মনের কথা নিবেদন করিলেন। বণিক্ দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাদর-সম্ভাষণে তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনিলেন। স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া, সাধুসমীপে প্রেরণ করিলেন। বণিক্-বধূকে সম্মুখে দেখিয়া সাধুর অস্থিরতা বিদূরিত হইল; নির্নিমেষ-লোচনে সেই সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, বধূকে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে দুইটী সুতীক্ষ্ণ সূচ আনিয়া দাও। গুরু-আজ্ঞানুরোধে বণিক্‌বধূ তাহাই আনিয়া দিলেন। তখন বিল্বমঙ্গল বজ্রমুষ্টি করিয়া দুই হস্তে দুইটী সূচ ধারণ করিলেন এবং তাহার এক একটী চক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিলেন; দরবিগলিত-ধারে চক্ষু বহিয়া রক্তস্রোত নিঃসৃত হইতে লাগিল,—বিল্বমঙ্গলের মুখ হইতে খেদসূচক একটীও বাক্য নির্গত হইল না,—মুখাকৃতি একটুমাত্র বিকৃত হইল না।

ব্যাপার দেখিয়া বণিক্‌বধূ হতবুদ্ধি হইলেন এবং স্বামীর নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্তের সংবাদ দিলেন। বণিক্ তথায় আসিয়া বিস্ময়সহকারে সাধুর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিতে চাহিলেন; আর এরূপ শোচনীয় কাণ্ডের অনুষ্ঠানজনিত পাপরাশি তাঁহাকে স্পর্শিল

বলিয়া, তিনি খেদ করিতে লাগিলেন। বিল্বমঙ্গল, বণিক্‌কে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—"চক্ষু আমার শত্রু; আমাকে গৈরিকবসনধারী সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া আপনার যে ধারণা জন্মিয়াছে, বাস্তবিক আমি তাহা নহি। আবাল্য যে পাপরাশির অনুষ্ঠান করিয়াছি, এই চক্ষুর্দ্বয় তাহার কারণ। যে কার্য্যে আসিলাম, চক্ষুর জন্য তাহার কিছুই ঘটিয়া উঠিতেছে না। আজ একবৎসর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চিত্তের যতটুকু স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তোমার পত্নী-সন্দর্শনে তাহার সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। অসদিচ্ছার বশীভূত হইয়া আমি আজ তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছিলাম; তুমি অত্যধিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আমার নিকট তোমার পত্নীকে আনিয়া দিয়াছিলে। তোমার ভক্তি দেখিয়া আমার চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। তাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, শত্রুদ্বয়কে দেহমধ্যে অবিকৃত রাখিব না। তুমি আমার এ অদ্ভুত আচরণের জন্য অনুতপ্ত বা দুঃখিত হইও না; যাহা হইয়াছে তাহা আমার ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। এখন হইতে চক্ষুর দোষে আমাকে আর কুপথে যাইতে হইবে না। কর্ত্তব্যপথে বিচলিত হইতে হইবে না।"

বণিক্ সন্ন্যাসীর প্রহেলিকাময় বাক্যের আদৌ কোন অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না; সুতরাং কোন প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। অন্ধ-সাধুর আদেশে বণিক্ তাঁহার হস্ত ধরিয়া, পূর্ব্ব আশ্রয়স্থল সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিলেন। সাধু সেই স্থানে অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীহরির চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইরূপে

কাটাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্র, শীতের অতি ভীষণ হিম-রাশি মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল; কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিল্বমঙ্গল সাধু কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্তের একাগ্রতার উপর মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে। যে পাপী, তাহার চিত্তের একাগ্রতা পাপে প্রধাবিত; যে পুণ্যাত্মা, তাহার একাগ্রতা পুণ্যকার্য্যে নিয়োজিত, আর যাহার চিত্তের একাগ্রতা বা ধৈর্য্য একেবারে নাই, সে সফলতার সহিত কোন কার্য্য কখনও সুসম্পন্ন করিতে পারে না। বিল্বমঙ্গলের একাগ্রতার পরিচয় সেই ভীষণ রাত্রির ঘটনা হইতে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারা যায়। পাপে স্বতঃপ্রবৃত্ত যে মনের গতি, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিল্বমঙ্গল চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অচিরে তাহা শুভফল প্রসব করিল।

অনাহারে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ফলে অনাথের নাথ ভগবানের দয়ার সঞ্চার হইল। অন্ধ বিল্বমঙ্গল অহোরাত্র ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া আহার নিদ্রা ভুলিলেন; অথচ শারীরিক কোনরূপ ক্লেশানুভব করিলেন না। একদিন কোথা হইতে এক বালক আসিয়া বিল্বমঙ্গলের হস্তধারণ করিয়া বলিল "অন্ধ, এখানে বসিয়া অনাহারে কি করিতেছ? উত্থান কর, আমি তোমার জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি; আমার সঙ্গে আইস, পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণ কর।"

বালকের কথা শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল; তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে জীবাত্মা বুঝিলেন, পরমাত্মা তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন।

মানবের অসাধ্য কার্য্য এ জগতে কিছুই নাই; কারণ, জীবাত্মা যখন পরমাত্মার অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন যাহা পরমাত্মার সাধ্য, তাহা জীবাত্মার সাধ্য না হইবে কেন? কায়মনোবাক্যে আমরা যাহার সাধন করি, নিজের অসাধ্য হইলে ভগবানের কৃপায় তাহা সুসাধ্য হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গলের পক্ষে তাহাই ঘটিল। বালকের স্পর্শে অন্ধের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল; তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ভগবান্ বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বুঝিতে না বুঝিতে, আবার কোথায় সেই বালকমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের ক্ষতবিক্ষত নষ্ট চক্ষু পুনরায় কার্য্যক্ষম হইল,—অন্ধের অন্ধত্ব কাটিয়া গেল।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল—হৃদয়ের দৃঢ়তার ফলে এই পৃথ্বীতলে ঈশ্বর-সন্দর্শন—অলৌকিক ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গেল—বিল্বমঙ্গলের জন্ম সার্থক হইল। সনাতন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী চিন্তাও সেই রাত্রের ঘটনার পর সন্ন্যাসিনী সাজিল। সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—সনাতনের ন্যায় আদর্শ-পতিকে পদদলিত করিয়া, আশু সুখলাভের জন্য যে ভীষণ কু-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা ক্রমে চিন্তার মনে উদয় হইল; কিন্তু উপায় কি?

চিন্তা কয়েকদিন ধরিয়া এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিল। প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; শেষে স্থির করিল, ভোজপুরে ফিরিয়া যাইব, পতি-দেবতার চরণে ধরিয়া, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আবার ভাবিল, এ পাপমুখ লইয়া লোকালয়ে,—পরিচিত স্থানে যাই কি করিয়া? সনাতন আমার স্বামী, তিনি বিল্বমঙ্গলের

ন্যায় আমাকে পাইয়া নিজ কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, কেন তবে তাঁহার নিকট যাইয়া আবার দর্শন দিয়া তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট করি? আমি ঘোর পাপীয়সী; আমার স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শনেই যে তাঁহাকে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তা গৃহ পরিত্যাগ করিল; যখন সন্ন্যাসিনীই সাজিয়াছে, তখন বাড়ী থাকা আর সঙ্গত নহে স্থির করিল। গভীর জঙ্গলে যাইয়া চিন্তামণি ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। প্রথম প্রথম চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করা কিছু ক্লেশকর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাব অপনোদিত হইল। বিল্বমঙ্গল অপেক্ষা তাহার চিত্তের দৃঢ়তা অধিক ছিল,—ধরিতে গেলে এ বিষয়ে সে বিল্বমঙ্গলের দীক্ষাগুরু। সেই ভীষণ রাত্রের সেই তীব্র তিরস্কার না শুনিলে, বিল্বমঙ্গলের জীবনে কি তেমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইতে পারিত? তাহার উপর চিন্তা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। রমণী একবার পাপপথে পদার্পণ করিলে, সহজে তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না; পরন্তু গভীর অতলস্পর্শ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত না হইয়া কখনও প্রতিনিবৃত্ত হয় না; আবার যখন ধর্ম্মের পথে—পুণ্যের পথে অগ্রসর হয়, তখন শত শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—কোন ভ্রূকুটিতে বিচলিত না হইয়া আপন কর্ত্তব্যপথে চলিয়া যায়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর একাগ্রতা বেশী বলিয়া চিন্তা, বিল্বমঙ্গলের অপেক্ষা শীঘ্র সাধনায় সফল হইল। অচিরকালমধ্যে সে বুঝিল, ঈশ্বরের দয়া তাহাতে বর্ত্তিয়াছে। সংসারের ময়লা মাটি আর তাহার চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না। যখন এরূপ ধারণা চিন্তার মনে উপস্থিত হইল, তখন সে তীর্থক্ষেত্র

বৃন্দাবনে গমন করিল। বিল্বমঙ্গলও ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইল; পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন; কিন্তু সাক্ষাতে কাহারও চিত্ত বচলিত হইল না; পূর্ব্ব-কার সে বন্ধনের কথা আর কাহারও মনে উপস্থিত হইল না। উভয়েই বুঝিতে পারিল, ঈশ্বরের কৃপায় তাহারা উভয়েই ধন্য হইয়াছে।

চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলে ইহার পর আর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সনাতন ভট্টাচার্য্যের গৃহ হইতে যে দিন চিন্তামণি চলিয়া আসিয়া-ছিল, সেই দিন হইতেই সনাতন বিবাহ করিয়া যে ভ্রম করিয়া-ছিলেন,—তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন; সুতরাং স্ত্রী-সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।

বিবাহের প্রতি সনাতনের প্রথম হইতেই আসক্তি ছিল না; স্ত্রীলোক ঘরে আনিয়া পত্নী-ভাবে তাহার প্রতি কর্ত্তব্য কি, সনাতন তাহা জানিতেন না। অধ্যাপক পণ্ডিত—শাস্ত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। স্ত্রীর চিন্তা—তাহার শুভাশুভের বিষয় তাঁহার মনে আদৌ স্থান পাইত না। সেরূপ হইলে চিন্তা হয় ত গৃহত্যাগী হইত না।

বিল্বমঙ্গলের জন্য চিন্তার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, সনাতন তাহার জন্য আংশিক দোষী। চিন্তা যে সতী পতি-ভক্তা ছিল, সনাতন নানা বিষয়ে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন; বিল্বমঙ্গলের পাপ-প্রস্তাব যে সে বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সনাতন তাহাও শুনিয়াছিলেন। তাই চিন্তার গৃহত্যাগের পর অধ্যাপক ঠাকুরের মনটা যেন কিছু চঞ্চল হইয়াছিল। তাঁহার দোষে—তাঁহারই অব-হেলায় পূর্ণ-যুবতী স্ত্রী, পরপুরুষে আসক্তা হইল বলিয়া, অহরহঃ তিনি

অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন। মানসিক ব্যাধি দুরারোগ্য, ইহার ঔষধপত্র নাই; সনাতনের সে ব্যাধি ঘটিল। ঔষধের আশায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ ঘাঁটিলেন, কোথাও কিছু পাইলেন না। রোগ দিন দিন আরও ভীষণ হইতে লাগিল, শেষে জ্বালায় অস্থির হইয়া সনাতনের অর্দ্ধোন্মাদ ভাব ঘটিল—তিনি গৃহত্যাগী হইলেন।

ইহার অল্পকাল পরে একদিন এক সন্ন্যাসিনী বৃন্দাবনের রাজপথে অজ্ঞানাবস্থায় নিপতিত এক ব্রাহ্মণকে জল দিতেছিল; ব্রাহ্মণের সংজ্ঞালাভ ঘটিল। সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "চিন্তা, তুমি এখানে?"

চিন্তা তাহার স্বামী সনাতন ভট্টাচার্য্যকে চিনিল। একদিন যাহাকে দর্শন দেওয়া সে অন্যায় কার্য্য মনে করিয়াছিল, আজ বিন্দুমাত্র সে ভাব তাহার হৃদয়ে দেখা দিল না। ক্রমে পরস্পর পরস্পরকে অতীত জীবনের কথা শুনাইলেন। সনাতন বলিলেন, "তুমি ধন্যা; আমি তোমাকে পাইয়াছি, আর ছাড়িব না; লোকে যাহা বলে বলিবে, চল আমরা উভয়ে বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

চিন্তা হাস্যসহকারে উত্তর করিল, "আমাদের উভয়ের পার্থিব সম্বন্ধ ফুরাইয়াছে। আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে চরণে রাখিতে পারেন; কারণ, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গুরু নাই; কিন্তু আমার সংসর্গে আপনাকে আর কলুষিত করিতে পারিব না।"

ইহার পর চিন্তা, সনাতনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু সনাতনের কি হইল, ইতিহাস তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলে না।

সাধু তুলসীদাস

কাহার কাহার মতে তুলসীদাস কনোজ ব্রাহ্মণ, কেহ বা সরযূ পুরীণ ব্রাহ্মণ কহে। ইহার দুবে উপাধি ও পরাশর গোত্র। ১৫৮৯ সংবতে ইহার জন্ম হয়। বিনয়পত্রিকায় লিখিত আছে, অভুক্ত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করায়, তিনি নৃসিংহদাস নামক এক সাধুর হস্তে পড়েন; ঐ সাধুই শেষে তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন। তুলসীদাসের কথিত রামায়ণে লিখিত আছে, তাঁহার প্রকৃত নাম রামবোলা, পিতার নাম আত্মারাম শুক্ল, মাতার নাম হুলসী, পত্নীর নাম রত্নাবলী, শ্বশুরের নাম দীনবন্ধু। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অনেকে তরীগ্রামেই তাঁহার জন্ম কহেন, কেহ কেহ হস্তিনাপুর, কেহ কেহ গাজীপুর প্রভৃতিও তাঁহার জন্মস্থান কহিয়া থাকেন। বাল্যকালে ইনি মাতৃভাষা অর্থাৎ কেবল হিন্দীভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার একটী পুত্র জন্মিয়া, শৈশবেই কালকবলিত হয়। তুলসীদাস অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। কথিত আছে, এক সময় তিনি আপন শ্বশুরের অনেক সাধ্যসাধনায় সহধর্ম্মিণীকে শ্বশুরবাটীতে পাঠাইয়া দেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে বনিতার বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁহাকে এরূপ ব্যথিত করিয়া তুলিল যে, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং তিলার্দ্ধকাল আর বাটীতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, পত্নীর উদ্দেশে পদব্রজে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

কহিলেন, "তোমা বিহনে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অতএব তুমি বাটীতে ফিরিয়া চল।"

পতির ঈদৃশ আচরণে পত্নীর মনে বড় ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধচিত্তে স্বামীকে কহিলেন,—

"লাজ না লাগত আপুকো ধৌরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ এ্যায়সে প্রেমকো কহা কহোঁ মৈ নাথ॥
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ হোত ন তত্ত ভবভীতি॥"

নাথ! আমার পশ্চাদনুসরণ করিয়া এখানে অবধি ছুটিয়া আসিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? ধিক্ তোমায়, ধিক্ তোমার প্রেম ও ভালবাসায়। আমার এই অস্থিচর্ম্মমাংস নির্ম্মিত নশ্বর দেহে তোমার যে পরিমাণে প্রেম ও ভালবাসা বিরাজিত আছে, উহা যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিতে ও নিজে চরিতার্থ হইতে।

প্রিয়তমার এবম্বিধ ভৎর্সনারূপ-বাক্যবাণে তুলসীদাসের হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি ভগ্নমনে কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এ অনিত্য জগৎ নিতান্ত অসার। এখানে কেহ কাহারও আপনার নয়। ধন জন জীবন যৌবন ক্ষণস্থায়ী। তবে অল্পদিনের জন্য জগতে আসিয়া আমি কেন দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বিফলে নষ্ট করি! এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি শ্বশুরা-

লয় হইতেই একেবারে তীর্থ-পর্য্যটনোদ্দেশে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন।

বহুকাল নানাতীর্থে পরিভ্রমণকরণানন্তর তিনি একবার নিজ জন্ম ভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া, আপন শ্বশুরবাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই বাটী যে তাঁহার শ্বশুরের, ইহা তিনি জানিতে পারেন নাই। অতিথিসেবা করিতে আসিয়া, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, কিন্তু পত্নীকে দেখিয়া তুলসীদাস চিনিতে পারেন নাই। তুলসীদাস রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে, পত্নী কহিলেন, "মরিচ আনিয়া দিব?" তুলসীদাস কহিলেন, "না।" পত্নী কহিলেন, "ঝাল আনিব," তাহাতে তুলসীদাস কহিলেন, "না; এ সবই আমার ঝুলিতে আছে।" এইরূপ কথোপকথনের পর তুলসীদাসের বনিতা আত্ম-পরিচয় দিয়া, স্বামীর পদসেবা করিতে উদ্যতা হইলেন। তাহাতে তুলসীদাস সে সেবা অস্বীকার করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কহিলেন, "গোসাঞি! আপনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও সকল সামগ্রীই ঝুলির মধ্যে রাখিয়াছেন, কেবল আমাকে ঝুলির মধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না!" পত্নীর এই বাক্যে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, আমি যখন গৃহ, গৃহিণী ও সংসারভার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর কেন এই ঝুলি বহন করিয়া ভ্রমণ করি; এই বলিয়া তিনি ঝুলি ফেলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

গুরু প্রাপ্ত হইয়া তুলসীদাস স্মার্ত্তবৈষ্ণবরূপে অযোধ্যায় কিছুকাল বাস করেন। তিনি ১৬৩১ সম্বতে হিন্দীভাষায় অতি সুললিত

কবিতামালায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র একদা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া, হিন্দী রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। রামায়ণ ব্যতীত তিনি কবিতা-রামায়ণ, বিনয়পত্রিকা, গীতাবলী, কৃষ্ণগীতাবলী ও দোঁহাবলী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর ছয় খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তুলসীদাস যখন রামায়ণ পাঠ করিতেন, হনুমান তখন ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া, তাহা শ্রবণ করিতেন; আর অনুগ্রহ করিয়া তুলসীদাসকে দর্শন দিয়া সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের পাদ-পদ্মও দর্শন করাইয়াছিলেন। ১৬৮০ সম্বতে তিনি কাশীতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখন সেই স্থান তুলসীঘাট নামে খ্যাত।

কবীর সাহেবের ন্যায় তুলসী দাসেরও অনেক গুলি জ্ঞানগর্ভ দোঁহা আছে।

তুলসী দাসের দোঁহা

তুলসি ইএ সংসার মে পাঁচ হৈঁ সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন, উপকার॥১

হে তুলসি! জগতে পাঁচটী অমূল্য রত্ন আছে। যথা—সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীনতা এবং পরের উপকার। ১

জ্ঞান কহঁ অজ্ঞানবিন তমবিন কহেঁ প্রকাশ।
নিরগুণ কহেঁ জো সগুণবিনু সো গুরু তুলসীদাস॥২

অজ্ঞানতাহীন জ্ঞানকথা, তমোবিহীন প্রকাশ এবং সগুণরহিত

নির্গুণ বিষয় যিনি উপদেশ দিতে পারেন, হে তুলসি! তুমি তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জ্ঞান কর। ২

ফুল মাহি যেঁও বাস কাটমে অগিন ছিপানি।
খোদ বিন নাহি মিলে ধরতী মে পানি॥ ৩

পুষ্পমধ্যে যেমন সৌগন্ধ এবং কাষ্ঠমধ্যে যেমন অগ্নি সন্নিহিত থাকে, ভগবানও তেমনি মনুষ্যগণের দেহমধ্যে বিরাজিত আছেন। যেমন মৃত্তিকা খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না, তেমনি ভগবানকে পাইবার জন্য ভজন সাধন করা আবশ্যক। ৩

পহিলে বুরা কমায় কর বাঁধি বিষ কি পোট।
কোটী করম পল মে কাঁটে যব আওয়ে গুরু কি ওট॥ ৪

প্রথমে পাপকর্ম্ম করিয়া বিষের ভরা বোঝাই করিলেও যদি গুরুপদে আশ্রয় লওয়া যায়, তবে ক্ষণমধ্যে কোটী কোটী কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪

মালা জপে শালা কর জপে ভাই
যো মন মন জপে উস্‌কো বলিহারি যাই॥ ৫

লোককে দেখাইবার জন্য যে মালা জপে, সে শালা। যিনি ভক্তিভাবে কর জপ করেন, তিনি ভ্রাতা; আর যিনি একাগ্রভাবে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করেন, তিনিই ধন্য, তাঁহাকেই বলিহারি যাই। ৫

অর্থ যথা পদধুলি হ্যায় যৌবন নদীকা বেগ।
মানুষ জলবিম্ব হ্যায় জীবন ফেন করি লেখ॥ ৬

অর্থ পদধূলিবৎ অতি তুচ্ছ। যৌবন নদীবেগের ন্যায় দ্রুতগামী। মনুষ্যসকল জলবিম্বতুল্য ক্ষণস্থায়ী এবং জীবন ফেনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বস্তু। অতএব সংসারে মত্ত না হইয়া, পরমার্থ-তত্ত্বে মনোনিবেশ কর। ৬

তুলসি! যব জগমে আয়ে জগ হাঁসে তোম রোয়।
ঐসি কর্‌ণি কর চলো কি তোম্ হাঁস জগ্ রোয়॥ ৭

হে তুলসীদাস! তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া সকলে হাসিয়াছিল; কিন্তু সে সময় তুমি ক্রন্দন করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি এরূপ যশকীর্ত্তি রাখিয়া হাসিতে হাসিতে জগৎ হইতে গমন কর যে, তোমার জন্য যেন সকলে রোদন করিতে থাকে। ৭

ঘর ঘর মাংগে টুকপুনি ভূপতি পূজে পায়।
হে তুলসি সব রাম বিনে তু অব রাম সহায়॥ ৮

হে তুলসি! ভগবান্ রামচন্দ্র যাঁহার সহায়, তিনি কৌপীন পরিয়া, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিলেও মহারাজা পর্য্যন্ত তাঁহার পদসেবা করিয়া থাকেন। ৮

দীপশিখাসম যুবতী রসমন জানিহো নি পতঙ্গ।
ভজহি রাম ত্যজি কামমদ করহি সদা সৎসঙ্গ॥ ৯

যুবতী রমণীগণ জ্বলন্ত দীপশিখার সমান, আর পুরুষেরা পতঙ্গস্বরূপ। অতএব হে পুরুষগণ! তোমরা কাম মদ পরিহার পুরঃসর সদা সর্ব্বদা সৎসঙ্গ এবং রামভজন কর। ৯

ছিত্তোন তরুণী কটাক্ষশর করেও ন কঠিন সনেহু।
তুলসি তিনকী দেহকী জগতকবচ করি লেহু ॥ ১০

হে তুলসি! তরুণী যুবতীর কটাক্ষবাণে যাঁহার মনকে বিচলিত করিতে না পারে, তাঁহার দেহকে জগতের কবচস্বরূপ ধারণ করা কর্ত্তব্য। ১০

কলিযুগ সমযুগ আন নহিঁ জো নর কর বিশ্বাস।
গাই রামগুণগান বিমল ভবতর বিনহি প্রয়াস ॥ ১১

কলিযুগতুল্য অন্য যুগ আর নাই। এই যুগে বিশ্বাসী মনুষ্য-সকল বিমল রামগুণ গান করিয়া, অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া যান। ১১

জ্যো তিরিয়া পীহর বসে সুরত রহে পিউ মাহি।
য়্যায়সে জন জগ মে রহে গুরু কো ভুলে নাহি ॥ ১২

যেমন স্ত্রী পিত্রালয়ে গমন করিলেও তাহার মন সেই প্রিয়তমের নিকটেই থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দূরে থাকিলেও গুরুকে ক্ষণকাল-মাত্রও বিস্মৃত হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ভক্ত। ১২

ইনি এক জন মহারাষ্ট্রীয় বিখ্যাত ভক্ত-কবি ও সাধু ছিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনার সন্নিকটস্থ দেহু নামক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বণিক জাতীয় শূদ্র। ইঁহার পিতার নাম বহ্লোজী ও মাতার নাম কনকবাঈ। কনকবাঈ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। অধিক বয়সে ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ শান্তাজী, মধ্যম তুকারাম ও কনিষ্ঠ কানাইয়া। বাল্যকালে তুকারাম যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াই ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সংসারের ব্যয়-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক পিতামাতার সাহায্য করিয়া তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। তৎপরে কিছুদিন গত হইলে, ইঁহার পিতা-মাতা ইঁহার বিবাহ দেন। একদা ইনি কোন স্থানে কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার প্রাপ্ত হন। উপহার পাইয়া তাহা পথি মধ্যস্থিত বালক-বালিকাদিগকেই দান করেন, কেবল একখণ্ড মাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন; কিন্তু ইঁহার পত্নী এই ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধান্বিত হওত সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইঁহার পৃষ্ঠে বলপূর্ব্বক আঘাত করেন; তাহাতে ইক্ষুদণ্ডটী দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। তুকারাম ইহাতে বিরক্ত না হইয়া পত্নীকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে, আমি তোমাকে একগাছি আক খাইতে দিলাম, তুমি তাহা দ্বিখণ্ড

করিয়া একখণ্ড নিজে ও বাকিখণ্ড আমায় প্রদান করিলে। যাহা হউক, ইহা হইতেই তুকারামের সাংসারিক সুখের মাত্রা বুঝা যাইতেছে। ইঁহার দুই বিবাহ, প্রথমা স্ত্রীর নাম রুক্মীবাঈ ও দ্বিতীয়ার নাম জীজাবাঈ; তন্মধ্যে রুক্মীবাঈ চির-রুগ্না ছিলেন। তুকারামের যখন সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইঁহার পতৃ-মাতৃবিয়োগ হয় এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শান্তাজী যিনি পূর্ব্ব হইতেই উদাসীন ছলেন, গৃহত্যাগ করেন। এই সকল কারণে ইনি অতিশয় দুঃখত অন্তরে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্যবসাদিতে লোকসান, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যকষ্ট, মনোবেদনা, লোকলাঞ্ছনাদি যাহা ইনি ভুগিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, এমন কি সংসারে অন্নকষ্ট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। এই দুঃসময়ে রুক্মীবাঈও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সহসা এই সময় আবার দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায়, ইঁহার মন একেবারে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়, তাই কনিষ্ঠকে সংসারের ভার দিয়া, ইনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তুকারাম অধিক বয়সে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এজন্য ইনি অল্পদিনের মধ্যেই সমুদয় শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইনি নিত্য রীতিমত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসনাদি অভ্যাস-পূর্ব্বক ক্রিয়া করিতেন। ইনি পুনরায় দেহুতে বিঠোরাদেবের মন্দির দর্শন অভিলাষে আগমন করেন। ইনি যথায় থাকিতেন, ইঁহার পত্নী নিত্য ইঁহার আহারীয় বহন করিয়া লইয়া গিয়া তথায় ইঁহাকে ভোজন করাইত। দেহুতে থাকিয়া ইনি ভক্ত ও সাধুসজ্জনের সেবা করিতেন। যেখানে দশ জন ভক্ত একত্র হইয়া ধর্ম্ম-

চর্চ্চা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিত, ইনি তথায় গিয় স্থান পরিষ্কার, সাধু-গণের সেবা, পাদুকা-রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে ও পরোপকারে রত থাকিতেন। তুকারামের এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকে ইঁহার দ্বারা স্বার্থসাধন জন্য বৃথা পরিশ্রম করাইয়াও লইত। তুকারাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলে, ইঁহার মুখ হইতে অনর্গল ভাবময়ী কবিতা নির্গত হইত এবং ইঁহার সঙ্কীর্ত্তনের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, ধর্ম্মবিদ্বেষীরাও মুগ্ধ হইত। তুকারামের যশঃ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইলে, মম্বাজী-বাবা নামে এক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ-বশতঃ ইঁহাকে গালি দিতেন। একদা বৃথা ছল ধরিয়া গায়ে পড়িয়া তিনি তুকারামকে প্রহার করেন, তাহাতে তুকারামের দেহে সাতিশয় আঘাত লাগে ও অত্যন্ত দৈহিক কষ্ট হয়; কিন্তু একটু সুস্থ হইয়াই ইনি মম্বাজীর নিকট গমনপূর্ব্বক মম্বাজীর প্রহার করিতে যে শ্রম ও কষ্ট হইয়াছিল, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইহাতে মম্বাজী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি তাঁহার বিদ্বেষভাব দূর হইয়াছিল। তৎপরে তুকারাম ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত হয় দেখিয়া, পুনরায় সংসার ত্যাগ করেন। পরিশেষে ইঁহার পত্নী, কন্যার বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদনজন্য একদা বিশেষ চিন্তিত হইয়া, পুনরায় ইঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন। তুকারাম তদনুসারে তিনটী পাত্র অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া, একদিনে তদীয় তিনটী কন্যার বিবাহ দিয়া সংসারের কার্য্য শেষ করেন। তুকারামের তিন কন্যা ও দুই পুত্র ছিল। অতঃপর রামেশ্বর নামক জনৈক পণ্ডিতের শত্রুতাচরণে ইঁহার এক বিপদ ঘটে। তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রকাশ (বেদ ব্যাখ্যা) করিতেছেন বলিয়া,

গ্রামাধিকারী কর্ত্তৃক তুকারামের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়। ইহাতে তুকারাম, রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সে বিপদ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তুকারামের সুখ্যাতি রামেশ্বরের সহ্য হইত না, এজন্য আবার এক বিপদ ঘটিল। রামেশ্বর কহিলেন, তুমি যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছ, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল অভঙ্গ তুমি নদী-জলে নিক্ষেপ কর। তুকারাম ইহাতে অতিশয় ব্যথিত হইলেও তদাজ্ঞা পালন করিলেন। অনন্তর তুকারাম তন্নিমিত্ত মনোবেদনা পাইয়া, এই উপলক্ষে সাতটী অভঙ্গ রচনা করেন। তদ্দৃষ্টে এবং তুকারামের বিশেষ পরিচয় পাইয়া, শেষে রামেশ্বর ইঁহারই শিষ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তুকারাম সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনায় জীবন-যাপন করিবার মনস্থ করিয়া সন্নিকটস্থ নদী-তীরে বিঠোরাদেবের মন্দিরে থাকিয়া ভজন-পূজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ধর্ম্মের জন্য ইঁনি অধীর হইলে, স্বপ্নে মহাপ্রভুর জনৈক শিষ্যের নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিঠোরাদেবের মন্দির ভগ্ন হইলে, ইনি স্বয়ং স্বহস্তে তাহা নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিয়াছিলেন। ইনি শ্লোক রচনা দ্বারা কথকতা ও কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া, এই উপায়ে অনেক লোককে ধর্ম্মপথে আনয়নপূর্ব্বক শিষ্য করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক শত্রুও অবশেষে ইঁহার সাধু ব্যবহারে শরণাগত হইয়াছিল। একদা মহারাষ্ট্রীয় সম্রাট শিবাজী ইঁহার প্রশংসা শুনিয়া ইহাকে ডাকিয়া পাঠান; কিন্তু ইনি রাজপুরীতে গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনীত-ভাবে তাঁহার নিকট লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, শিবাজী স্বয়ং আসিয়া

ইঁহার কুটীরে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শিবাজী অতঃপর ইঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলে, ইনি তাহা বিনয়-নম্রব্যবহারে প্রত্যাখ্যান করেন। ইঁহার উপদেশ শুনিয়া শিবাজী সংসারে বীতরাগ হইয়া, রাজকার্য্য-পরিত্যাগ করতঃ বনগমন করেন। ইহাতে শিবাজীর মাতা, তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি শিবাজীকে বুঝাইয়া ও সার উপদেশ-দানে পুনরায় সংসারী করেন। তুকারাম মহারাষ্ট্র-জাতীয় বিখ্যাত-কবি। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইঁহার কবিতার আদর করেন এবং আগ্রহ-সহকারে পাঠ করেন। ধর্ম্ম-জগতেও তুকারামের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সকলেই ইঁহার অমায়িকতা ও পবিত্র-চরিত্রে মোহিত হইত। সাধনায়ও ইনি যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শিবাজীকে উপদেশ দিবার জন্য ইনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়।

এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ।
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রয়েন সমান। ইত্যাদি

(বোম্বাই চিত্র দেখ।)

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে তুকারাম স্ত্রীকে কহিলেন, "বৈকুণ্ঠে যাইবে ত আমার সঙ্গে চল, আমি যাইতেছি।" ইহাতে ইঁহার স্ত্রী মনে করিলেন, ইনি বুঝি আবার গৃহত্যাগ করিবেন; কিন্তু সেই দিন হইতে আর ইঁহাকে পাওয়া গেল না,—ইঁহার দেহ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। কথিত আছে, সেই দিনই ইনি সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

এই মহারাষ্ট্রদেশীয় সর্ব্বজন-পূজিত ভক্ত কবির বিস্তর গীত ও পদাবলী তদ্দেশবাসী ভিক্ষুক হইতে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ পর্য্যন্ত সাদরে গান ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনেক দেবমন্দিরে ইঁহার গীত সকল অস্মদ্দেশীয় গীতা ও চণ্ডীর ন্যায় পঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ তুলসীদাস, বঙ্গদেশে যেরূপ রামপ্রসাদ, তুকারামকে তদপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহার পদাবলী সকল অভঙ্গনামে পরিচিত ও তদ্দেশবাসী প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে বিরাজিত।

পল্‌টুসাহেব

মহাপুরুষ পল্‌টুসাহেবের কোনরূপ লিখিত জীবনচরিত না থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবার উপায় নাই। পল্‌টুসাহেবের ভ্রাতা পল্‌টুপ্রসাদও একজন পরম ভক্ত ছিলেন; তিনি নিজ ভজনাবলী নামক গ্রন্থে পল্‌টুসাহেব সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত পল্‌টুপন্থীদিগের প্রমুখাৎও কতক বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই সকল উপায়ে যাহা যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, এ স্থলে তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। নাগপুরস্থ জালালপুর নামক গ্রামে কাঁদু বণিকের বংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি গোবিন্দ সাহেব নামক কোন সাধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাদসাহ সাহ-আলমের সময় ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। পল্‌টুসাহেবের বংশাবলী অদ্যাবধি জালালপুর নাগপুরে বর্ত্তমান আছে। ইনি ফয়জাবাদজেলাস্থ অযোধ্যা নগরে সৎসঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক বহুকাল তথায় থাকিয়া উপদেশাদি দিয়া অনেক শিষ্যকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তথায় তাঁহার সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজগৃহাদি ও ভক্তবৃন্দও তথায় আছে। এই স্থানে চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে সরযু-স্নান উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে এই পন্থীরা

গদির মোহন্তকে প্রচুর অর্থদান ও নানাবিধ দ্রব্য-জাত প্রদান করেন।

এই উদাসীন পন্থীরা গলদেশে তুলসীকাষ্ঠের মালা, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কেশ পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকায় ঊর্দ্ধপুণ্ড, কটীদেশে কৌপীন ধারণ ও পীতবর্ণ কোর্ত্তা, টুপি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্মশ্রু রক্ষা করেন, আবার কেহ বা মুণ্ডন করিয়া ফেলেন। পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইলে উভয়েই "সত্যরাম" বলিয়া অভিবাদন করেন। ইঁহারা নির্গুণ উপাসক, কখন দেবদেবীর অর্চ্চনা বা ভজনালয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন না।

পল্‌টুপন্থী ভারতবর্ষের অনেক জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত যোগী এখন আর নাই। এখন তাঁহাদের মধ্যে ভেদী নাই; সকলেই বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িয়াছেন। পল্‌টুসাহেব ক্ষণজন্মা জীবন্মুক্ত স্বতঃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নামমাত্র। কবীর সাহেব যেমন রামানন্দকে এবং শ্রীরামচন্দ্র যেমন বশিষ্ঠকে 'গুরু করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লোকতঃ নিয়মপালনার্থ নামমাত্র গুরু করিয়াছিলেন, ইঁহারও তদ্রূপ ছিল। পল্‌টুসাহেবের প্রচণ্ড প্রতাপ ও কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে তাৎকালিক অনেক সাধুসন্ন্যাসীর ঈর্ষ্যা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রতি তাহাদের ঈর্ষ্যার জ্বালা এতদূর অধিক হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিয়া জীবিত অবস্থায় দাহ করিয়া মারিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঠিক সেই সময়ে

জগন্নাথপুরীতে সেই দেহে দর্শন দিয়াছিলেন। তৎপরে অল্পকাল পরে তথায় দেহত্যাগ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত পন্থীরা নানক-পন্থী সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

পল্‌টু সাহেব কৃত দোঁহা

পল্‌টু ঊঁচি জাতকা মত কোই কর অহঙ্কার।
সাহেবকে দরবার মে কেবল ভক্তি পিয়ার॥

পল্‌টু সাহেব বলিতেছেন, তোমরা কেহ উচ্চজাতি বলিয়া অহঙ্কার করিও না। ভগবানের সমীপে কেবল ভক্তিই আদরণীয়া হয়।

তীরথ ব্রত মে ফিরে বহুত চিত লায় কৈ।
জল পাষান কো পূজি মুয়ে পছিতায়কৈ॥
বস্তু না বুঝি জায় আপনে হাথ মে।
অরে হাঁরে পল্‌টু জো কুছ মিলৈ সো মিলে সন্তকে সাথ মে।

মনে মনে লোকে অনেক আশা বাঁধিয়া তীর্থ ও ব্রত করিয়া থাকে, শেষে জল পাথর পূজায় কিছু না হইলে আপশোষ করিয়া মরে; অর্থাৎ না বুঝিয়া অনেক খরচ করিয়া অনুতাপ করে, পল্‌টু সাহেব বলেন, কিছুতে কিছু হয় না, যাহা কিছু হয় তাহা কেবল সন্তসদ্‌গুরুর নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সহজী বাই

রাজপুতানাদেশস্থ ডুসরকুল নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশের ইনি কুল-স্ত্রী ছিলেন। ইনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন এবং সন্ত-মতানুসারে ইঁহার যোগ অভ্যাস অতি উচ্চ ছিল। ইনি শব্দযোগী ছিলেন। উপাসক-সম্প্রদায় ও ভক্তমাল-গ্রন্থে ইঁহাকে কৃষ্ণ-ভক্ত লিখিয়াছেন। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি চরণদাস নামক জনৈক মহাযোগীর শিষ্য ছিলেন। চরণদাসের ন্যায় যোগী ও সহজী বাইয়ের ন্যায় ভক্ত তৎকালে ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। চরণদাসও ডুসরকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সহজী বাইয়ের গ্রন্থে চরণদাসের জন্মসম্বৎ ১৭৬০ দৃষ্ট হয়। সহজী বাইয়ের গুরু-ভক্তি ও তাঁহার পরমার্থ-বিষয়ে উচ্চ গতির পরিচয় তাঁহার লিখিত কোমল, মধুর হৃদয়গ্রাহী দোঁহাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়। সহজী বাইয়ের কতিপয় পদাবলী নিম্নে প্রকটিত হইল।

সহজী বাইয়ের দোঁহা

সহজি জগমে ইওঁ রহে যেঁও জিহ্বা মুখ মাহি।
ঘিউ ঘনা ভচ্ছন করে তওভি চিকনে নাহি।

সহজী বাই বলিতেছেন, রে মন! তুই জগতে এমনি ভাবে

থাক্, যেমন রসনা মুখমধ্যে অবস্থান করে। সে অনবরত ঘৃত-শর্করা ভক্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু কখন চাকচিক্যতা প্রাপ্ত হইতেছে না।

জৈসে সঁড়াসী লোহকী ছিন্ পানি ছিন্ আগ।
তৈসে দুখসুখ জগৎকে সহজো তু তজভাগ॥

কর্ম্মকারের লৌহসাঁড়াসী যেমন একবার অগ্নিতে আবার তৎক্ষণাৎ জলে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ জগতে সুখ দুঃখ, অর্থাৎ এই মাত্র সুখ ছিল, অমনি পরক্ষণে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সহজী বাই বলেন, জগৎ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই উত্তম।

না সুখ বিদ্যা কি পড়ে না সুখ বাদ বিবাদ।
সাধ সুখী সহজী কহে লাগী সুন্ন সমাধ॥

লেখা পড়া শিখিয়া বা বাদবিবাদ অর্থাৎ তর্কবিতর্ক করিয়া সুখ হয় না, সহজী বাই বলেন যে, সে সুখ সাধুগণ ভগবৎ পাদপদ্মে সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

করমেতি বাই

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে খড়েল্যা নামক গ্রামে পরশুরাম নামে এক রাজ-পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম করমেতি বাই ছিল। করমেতি বাই বালিকা বয়স হইতেই ধার্ম্মিকা ছিল। করমেতির পিতা যথাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণকরতঃ পিতৃ-কর্ত্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাইতে হইবে ভাবিয়া, করমেতির ভাবনা হইল; তখন তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া অস্থির হইল। ভগবানে তাহার বিশেষ ঐকান্তিক অনুরাগের সঞ্চার হইল। সে সততই নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; মনের আবেগে পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসিতে কখন বা কাঁদিতে থাকিত। স্বামী-সঙ্গ করিলে কুসঙ্গদোষে ক্ষতি হইবে, সংসারের বিষ তাহার দেহে প্রবেশ করিলে সে কলুষিত হইবে, কৃষ্ণভক্তিরূপ স্পর্শ-মণিকে সে হারাইবে, এইরূপ নানাচিন্তায় কাতর হইয়া একদিন ভূমে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে যে দিন তাহাকে পতিগৃহে যাইতে হইবে স্থিরীকৃত হইল, তৎপূর্ব্বদিনে সে রাত্রিতে পিতৃগৃহ হইতে পলায়নপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গিয়া, ভগবানের আরাধনায় দিনাতিপাত করিবে মনস্থ করিয়া, ছাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নীচে পতিত হইয়া, বৃন্দাবনপথে চলিতে আরম্ভ করিল। ভক্তের রক্ষক ভগবান্, তাই উচ্চস্থান হইতে নিপতিত হইলেও করমেতির দেহে কোনরূপ আঘাত লাগিল না। পরদিন প্রভাতে করমেতি যে



আনন্দ অন্তরে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন

পৃঃ—১৭১ *

পথে গিয়াছিল, সে পথে লোক গিয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু করমেতি পশ্চাৎ-দিকে দৃষ্টি করিয়া বুঝিল, উষ্ট্র-আরোহী তাহারই অনুসন্ধানে আসিয়াছে ; তখন সে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে লুকাইবার স্থান না পাইয়া, অনন্যগতি হইয়া, পথে যে একটী লোল-মাংস মৃত উষ্ট্র নিপতিত ছিল, সেই পূতিগন্ধবিশিষ্ট উষ্ট্রের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত রহিল। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, তিন দিন ক্রমাগত তিনি অনাহারে তন্মধ্যে থাকিয়া ভগবানের নাম করিয়াছিলেন। তৎপরে তথা হইতে বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মকুণ্ডতীরে বনের মধ্যে বসিয়া, আনন্দ অন্তরে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এদিকে পরশুরাম, কন্যা বিহনে অস্থির হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া, কত বুঝাইলেন, কত চেষ্টা করিলেন ; তথাপি তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অগত্যা নিরাশ-হৃদয়ে পরশুরাম বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। রাজা এই সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক করমেতির দর্শনে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার স্তবস্তুতি করিয়া, অবশেষে তথায় করমেতির বাস জন্য অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের অনুমতি করিলেন। করমেতি তাহাতে অরণ্যের অসংখ্য জীব হত্যা হইবে বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেলেন। পরশুরাম, তাহার কথা অবহেলা করিয়া তাহার জন্য সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং অবশেষে করমেতি বাই তাহাতে থাকিয়া ভগবদারাধনায় জীবনাতিপাত করেন। অদ্যাপি করমেতি বাইয়ের সেই কুটীর বর্ত্তমান আছে।

রুইদাস

ইনি রয়দাসী বা রুইদাস * নামক সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। ইঁান রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন, এইরূপ গ্রন্থাদিতে প্রমাণ; কিন্তু রামানন্দ স্বামীর যে মত, তাহা হইতে রুইদাসের মত বিভিন্ন দেখা যায়। রুইদাস চর্ম্মকার-জাতির মধ্যেই স্বীয় মত প্রথমে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেননা তিনি নিজে জাতিতে চর্ম্মকার ছিলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে যে, রামানন্দ স্বামীর এক ব্রহ্মচারী শিষ্য প্রত্যহ ভিক্ষা দ্বারা ভগবানের ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করিতেন; এক দিন তিনি এক বণিকের নিকট হইতে ভোগসামগ্রী আনিয়া গুরুর হস্তে দেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত বণিক্ সৈন্যদিগের খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত। রামানন্দ ভোগ নিবেদনকালে ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইয়া ভাবিলেন, ভোগের দ্রব্যে বোধ হয় কোন দোষ পড়িয়াছে; তদনুসারে তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইয়া, মনের খেদে তাহাকে কহিলেন, "হা চামার"। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে। ব্রহ্মচারীর অচিরে মৃত্যু হইল এবং তিনি এক চর্ম্মকারগৃহে

* শিখজাতির আদি গ্রন্থে রবিদাস নাম দেখা যায় এবং সম্ভবতঃ শিখদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। শিখেরা রুইদাসের রচিত অনেক স্তব উচ্চারণ ও গান করিয়া থাকে।

জন্মগ্রহণ করিলেন। জাতকর্ম্মের পরে তাঁহার রুইদাস নাম রাখা হইল। রুইদাস গুরুকৃপায় জাতিস্মর হইলেন। পূর্ব্বের সমস্ত ব্যাপার তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। গুরুর সম্মিলন জন্য তিনি সর্ব্বদা রোদন করিতেন ও দুগ্ধাদি কিছুই পান করিতেন না। তখন তাঁহার পিতা মাতা, পুত্রের জীবনাশঙ্কা করিয়া রামানন্দ স্বামীকে আনয়ন করেন। স্বামিজীর দর্শনে শিশু পুলকিত হইল। রামানন্দ, শিশুর কর্ণে মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র লাভে শিশু স্তন্য পান করিল এবং ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জাতীয় বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; কিন্তু সর্ব্বদা সাধুসেবায় নিযুক্ত থাকিত। একদা ভগবান ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শমণি দান করেন। রুইদাস তাহা তুচ্ছজ্ঞানে সমাদর করেন নাই। পরে বিষ্ণু পুনরায় আগমন করিয়া কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা এক নিভৃত স্থানে ফেলিয়া রাখেন। রুইদাস কাঞ্চনের প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন। তৎপরে স্বপ্নাদেশ হইল যে, সে মুদ্রায় তিনি মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি এক মঠ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক নিজে তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বিদ্বেষবশতঃ ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, চর্ম্মকার হইয়া রুইদাস শালগ্রাম পূজা ও নর-নারীকে প্রসাদ বিতরণ দ্বারা জাতিচ্যুত করিতেছে। তাহাতে রাজাদেশে রুইদাস শিলাসহ আনীত হইলে, সে রাজ-সম্মুখে শালগ্রাম রাখিয়া দিল; কিন্তু কেহই সেই শাল-গ্রামকে স্তবস্তুতি করিয়াও স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না দেখিয়া, তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলে, রাজা তাঁহার পরমার্থ সাধনায়

সংশয়-রহিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-গণকে ঈর্ষ্যা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে চিতোরের রাজ-মহিষী ঝালী, রুইদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হওত বিদ্রোহাচরণের উপক্রম করিলে, রাণী গুরুর শরণাপন্ন হন। তাহাতে রুইদাস তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান এবং সকলকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করাইয়া, তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করুন। আজ্ঞামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ পংক্তিতে ভোজন-কালে দেখেন যে, দুই জন ব্রাহ্মণের পার্শ্বে একজন করিয়া রুইদাস অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে রুইদাসের শরণাপন্ন হইয়া, দলে দলে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

ভগবান্ দাস

ইনি এক জন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্ঠাবান্ সাধু ছিলেন। সাধারণ সাধুদিগের মত ইঁহার কার্য্যকলাপ ছিল না। যে সকল সাধু দেখাইবার জন্য বাহ্যক্রিয়া করিতেন, ইনি তাঁহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। একদা তদ্দেশীয় রাজা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি গলদেশে মালা ও তিলকাদি চিত্র ধারণ করিবে, রাজা তিন দিবস পরে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন। এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র প্রায় সকলেই তিলক চিত্র ও মালা পরিত্যাগ করিল; এমন কি ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসীরা পর্য্যন্ত মালা তিলক ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ভগবান্ দাস মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়াও সর্ব্বাঙ্গে প্রাত্যহিক তিলক-ছাব ধারণ করিতে বিরত হইলেন না। তিন দিবস পরে রাজ-ভৃত্যগণ তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাঁহার এতাদৃশ বিমল ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া, পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং কোনরূপ দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

মাধবসিংহের রাণী

মাধবসিংহ জয়পুরের জনৈক রাজা। মহারাজ মানসিংহ ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মাধবসিংহ ভ্রাতার সহিত কাবুল শাসনে গমন করিলে, দেওয়ান রাজ-প্রতিনিধি হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। সেই সময় রাজরাণী একদা এক অপূর্ব্ব পারমার্থিক গানে মুগ্ধ হওত কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। সেই অবধি তিনি বিষয়-বাসনা ও ভোগসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থিত চিত্র দেখিয়াই কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ অনুভব করতঃ সুখী হইতেন ও সর্ব্বদা ভক্ত সাধুজনের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দেওয়ান ইহা রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা, কাবুল হইতে এই সংবাদ পাইয়া পুত্র প্রেমসিংহকে লেখেন যে, প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা জানাইবে। পুত্রও মাতার ন্যায় কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন; তাই তিনি লিখিলেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপদ লাভ করিয়াছেন এবং মাতার এই ভগবদ্ভক্তি প্রভাবেই আমাদের তিন-কুল উজ্জ্বল হইবে। রাজা, পুত্রের উত্তরে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পুত্রকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন এবং রাণীর শিরশ্ছেদের আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে পিতা-পুত্রে সমর বাধিবার উপক্রম হইল; কিন্তু অবশেষে তাহা শান্তভাব ধারণ করিল। পরন্তু রাজা, রাণীকে শাস্তি-দানার্থ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। মন্ত্রীর প্ররোচনায় রাণীকে ব্যাঘ্র-কবলে ফেলিয়া

দেওয়া হইল। রাণী, কৃষ্ণপূজা করিতেছেন, এমন সময়ে রাণীর গৃহে ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দিলেন ; ব্যাঘ্র রাণীর চরণ লেহন করিতে লাগিল, তাহার সাধ্য হইল না যে, সে রাণীকে আক্রমণ করে। রাণী ইহা দেখিয়া ব্যাঘ্রকে ধরিয়া কৃষ্ণ--নাম উচ্চারণ করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন। সে আনন্দে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। রাজ-রাণীর অনন্য-সাধারণ ভক্তি ও সেই ভক্তির মাহাত্ম্য-দর্শনে, রাজা ভয়ে পারিষদ্‌বর্গসহ রাণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে আর এক দিবস মাধব সিংহ ও মান সিংহ নদী-বক্ষে প্রবল ঝটিকা হইতে রাণীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে রক্ষা পান।

বিট্‌ঠলদাস

ইনি মথুরাবাসী একজন পরম-ভক্ত বালা-রাজার পুরোহিত ছিলেন। ইনি গৃহ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন হইয়া নির্জ্জনে থাকিতেন। ইহা শুনিয়া রাজা পুরোহিতের প্রকৃত চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, পরীক্ষার্থ একদিন একাদশীর রাত্রে অনেক ভক্ত-বৃন্দকে আনাইয়া দ্বিতল ছাদের উপর বৈঠক করেন। তথায় বিট্‌ঠল দাসও আমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। নানারূপ ধর্ম্মকথা, পরমার্থ চর্চ্চা ও নাম সংকীর্ত্তনাদি চলিতে লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিট্‌ঠল দাস প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নাচিতে নাচিতে ভক্তিতে এতদূর বিভোর ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, পদস্খলিত হইয়া তিনি ছাদের উপর হইতে ভূতলে নিপতিত হন। ইহা দেখিয়া রাজা ও অন্যান্য সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্তের প্রভু ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করায়, তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। এই ঘটনায় তাঁহার প্রতি রাজার শ্রদ্ধার উদয় হইলে, যাহাতে তাঁহার গৃহে থাকিয়া ভরণপোষণ-ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। বিট্‌ঠল দাস প্রথমে কিছু দিন যাটঘরায় বাস করেন; পরে স্বীয় মাতার আগ্রহে গৃহে আসিয়া সাধুসেবায় নিযুক্ত হন। বিট্‌ঠল দাসের পুত্র রঙ্গরায় ১৮ বৎসর বয়সে পিতৃসম ভক্ত হন। রঙ্গরায় দৈবাধীন



ব্রহ্মদৈত্যাক্রান্ত কন্যা

পৃঃ—৭১ *

ভূগর্ভে এক পরম রমণীয় বিগ্রহমূর্ত্তি ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া পিতা-পুত্রে পরমসুখে থাকিয়া বিগ্রহসেবা করিতে থাকেন। একদা বিট্‌ঠল দাস কোন নর্ত্তকীর মুখে রাসলীলা-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অনেক অর্থ দান করেন। সে তাহাতেও পরিতুষ্ট না হওয়ায় পুত্রকে দান করেন; পরে চৈতন্য উদয় হইলে তৎপরিবর্ত্তে যথাসর্ব্বস্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু পুত্র সত্যপালন করিতে কহিলে, নর্ত্তকী তাহাকে লইয়া চলিল। তখন বালা-রাজ-কন্যা রঙ্গরায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন; রাজ-কন্যার গুরুকে নর্ত্তকী লইয়া যাইতেছে, এই সংবাদ শ্রবণে রাজ-কন্যা পথিমধ্যে আসিয়া তাহার বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থ দিতে চাহিলে, নর্ত্তকী সৌজন্য দেখাইয়া, কিছু না লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। রাজকন্যাও সৌজন্য দেখাইয়া, গাত্রস্থ অলঙ্কারগুলি উন্মুক্ত করিয়া, তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, নর্ত্তকী রাজ-কন্যার সম্মানরক্ষার্থ তাহা গ্রহণ করিল। পরে রাজ-কন্যা গুরুদেবের সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নামদেব

ইনি একজন প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ও দেব-ভক্ত ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহার বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বামদেবজীর দৌহিত্র। বামদেবজীর এক বিধবা কন্যা ছিল; কন্যাটী সর্ব্বদা ভগবানকে প্রসন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিত ও বিগ্রহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। ভগবান তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন যে, পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত তাহার গর্ভ-সঞ্চার হইবে ও গর্ভে পরম-ভক্ত এক পুত্র জন্মিবে। ভগবানের বরে যথাকালে তাহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। বামদেব-কন্যা লোক-লজ্জাভয়ে ভীতা হইলেন বটে; কিন্তু ভগবানের বরে তাঁহাকে কখন সে লজ্জা পাইতে হয় নাই। বিশেষতঃ পুত্র কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়া আশৈশব তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। পরে পুত্রের নাম নামদেব রাখিলেন। কথিত আছে, একদা মাতামহ বামদেব কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিলে, তিনি শিশু নামদেবের উপর বিগ্রহসেবার ভার দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে, তুমি প্রত্যহ কৃষ্ণবিগ্রহকে দুগ্ধ পান করাইবে। পরে নামদেব তদনুসারে বিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে দুগ্ধপান জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, বিগ্রহ দুগ্ধ পান করিলেন না, তখন ভাবিলেন—তিনি হয় ত আমার সম্মুখে পান করিবেন না, তাই বালক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া

দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নামদেব গৃহে আসিয়া দেখিলেন, বিগ্রহ দুগ্ধ স্পর্শ করেন নাই, তাহাতে তিনি অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, বালক আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিলেন। এইরূপে নামদেব কয়েক দিনই কৃষ্ণ-বিগ্রহকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার মাতামহ ফিরিয়া আসিলে, এই সকল প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া ও এই ব্যাপার নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাপার শুনিয়া বাদসা, নামদেবকে নিজ সভায় আনয়ন করেন ও কিছু আশ্চর্য্য দেখাইতে বলেন; কিন্তু নামদেব তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে একদা বাদসাহের আজ্ঞায় নামদেব একটী বৎস-হারা গাভীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তদীয় মৃতবৎসকে বাঁচাইয়া দেন। নামদেব, রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়া নাম-গান করিতেন, এজন্য রঙ্গনাথের মন্দিরের দ্বার সেই দিকে ফিরিয়াছিল। একদা কোন এক বণিক্ তুলাদান-কর্ম্মে তাঁহাকে সুবর্ণ দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক আহ্বান করেন। তাহাতে নামদেব একটী তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া, তৎপরিমিত সুবর্ণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু বণিকের ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্নও তাহার তুল্য হইল না দেখিয়া, সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইলেন। ইহার চরিত্রে এই প্রকার অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রঘুনাথ দাস

রঘুনাথ দাস একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী হরিপুর গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহারা বিংশতি লক্ষের অধিকারী ও মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ঔরসে ১৪১৮ শকে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই সংসার-বিরাগী ছিলেন।

হরিপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামে ইঁহাদের কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্য বাস করিতেন। বালক রঘুনাথ ঐ কুল-পুরোহিতের গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হরিদাস নামক একজন যবন হিন্দু-ধর্ম্মের পোষকতা করায় ও হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উহা দিবারাত্র জপ করায় তত্রস্থ জমীদারের অত্যাচারে ও কাজীর প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া বলরাম আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হন। এই সময় মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি মনে মনে তদীয় চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি শাস্ত্রালোচনা, সাংসারিক সুখ ও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতঃ গৌরাঙ্গ-সঙ্গ লাভে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; এমন কি তিনি একাকী পলাইয়া গৌরাঙ্গ-সমীপে যাইতে

মনস্থ করিলেন। তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের ঈদৃশ ভাবান্তর দর্শনে ভীত হইয়া পুত্র যাহাতে পলাইতে না পারে, তজ্জন্য পাঁচ-জন প্রহরী ও বুঝাইবার জন্য দুই জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন এবং সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য সেই অল্প বয়সেই একটী উন্মুখ-যৌবনা সুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ ও চিত্ত-বিনোদনার্থ যাবতীয় মনোরঞ্জনকারী আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়া দিলেন। কিন্তু ভবিতব্য কে পরিবর্ত্তন করিবে! যে প্রেমের প্রবল আকর্ষণে ব্রজ-নারীগণ পতি-পুত্র ত্যাগ করতঃ পাগলিনীপ্রায় পুলিন-প্রান্তে ছুটিয়া যাইত; রঘুনাথ সেই সুদৃঢ় আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারি-লেন না। একদা রাত্রিকালে উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের আদেশে কোন কার্য্যে প্রেরিত হইলে, তিনি তথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলাভি-মুখে ছুটিলেন। দ্বাদশ দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ পদব্রজে নীলা-চলে আসিয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রঘুনাথের অতুলনীয় বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ ষোলবৎসর কাল নীলাচলে থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন ও প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবনে তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করি-তেন, তাহার আভাস চরিতামৃতে এইরূপ দেওয়া আছে, যথা—

"অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কি কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে নয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥

রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধন।
চারি-দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিন॥”

মহাপ্রভু রঘুনাথের ভক্তিতে সদয় হইয়া তাঁহাকে একছড়া—গুঞ্জা মালা ও একটী গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করেন। রঘুনাথ প্রভুদত্ত রত্ন পাইয়া তাঁহারই সেবা করিতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,—

“প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে॥
দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু-নয়নে॥
দাস গোস্বামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে॥”

রঘুনাথ রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক তীর্থদ্বয়ের উদ্ধার করেন। তিনি উক্ত বিলুপ্ত তীর্থদ্বয়ের উদ্ধার না করিলে বোধ হয় উহা কালে ধ্বংস প্রায় হইত, তাহাতে বৈষ্ণবদিগের বিষাদের সীমা থাকিত না।

তিনি শেষাবস্থায় নীলাচলে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথায় তিনি তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নীলাচল-জীবন ত্যাগ করেন।

প্রেমনিধি

ইনি আগ্রা নগরে বাস করিতেন, ইঁহার ন্যায় সাধু ও ধার্ম্মিক তৎকালে দৃষ্ট হইত না। প্রেমনিধি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। আগ্রা সহর মুসলমান পরিবৃত বলিয়া, যবনস্পর্শে জল নষ্ট হইবার ভয়ে, তিনি রাত্রিতে জল আনয়নার্থ যমুনায় যাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা রাত্রিতে মেঘ ও বর্ষাপাতে আকাশতল ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হওয়ায়, পথ দেখিতে না পাইয়া জলাভাবে কষ্ট পাইবে ভাবিয়া, স্বয়ং ভগবান তাঁহার মসালদার হইয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রেমনিধির গৃহে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ ভাগবতাদি পাঠ শুনিতে আসিতেন; ইহা দেখিয়া তত্রস্থ দুষ্টলোকে মিথ্যা রটনা করিয়া বাদ-সাহকে জানাইল যে, প্রেমনিধি পরস্ত্রী ঘরে ধরিয়া রাখে। বাদ সাহ তাহা শুনিয়া প্রেমনিধিকে কারাবদ্ধ করিলেন; কিন্তু তৎ-পরে বাদসাহের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন, অতএব ছাড়িয়া দিবে। অনন্তর বাদসাহ তাঁহাকে কারামুক্ত করেন।

নরবরের রাজা

ভক্তমালে নরবর দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহা পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থান। এই দেশের রাজা একজন পরম বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন। তিনি যে সময় পূজা করিতেন, তখন কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না, এমন কি বিশেষ প্রয়োজন হইলেও তিনি সে সময় কাহারও কথা বা বাধা মানিতেন না। একদা তিনি পূজায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে বাদসাহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি বাদসাহের কথায় অবহেলা করায়, বাদসাহ মহাক্রুদ্ধ হইয়া পূজা-গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক সরোষে অস্ত্র দ্বারা তাঁহার পদচ্ছেদ করিয়া দেন; ইহাতেও কিন্তু রাজা পূজাত্যাগ করিয়া উঠিলেন না দেখিয়া, বাদসাহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে যান, তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হন। পরে বাদসাহ তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করেন ও তৎপরে আরোগ্য হইলে, তাঁহাকে অনেক গ্রামাদি দান পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন। বলা বাহুল্য, বাদসাহ এতাদৃশ ভক্তিদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত হোলিয়া নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঈশ্বর আরাধনায় পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার পিতা নৃসিংহদেব পুত্রের নাম শিবরাম রাখেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে শিবরামের পিতৃ-বিয়োগ ও আটচল্লিশ বৎসর বয়সে মাতৃ-বিয়োগ সংঘটিত হয়। অসাধারণ মেধা ও সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-বলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। ইনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতার অনুরোধে বিবাহ করেন ও মাতার জীবদ্দশায় অর্থাৎ ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

শিবরামের মাতৃ-বিয়োগ হইলে, তাঁহার সৎকারের সময় ইঁহার মনে এরূপ বৈরাগ্য জন্মে যে, ইনি আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনেক অনুনয় বিনয়ের পর যখন বুঝিলেন—তাঁহার অগ্রজের প্রতিজ্ঞা অটল, তখন তিনি তথায় একটী কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শিবরাম মাতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ও সেই স্থানেই সদানন্দচিত্তে যোগ-অভ্যাসে ব্রতী হন।

পরে তীর্থ পর্য্যটন কালীন কোন প্রাচীন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি তাঁহারই নিকট যোগশিক্ষা করেন। ইঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া শিবরাম কিছুদিন পরে "ত্রৈলিঙ্গ স্বামী" নামে অভিহিত হন। সেই অবধি ইনি জনসমাজে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী বলিয়া পরিচিত। ইনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে কিছুদিন থাকিয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন। তথা হইতে তিব্বত ও তিব্বত হইতে মানস সরোবরে আসিয়া মহানন্দে যোগাভ্যাস করেন ও তথায় বহুকালাবধি থাকিয়া যোগসিদ্ধি হইলে কাশীধামে আসিয়া প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকেন। পরে ইনি পঞ্চ গঙ্গার ঘাটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করেন।

স্বামীজী গ্রীষ্ম কালে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসিয়া থাকিতেন এবং দারুণ শীতে অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া দুই তিন দিবস নদীর জলে ভাসিয়া বেড়াইতেন। ইনি অনেককেই যোগশিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিষ্য ব্যতীত সাধারণের সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিতেন না এবং স্বেচ্ছায় নিজে কখন আহার করিতেন না। ভক্তগণ ভক্তির সহিত যাহা তাঁহার মুখে ধরিতেন, তিনি তাহাই ভক্ষণ করিতেন।

একদা একদল দুষ্টলোক তাঁহাকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া জব্দ করিবার মানসে একসের পরিমাণ কলি-চূণ জলে গুলিয়া দুগ্ধের ন্যায় করতঃ স্বামীজীকে পান করিতে দেয়। স্বামীজীর অবিদিত কিছুই নাই। তিনি দুষ্টের দুষ্টামি ও মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া, তাহাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতঃ অম্লান বদনে মুখ-বিকৃতি



ত্রৈলিঙ্গ স্বামী

পৃঃ—১৮৯

না করিয়া সমস্তই পান করিয়া ফেলেন। স্বামীজীর এরূপ অমানুষিক ক্ষমতা দেখিয়া দুষ্টেরা তখনই তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া অপরাধজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি কোন কথা না কহিয়া, তাহাদের সম্মুখেই সেই একসের আন্দাজ চূণ-গোলা প্রস্রাবের দ্বার দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেন। স্বামীজীর এই অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় অচিরে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইঁহার যোগ সম্বন্ধে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইনি ভূত ভবিষ্যৎ সকলই বলিয়া দিতে পারিতেন। ইনি এক সময় সর্পাঘাতে মৃত কোন ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর-নিবাসী জয়গোপাল কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তি পুত্রের উপর সাংসারিক ভার অর্পণ করিয়া সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিতেন। একদিবস জয়গোপাল বাবুর মন নিতান্ত খারাপ হওয়ায় অমঙ্গল আশঙ্কা সততই তাঁহার মনে জাগরিত হইতে থাকে। তাহাতে তিনি স্বামীজীর নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ধ্যানে অবগত হইয়া বলেন,—"তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্য প্রাতে বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে, তাই তোমার মন এরূপ খারাপ হইয়াছে।" এই নিদারুণ শোক-সংবাদ শুনিবামাত্র জয়গোপাল বাবু কাঁদিয়া আকুল হন। স্বামীজী তাহাকে নানা উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করেন। পরে জয়গোপাল বাবু টেলিগ্রাম করিয়া স্বামীজীর কথার সত্যতা উপলব্ধি করেন।

এক সময়ে কোন রাজপুরুষ নৌকাযোগে কাশীধামে আসিতেছিলেন। তিনি গঙ্গার জলের উপর স্বামীজীকে পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীজীকে সাধুজ্ঞানে নৌকায় তুলিয়া লন। তিনি মহানন্দে তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, স্বামীজী কোন কথা না কহিয়া বোবার ন্যায় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকেন।

রাজপুরুষের কটিদেশে একখানি তরবার ছিল। স্বামীজী ঐ তরবার খানি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজপুরুষ তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। দৈবক্রমে তরবার খানি স্বামীজীর হস্ত হইতে নদীগর্ভে পতিত হয়। ইহাতে রাজপুরুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীজীকে কটূক্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন। নৌকা পরপারে আসিলে স্বামীজী সেই নৌকায় বসিয়া জলে হাত দিবামাত্র তিনখানি ঠিক সেই একইরূপ তরবার তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি রাজপুরুষের তরবার খানি তাহার হস্তে দিয়া, বাকি দুইখানি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজীর এই অমানুষিক কার্য্য-কলাপ দেখিয়া রাজপুরুষ স্বীয় অপরাধ-জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কোন উকিল বাবু একসময়ে কলিকাতা হইতে কাশীধামে বেড়াইতে যান। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার ভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না। এমন কি ইনি স্বামীজীকেও ভণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। এক দিন তিনি তাহার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হওয়ায়, স্বামীজীকে দেখিতে যান। উভয়ে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলে, স্বামীজী উকিল বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে সে

স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন। উকিল বাবু তখন বন্ধুর সহিত স্বামীজী সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার একটী শিষ্যকে ডাকিয়া কি বলিলেন। তাহাতে শিষ্য উকিল বাবুর নিকট আসিয়া তাহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন। উকিল বাবু কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শিষ্য বলিলেন, "গুরুজীর নিকট যাহা জানিলাম তাহাতে বুঝিলাম, আপনি মহাপাপী।" শিষ্য উকিল বাবুর নাম, তাহার স্ত্রী ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বিষয়, কোথায় বিবাহ হইয়াছে প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক সকলই বর্ণন করিলেন এবং আরো বলিলেন, আপনি আপনার সেই সহধর্ম্মিণীর গর্ভধারিণী মাতার সহিত অর্থাৎ আপনার শ্বাশুড়ীর সহিত গুপ্তভাবে অবৈধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি স্বামীজীর সীমানায় থাকিবার উপযুক্ত নন। উকিল বাবুর বন্ধু এই সকল গুপ্ত-কথা শুনিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন এবং পরে অনুসন্ধানে স্বামীজীর সকল কথাই সত্য জানিতে পারেন।

স্বামীজী উলঙ্গাবস্থায় কাশীধামের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এরূপ উলঙ্গাবস্থায় বিচরণ আইন-বিরুদ্ধ। তাই পুলিস প্রহরীরা তাঁহাকে কয়েকবার নিষেধ করিয়া দেয়, কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিতেন না। এক দিবস নিষেধ আজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ উলঙ্গাবস্থায় ভাগীরথীতীরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুলিস প্রহরীরা থানায় লইয়া যায়। ইঁহার শিষ্যগণ গুরুজীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে একজন উকিল নিযুক্ত করেন।

পরদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিচার আরম্ভ হইলে, স্বামী-জীর উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়া বলেন যে, ইনি কামনাশূন্য মহা-যোগী পুরুষ; কাজেই ইঁহার বস্ত্র পরিধানের আবশ্যক করে না। ইহাতে বিচারপতি স্বামীজী কিরূপ মহাযোগী পুরুষ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য, আপনার আহারীয় মধ্যাহ্ণ ভোজনের কিয়দংশ তাঁহাকে আহার করিতে বলেন। স্বামীজী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া বলেন, "সাহেব, আপনি যদি আমার খানার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারেন, তবে আমি আপনার প্রদত্ত খানা বিনা আপত্তিতে খাইতে পারি।" এই বলিয়া স্বামীজী বিচার-পতির সম্মুখে তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তে মলত্যাগ করতঃ তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইঁহার এই অসাধারণ রুচি প্রবৃত্তি দেখিয়া ও ইঁহাকে প্রকৃত নির্ব্বিকারচিত্ত সাধু-পুরুষ জানিয়া, বিচার-পতি তাঁহাকে উলঙ্গাবস্থায় বিচরণের আদেশ দেন।

স্বামীজী দুইশত আশী বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮০৯ শকাব্দের পৌষ মাসে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কালপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর দিনে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া দেহরক্ষা করেন। স্বামীজী—"মহাবাক্য-রত্নাবলী" নামক একখানি উপদেশ পূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

রামদাস স্বামী

রামদাস স্বামী দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী সাধু ও ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রামনবমীর দিনে গোদাবরী নদীর উত্তর-তীরে জম্বুগ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে রামদাস স্বামীর জন্ম হয়। রামদাস স্বামীর আদি নাম "নারায়ণ"। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যজীপন্ত ও মাতার নাম রাণু-বাঈ। রামদাসের অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং রাণু-বাঈকে সংসারের সকল ভার বহন করিতে হইয়াছিল। নারায়ণ বাল্যকাল হইতেই পরম রামভক্ত ছিলেন। তাঁহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনোহর বেশে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা উপদেশ ও রাজা শিবাজীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দেন। তদবধি তিনি জনসমাজে "রামদাস" নামে বিখ্যাত হন। ক্রমে তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইতে লাগিল। রাণু-বাঈ ইহা লক্ষ্য করিয়া সত্বর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া বর-পাত্রী গৃহে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত মঙ্গলাষ্টক পাঠ কালে রামদাসকে সাবধানে উচ্চারণ করিতে বলেন। রামদাস ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় পুরোহিত বলিলেন, "সাবধানে উচ্চারণ কর ও সাবধান হও। পূর্ব্বে তুমি একা ছিলে, এখন একটী গুরুভার তোমার উপর ন্যস্ত হইল।" এই কথা শুনিবামাত্র রামদাস বুঝিলেন, সংসার-

বন্ধনে সুখ ও শান্তির লেশমাত্র নাই, সংসার অসার, ইহা কেবল দুঃখময়। তিনি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিলেন।

রামদাস পলায়ন করিয়া 'নাসিক' নামক স্থানে একটী পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় উদ্ধব নামে একটী বালক তাঁহার শিষ্য হয়। এখানে তিনি দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর রামদাস সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপ হইয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন করতঃ পঞ্চবটীতে গমন করেন। তিনি অনেক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ধর্ম্ম ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর তিনি জম্বুগ্রামে গিয়া তাঁহার মাতা রাণু-বাঈয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন।

রামদাস ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবটী ছাড়িয়া উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণানদীর অভিমুখে চলিলেন। এইরূপে তিনি নানা বিজন বনে, গিরিগুহায়, নদীতীরে থাকিয়া জপ-তপে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা শিবাজী রামদাস স্বামীর সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। শিবাজীর দেব-দ্বিজের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তিনি রামদাস স্বামীকে দর্শন করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। এক দিবস শিবাজী স্বপ্নে দেখিলেন যে, ঐ মহাপুরুষ তাহার মস্তক স্পর্শ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "বৎস! তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আমি দেবতার আদেশে গোদাবরী হইতে কৃষ্ণানদীর তীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। তোমার দেবতার প্রতি এরূপ অচলা ভক্তি চিরস্থায়ী হউক। এখন আর্য্য-ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। যাহাতে

ইহার উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর শিবাজী স্বামীজীর অন্বেষণে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে চাপড়ের দেবমন্দিরে তাঁহার দর্শন পাইলেন। শিবাজীর অনেক অনুনয় বিনয়ের পর স্বামীজী তাঁহাকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়া রাজাকে প্রতাপগড়ে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ইনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামদাস স্বামী মাহুলীতে অবস্থান কালে তত্রস্থ বালকদিগের সহিত একত্রে খেলা করিতেন। কখন তাঁহাদের সহিত গাছে উঠিতেন, কখন দৌড়াইতেন। এই কারণে বালকগণও তাঁহার নিকটে সদা সর্ব্বদা আসিতে বড় ভালবাসিত। একদা কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলেন, "বালকদিগের সহিত ছেলেমো করা আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোকের উচিত হয় না।" তাহাতে স্বামীজী প্রত্যুত্তরে এই কবিতাটী বলিয়াছিলেন ;—

"বড় যারা হয় তারা দুষ্ট অতিশয়,
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয়।
বালকের হ'য়ে থাকে সরল অন্তর,
সেই হেতু ভালবাসা তাদের উপর॥"

পরে রামদাস স্বামী সাতারায় আগমন করিলে, রাজা শিবাজী সসম্মানে তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করেন। স্বামীজী এখানে

তিন দিন থাকিয়া মহানন্দে কীর্ত্তনাদি আরম্ভ করিলেন। এই তিন দিনে তিনি যে সকল উত্তম দ্রব্য উপঢৌকন পাইয়াছিলেন, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ দিবসে কেবল ভিক্ষার ঝুলিটী লইয়া রাজার অজ্ঞাতসারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্বামীজীকে দেখিতে না পাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। একক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন পথি মধ্যে রাজা স্বামীজীর দর্শন পাইলেন। উভয়ে নানা কথোপকথনের পর স্বামীজী ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থ-যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ লইতে বলেন। তাহাতে স্বামীজী স্বীকৃত না হওয়ায় রাজা বলিলেন, "তিনি রাজ-গুরু বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তীর্থে ব্যয় ও সৎকার্য্য না করিলে তাঁহার অপযশ হইবে।" রাজার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তাহা স্বহস্তে লইলেন না। রাজা তাঁহার সঙ্গে একজন লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাহারই হস্তে চারি লক্ষ টাকা তীর্থব্যয় স্বরূপ প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য কয়েকজন লোক দ্বারা পাঠাইলেন।

স্বামীজী তীর্থ ভ্রমণকালীন স্থানে স্থানে দীন দুঃখীদিগকে ভোজন, ধন-বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা রাজ-প্রদত্ত অর্থ বিতরণ করেন। কিন্তু তিনি নিজে পূর্ব্ববৎ ভিক্ষা অবলম্বন ও রামগুণ গান করিয়া দিন যাপন করিতেন।

স্বামীজী ত্র্যম্বকেশ্বরে আসিয়া দেব-দর্শনাদি করিতে লাগিলেন এবং শিবাজী-প্রদত্ত সমুদয় দ্রব্য ও অর্থ এই স্থানে বিতরণ করিয়া

ফেলিলেন। অতঃপর তিনি ত্র্যম্বক হইতে পঞ্চবটী ও তথা হইতে পুণ্ঢরপুর হইয়া মাহুলীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। স্বামীজী রীতিমত পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন না। একদা শেয়াপুরে আকাবাঈ নাম্নী কোন বিধবার ধর্ম্মভাব পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রথমে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহাতে বুদ্ধিমতী আকাবাঈ ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র। তখন স্বামীজী আকাবাঈকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, যদি প্রকৃত ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে চাও, তবে তোমার যাহা কিছু আছে উপযুক্ত পাত্রে দান কর। ফলতঃ আকাবাঈ তাহাই করিলেন। পরে তাহাকে ভিক্ষা করিতে আদেশ দিয়া শেষে মন্ত্রদানে দীক্ষিত করেন।

এই সময়ে রাজা শিবাজী রাজকার্য্যে বীতরাগ প্রকাশ করায়, স্বামীজী তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহারই কল্যাণ সাধনে "দাসবোধ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন স্বামীজী "মনাচে শ্লোক" অর্থাৎ মনের প্রতি উপদেশ, "শ্লোকবদ্ধ রামায়ণ" "গুরুগীত", "আত্মারাম" এবং "পঞ্চীকরণ" নামক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাজা শিবাজী "দাসবোধ" খানি প্রত্যহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন।

স্বামীজী নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় চাপড়ে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে, স্বামীজী নিজ হস্তে এখানকার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত।

তাঁহার শিষ্যগণ নানাস্থান হইতে প্রস্তর আনিত, আর তিনি স্বয়ং গাঁথিতেন। ক্রমে রামনবমীর দিন উপস্থিত হওয়ায়, স্বামীজী মহোৎসবে তথায় কীর্ত্তনাদি ও রামগুণ গান করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিত। এই প্রকার সমস্ত বৎসর অতিবাহিত করিয়া রামনবমীর পূর্ব্বে সকলেই একস্থানে একত্রিত হইতেন। স্বামীজী তাহাদের সকলকে লইয়া মহানন্দে রামনবমীর উৎসব সমাধা করিতেন।

রাজা শিবাজী স্বামীজীকে অনুক্ষণ দেখিবার জন্য তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে পরেলি পর্ব্বতস্থিত দেবমন্দিরে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিলেন। স্বামীজী তদবধি (১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে) সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। স্বামীজী ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া জননীর সৎকারের জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। সুস্থকায়া রামদাস-জননী জানিতেন না যে, কল্য তাঁহার জীবলীলার অবসান হইবে। জননীর দেহত্যাগের পর স্বামীজী পরেলিতে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান ধারণায় ও রামগুণ কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃষ্টাব্দে) শিবাজী জ্বরাক্রান্ত হইয়া চৈত্র মাসে ভবলীলা সংবরণ করিলেন। তৎপুত্র শম্ভাজী পিতৃস্থান অধিকার করিলেন। শম্ভাজীও পিতার ন্যায় স্বামীজীর আদেশানুযায়ী

সকল কার্য্য করিতেন ও স্বামীজীকে গুরুর তুল্য ভক্তি করিতেন। কিছুদিন পরে স্বামীজী পীড়িত হইয়া, ক্রমে অন্ন-জল ত্যাগ করতঃ দেবতার সমক্ষে পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেবের এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও অনাহারে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে দেখিয়া শিষ্যমণ্ডলী ভীতি-বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতে লাগিল। স্বামীজী তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আত্মার বিনাশ নাই—কেবল দেহ রূপান্তর মাত্র হইবে।" ইহাতে শিষ্যগণ বলিল, "এখন আপনার দর্শন ও উপদেশ বাক্যে যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিতেছি, আপনার অবর্ত্তমানে তাহা হইতে বঞ্চিত হইব বলিয়া রোদন করিতেছি।" স্বামীজী বলিলেন, "তাহারা দাসবোধ ও আত্মারাম গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে সর্ব্বদাই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ পাইবে।"

এই সময়ে কোন শিষ্য তাঁহার পাদুকা স্থাপন করিবার কথা উত্থাপন করেন। স্বামীজী, তাঁহার শিষ্যগণ পাদুকাপূজা করিয়া পাছে আসল শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় তিনি পাদুকা একটী গহ্বর মধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দেন। অতঃপর ভজন ও কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইল। স্বামীজী মহানন্দে মাতিয়া নিজেও কয়েকটী অভঙ্গ গাহিয়াছিলেন। তাহার শেষ গানটী এই,—

"এই আশে করিলাম তোমায় ভজন,
আসন্নকালেতে মোরে করিবে রক্ষণ।
জানি আমি ভুলিবে না আমারে কখন,
তোমার স্বরূপ কালে করিয়ে গ্রহণ।

করেছি তোমারে সদা অন্তরে ধারণ,
এখন নিকটে এসে দাও দরশন।
নিষ্কাম ভাবেতে তাই পূজেছি তোমায়,
অন্তিমকালেতে দেব স্থান দিবে পায়।”

এরূপ কথিত আছে যে, এই শেষ অভঙ্গটী গাহিতে গাহিতে স্বামীজী শ্রীরামচন্দ্রের ঘনশ্যাম মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দেখিতে পান এবং তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়া ইনি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মাঘমাসে স্বর্গারোহণ করেন। রাজা শম্ভাজী স্বামীজীর এই সংবাদ” শুনিয়া অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর আদেশানুযায়ী পরেলিতে তাঁহার পাদুকা স্থাপন করিয়া তদুপরি শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করান। এখনও প্রতিবৎসর এখানে স্বামীজীর বাৎসরিক উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে।

স্বামীজী সকল প্রজার সুখের জন্য রাজা শিবাজীকে সদুপদেশ দিতেন ও “দাসবোধ” তাঁহারই কল্যাণ সাধনের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে কত যে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

আউলেচাঁদ

কর্ত্তাভজা নামে একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় যাহা আজও বিদ্যমান আছে, তাহা এই আউলেচাঁদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার প্রকৃত ইতিহাস কিছুই জানিবার উপায় নাই। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্ম-স্থানই বা কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, কোথা হইতে একবার এক সন্ন্যাসী আসিয়া তেঁতুল গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার পায়ে খড়ম, গায়ে কাঁথা ও কটিতে কৌপীন পরা। একদা কোন দরিদ্র গৃহস্থের একটী বালকের মৃত্যু হওয়ায় তাহার জননী শোকাতুরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত সন্তানকে কোলে লইয়া সেই তেঁতুল-তলা দিয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসী জননীর ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া মৃত শিশুটীকে বাঁচাইয়া দেন। সেই দিন হইতেই আউলেচাঁদের দৈব শক্তির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আবার কেহ কেহ বলেন, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী উলা-গ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই বাস করিত। ১৬১৬ শকের ১লা ফাল্গুন শুক্রবারে সে আপনার বরজে পান তুলিতে গিয়া একটী আট বৎসরের বালককে তন্মধ্যে দেখিতে পাইল। বালকটী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। বারুই তাহার নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা

করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোথায়, তোমার নাম কি, তোমার পিতার নাম কি, তুমি কি করিয়া কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ? বালক নিজে কিছুই উত্তর করিতে পারিল না; কেবল এই মাত্র বলিল, আমি কিছুই জানি না। পল্লী-বাসীরাও কেহই তাহার পরিচয় দিতে পারিল না। অগত্যা সেই বারুই তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া পুত্রের মত প্রতিপালন করিতে লাগিল। বারুইয়ের স্ত্রী বালককে সুশ্রী ও সৌম্যকান্তি দেখিয়া তাহার পূর্ণ-চন্দ্র নাম রাখিয়া দিল। কথিত আছে, পূর্ণচন্দ্র প্রায় দ্বাদশ বর্ষ এই বারুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন।

বারুইয়ের বাটীর সন্নিকটে হরিহর বণিক নামে এক বিষ্ণুভক্ত বাস করিতেন। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বিবিধ শাস্ত্রালোচনা ও সংকীর্ত্তনাদি হইত। পূর্ণচন্দ্র প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-লাভ করিলেন। নির্ব্বোধ বারুই ধর্ম্ম-চর্চ্চায় তত রত ছিল না, তাই সে পূর্ণচন্দ্রকে হরিহরের বাটীতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল। অযথা এরূপ নিষেধ আজ্ঞা পূর্ণচন্দ্রের সহ্য হইল না; ক্রমে তিনি মর্ম্ম পীড়ায় ব্যথিত হইয়া বারুইয়ের আশ্রয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। তিনি হরিহর বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর পূর্ণচন্দ্র তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ১৬২৩ শকের চৈত্র মাসে হরিহরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে বৈষ্ণব-চূড়ামণি বলরাম

দাসের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি দেড় বৎসর কাল ঐ স্থানে থাকিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বহির্গত হইলেন। পরিশেষে নানাতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া সাতাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি বেজরা গ্রামে উপস্থিত হন। এখানে হটু ঘোষ ও রামশরণ পাল প্রথমে তাঁহার শিষ্য হইলেন। রামশরণ তাঁহার উপদেশ পাইয়া তাঁহারই আদেশানুযায়ী ঘোষ পাড়ায় কর্ত্তা-ভজা মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এখনও প্রতি বৎসর দোলের সময় তথায় মহাসমারোহে মেলা হইয়া থাকে।

আউলেচাঁদ পায়ে খড়ম, গায়ে কাঁথা ও কোমরে কৌপীন পরিয়া থাকিতেন। তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন ও সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন। মুসলমানের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল না; তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই উপদেশ দিতেন। এই কারণে বোধ হয় মুসলমানেরাই তাঁহাকে "আউলে" নাম দিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় আউলিয়া অর্থে বুজরুক্‌কে বুঝায়। কথিত আছে, আউলেচাঁদ খড়ম পায়ে দিয়া নদীর উপর হাঁটিয়া বেড়াইতেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অনেক আতুরকে আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিরও প্রাণদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মুসলমানেরা এই সকল বুজরুকীর জন্য তাঁহাকে আউলিয়া বলিয়া ডাকিতেন।

ইঁহার অনেকগুলি নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আউলেচাঁদ, প্রভু, আউলে মহাপ্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে ফকির, ফকির ঠাকুর, কাঙ্গালী প্রভু, সাঁই, গোঁসাই প্রভৃতি বহু নামে তিনি জন-

সমাজে প্রসিদ্ধ। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়েরা বলে যে, শ্রীক্ষেত্রে মহা-প্রভুর অন্তর্ধ্যানের পর তিনিই আবার আউলেচাঁদ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য-শাখার মধ্যে হটু ঘোষ, রামশরণ পাল, বেচু ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত, নয়ন, খেলারাম, কৃষ্ণদাস, উদাসীন প্রভৃতি বাইশ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি দৈবশক্তি প্রভাবে অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের পদ এবং দুরারোগ্য ব্যক্তিকে অচিরাৎ আরোগ্য করিতে পারিতেন। তাই তত্রস্থ লোকেরা নিম্ন লিখিত গানটী বাঁধিয়াছিল।

"এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এল।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি, ক'চ্ছে প্রেমে ঢলাঢল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়,
এর হুকুমে গঙ্গা শুকাল।"

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা করাই সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু আউলেচাঁদ নিজে মনুষ্যরূপী ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যই সত্য এবং মনুষ্যরূপী গুরুই পরম পদার্থ। পূর্ব্বে এ সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র ব্যভিচার দোষ ছিল না। ইঁহাদের প্রচলিত একটী বচন ছিল,—

"মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা,
তবে হয় কর্ত্তাভজা।"

এই বচন অনুযায়ী পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগ্নী বলিয়া মনে করিতেন ও ভগ্নী বলিয়া ডাকিতেন। এমন কি, সকলে এক সঙ্গে ভোজন ও এক সঙ্গে শয়ন করিতেন। ক্রমে এইরূপে স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে শয়ন করিতে করিতে এখন ব্যভিচার দোষ এই কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায়ের সাধনের একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আউলেচাঁদ দশটী পাপ-কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—

শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক দশবিধ পাপ।

শারীরিক—পরস্ত্রীগমন, জীবহত্যা ও পরদ্রব্য অপহরণ করা।

মানসিক—পরস্ত্রী গমনের ইচ্ছা, অপরের প্রাণনাশ করিবার ইচ্ছা ও পরের দ্রব্য অপহরণের ইচ্ছা।

বাচনিক—অনর্থক বাক্য ব্যয় করা, প্রলাপ বকা, মিথ্যা কথা বলা ও কটুবাক্য প্রয়োগ করা।

আউলেচাঁদ ১৬৯১ শকে বোয়াল গ্রামে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার বাইশ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে আট জন শিষ্য বোয়ালে গ্রামে তাঁহার গায়ের কাঁথার সমাধি দিয়া চাকদহের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে পরারি গ্রামে তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া তথায় দেহের সমাধি করিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশ-সম্ভূত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্যভাষায় রীতিমত শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুইটী পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুইটী কন্যা ছিল। রামদুলালের পুত্রের নাম রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম গোরাচাঁদ ও কালাচাঁদ। রামমোহনের জয়নারায়ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র জন্মে; ইহাদের মধ্যে দুর্গাদাস নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জয় নারায়ণের পুত্র গোপালকৃষ্ণ এবং গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম কালীপদ। শুনিয়াছি এই কালীবাবু এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের পদে অভিষিক্ত আছেন।

অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যু হয়; সুতরাং সমস্ত সংসারের ভারই ইঁহার উপর পড়ায়, ইনি কলিকাতার কোন একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে মুহুরীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে ইনি মাসিক যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই ইঁহার কায়ক্লেশে একপ্রকার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ইনি একদা আপন প্রভুর জমাখরচের খাতার মধ্যে "আমায় দেও মা তবিলদারী" এই

গানটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতম কর্ম্মচারী খাতায় গান লেখা দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহা প্রভুকে দেখান। কিন্তু ইঁহার প্রভু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি এই গানটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং তদবধি রাম-প্রসাদকে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আর কাহারও চাকরি করিতে হয় নাই; একমাত্র ইষ্টদেবের উপাসনায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

আমায় দেও মা তবিলদারী;
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

কৃষ্ণ-নগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ইঁহার কবিত্ব-শক্তি ও ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া, ইঁহাকে বেতন দিয়া স্বীয় সভায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি যখন চাকরি করিতে কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন রাজা ইহাকে ১৪ বিঘা

নিষ্করভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদও কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দেন।

কুমারহট্ট গ্রামে অচ্যুত গোস্বামী নামে একজন পাগল কবি ছিলেন। লোকে তাঁহাকে আজু গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। রামপ্রসাদ একটী গান রচনা করিলেই, পাগল কবি অমনি তাহার একটী উত্তর রচনা করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে ভাল বাসিতেন। এজন্য মধ্যে মধ্যে কুমারহট্টে আসিয়া উভয়ের কবিতাযুদ্ধ দেখিতেন। সাধক রামপ্রসাদ গাহিতেছেন—

এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি যে পাষাণের বেটী॥

আজু গোঁসাই প্রত্যুত্তরে গাহিলেন—

এ সংসার সুখের কুটি,
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি,
যার যেমন মন তেমনি ধন, মন কররে পরিপাটি।
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ে পেতে দেয় দুধের বাটি।
তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া কোথায় যাবে মায়া কাটি।
আমার মায়ের দোহাই দিয়ে, ধ'র্‌গে বাবার চরণ দু'টি॥

রামপ্রসাদের গান—

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহারলোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক কত শত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥

প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই—

ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্ আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হ'লে পরে জ্বর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি।
তুই ডুবিস্‌নে মন ধ'র্‌গে ভেসে, রাধা-শ্যামের চরণ-তরি॥

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণশশী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী।
হৃদ্‌কমলে ভাব ব'সে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥

গোঁসাইজী উত্তর দিলেন—

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে সেথায় গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে ব'সে থাকিস্ যদি, ধ'র্‌বে তোরে যক্ষ্মাকাশী।
এই বেলা নে তল্‌পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি॥

কথিত আছে, নবাব সিরাজদ্দৌলাও রামপ্রসাদের গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ বঙ্গসাহিত্য-সমাজের উজ্জ্বল কোহিনুর। ইঁহার রচিত

সুমধুর পদাবলী ও কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে আরও দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে। রামপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক অসংখ্য গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। গানগুলিও অতি সুললিত এবং হৃদয়গ্রাহী। ইনি যে কোন বিষয় উপলক্ষ করিয়া শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিতেন। ঘানিগাছ দেখিয়াই গান রচনা করিলেন।

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।"

শুনিয়াছি, একদিবস রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে আপন মনে শ্যামা সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। বেড়ার একপার্শ্বে নিজে অপর পার্শ্বে তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী থাকিয়া তাঁহার দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কোন কারণ বশতঃ কখন যে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি গানে বিমুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ বেড়া বাঁধিতেছিলেন। জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ হইয়াছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একলা কি করিয়া এত শীঘ্র বেড়া বাঁধা শেষ করিলেন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কেন মা! তুই ত ওধারে থাকিয়া আমাকে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে।" তদুত্তরে জগদীশ্বরী বলিলেন, "না, আমি ত বাড়ী গিয়াছিলাম, এই মাত্র আসিতেছি।" তখন রামপ্রসাদের মোহ ভাঙ্গিল—চৈতন্য হইল, তিনি বুঝিলেন—স্বয়ং দেবীই তাঁহার কন্যারূপে আসিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতেছিলেন।

ইনি তান্ত্রিক মতাবলম্বী শক্তির (কালীর) উপাসক ছিলেন। এজন্য সাধনার অঙ্গবোধে কখন কখন অল্প পরিমাণে সুরা-পান করিতেন। এক দিবস কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলায়, তিনি হাসিতে হাসিতে এই গানটী তাহাকে শুনাইয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-সুড়ীতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে॥
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

ইনি শেষ জীবনে ক্রিয়া পাইয়া পঞ্চবটীর তলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করতঃ রীতিমত যোগাভ্যাসে রত হন। ইঁহার যোগ সাধনার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইঁহার গীতে পাওয়া যায়।

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই, সে দেশের এক লোক পেয়েছি ;
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা ক'রেছি।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি ;
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনারে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা ক'রেছি।

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্মকর্ম্ম সব তেজেছি।

রামপ্রসাদ নিজের মৃত্যু জানিতে পারিয়া, মৃত্যুর পূর্ব্বে চারিটী গান রচনা করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়

(১)

কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে,
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে।
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥

(২)

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যেখানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয়ে হয়ে মিশায় জলে॥

(৩)

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছিলাম ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে রবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জন ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥

(৪)

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে তেম্নি সুখ কি আছে ॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি
(মাগো ওমা) ফাঁকি উপরে ফাঁকি ডান চক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই
(মাগো ওমা) দিয়ে আশা কাটলে পাশা তুলে দিয়া গাছে
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণা জোর বড়
(মাগো ওমা) আমার দফা হ'লো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥

কথিত আছে, শেষের গানটী গাহিতে গাহিতে "দক্ষিণা হয়েছে" এই কথাটা বলিবামাত্র অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত অবস্থায়, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া গেলে, ইঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বঙ্গীয় পশ্চিম প্রদেশে ১১৩২ বঙ্গাব্দে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান চন্দ্র গাঙ্গুলী ইঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন। গুরুজী দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। লোকনাথ দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরু-গৃহে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। এই সময় তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

উপনয়ন সমাধা হইলে তিনি আরো কয়েক বৎসর গুরু-গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করেন। পরে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই সহিত কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন কালী-ঘাট মহাজঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই জঙ্গলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া যোগোপাসনা করিতেন। লোকনাথ গুরুজীর আদেশে এই জঙ্গলে থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই সময় লোকনাথের মন-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তাঁহার প্রিয় বাল্য-সখীকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যার ফল নষ্ট করিতে লাগিলেন। গুরুজী তাঁহার এই মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিলেন ও বাল্য-সখীর সহিত তাঁহার সম্মিলন করিয়া দিলেন। লোকনাথের বাল্য-সখী বাল্যাবস্থায় বিধবা হওয়ায় তাহার চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। সুযোগে সুযোগ বাধিল। লোকনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বাল্য-

সখী সম্মত হইল। লোকনাথ সখীর সহিত এইরূপ কিছুদিন থাকার পর সম্ভোগ ইচ্ছায় বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া ধর্ম্ম-তত্ত্বে পুনরায় মন আকৃষ্ট করিলে গুরুজী ভগবান চন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন করেন।

গুরুজী লোকনাথকে সকল ব্রতানুষ্ঠান শিক্ষা করাইয়া মনঃ সংযম করাইয়াছিলেন। দীর্ঘ-কালাবধি এইরূপ অনশনে ব্রতানুষ্ঠানে থাকিয়া লোকনাথ গুরুকৃপায় জাতিস্মর হইলেন। তিনি নিজের পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্ব জন্মে অমুকের পুত্র ছিলাম, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে আমার বাস ও সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাম ছিল।" বাস্তবিকই পরীক্ষা দ্বারা ইঁহার কথার সত্যতা উপলব্ধি করা হইয়াছে।

লোকনাথ গুরুজীর সহিত নানাতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে আসিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হন। এই সময় ত্রৈলিঙ্গ স্বামীও তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভগবান চন্দ্র নিজের কাল পূর্ণ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য লোকনাথকে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তথায় যোগাবলম্বনে দেহরক্ষা করেন।

লোকনাথ গুরুজীর মৃত্যুতে মর্ম্মপীড়িত ব্যথিত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীজীর নিকট কিছুদিন যোগশিক্ষা করতঃ হিমালয় পর্ব্বতস্থিত কোন গুহার মধ্যে দীর্ঘকালাবধি থাকিয়া কঠোর যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি



লোকনাথ ব্রহ্মচারী

পৃঃ—২১৭

করেন। এই স্থানে তিনি ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দেহ রক্ষা করেন।

কথিত আছে, তিনি জীব জন্তুগণের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং অনেক দুরারোগ্য রোগীকে আরোগ্য করিতে ও অন্যের রোগ নিজ দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া রোগীর রোগ মুক্ত করিতে পারিতেন।

নারায়ণ স্বামী

অযোধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে "চুপিয়া" নামক এক ক্ষুদ্র নগরে হরিপ্রসাদ নামক সামবেদীয় কৌথুমী-শাখার সাবর্ণ-গোত্রজ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম "বালা"। উক্ত হরিপ্রসাদের ঔরসে ও বালার গর্ভে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লনবমীতে নারায়ণ স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। হরিপ্রসাদের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামপ্রতাপ, মধ্যম ঘনশ্যাম (নারায়ণ স্বামী) ও কনিষ্ঠ ইচ্ছারাম। বাল্যকালে হরিপ্রসাদ নারায়ণ স্বামীকে "ঘনশ্যাম" বলিয়া ডাকিতেন। যথাসময়ে ঘনশ্যামের উপনয়ন হয়। দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃ-মাতৃহারা হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইলে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য বহির্গত হন। তাঁহার মাতুল গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য অনেক মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঘনশ্যাম সংসারের মায়া কাটাইয়া—সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া—ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ক্রমাগত ছুটিয়াছেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য কে রোধ করিবে?

অবশেষে তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুর নিকট দীক্ষিত হওত একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি কেদার-

নাথ, বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া দাক্ষিণাত্যের এক নিবিড় অরণ্যে থাকিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরে সিদ্ধ হইয়া তিনি "নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী" নামে অভিহিত হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে তিনি জুনাগড়ের সন্নিকটে লোজ-গ্রামে উপস্থিত হইয়া রামানন্দী সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেন এবং রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলেন। তদবধি তিনি "সহজানন্দ" নাম প্রাপ্ত হইয়া বিংশতি বৎসর বয়সে ধর্ম্ম-প্রচারে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার আধ্যাত্মিক মুক্তি-তত্ত্বের উপদেশে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

তিনি যোগবলে এরূপ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার শিষ্যগণ দেখিবামাত্রই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বলিয়া মনে করিত। একদা রামানন্দ স্বামী লোকমুখে এই কথা শুনিয়া সহজানন্দের এই অমানুষিক শক্তির বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। পরে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার শরীরে আবির্ভূত দেখিলেন। রামানন্দ স্বামী দেহত্যাগ কালীন সহজানন্দকে আপনার গদিতে বসাইয়া যান। এই সময় হইতে সহজানন্দ "নারায়ণ স্বামী" নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ভবনগর রাজ্যের গঢ়ড়ানামক স্থানে "দাদাএভলকে" দীক্ষিত করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করেন এবং স্বীয় মত প্রচার হেতু আটশত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইনি স্থানে স্থানে অনেকগুলি লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির স্থাপন

করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আহ্মদাবাদের স্বামী নারায়ণের মন্দির সবিশেষ বিখ্যাত।

এই সময়ে তাঁহার লক্ষাধিক শিষ্য হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গদি দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ আহ্মদাবাদ ও বড়তাল দুই স্থানে স্থাপিত করেন। আজিও সেই গদিতে তাঁহার বংশধরেরা অধিষ্ঠিত আছেন। স্বামীজী "দাদা-এভল-কাচরকের" বাটীতে দরবার-মন্দির নির্ম্মাণকালীন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লদশমীতে দেহ রক্ষা করেন। অতঃপর শিষ্যেরা গুরুদেবের পাথরের পাদুকা উক্ত দরবার-মন্দিরে পূজার্থ স্থাপন করেন। ইনি "শিক্ষাপত্র" ও "সৎ-সঙ্গজীবন" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে সৎসঙ্গজীবন ২৪০০০ শ্লোকে পূর্ণ বৃহদাকার গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বঙ্গদেশের অন্তর্গত হুগলি জেলার কামার পুকুর নামক গ্রামে ১২১৪ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার এই মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। ক্ষুদিরাম বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। বাল্যকালে রামকৃষ্ণ লেখা পড়ায় তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। তিনি পাঠে অবহেলা করিয়া অধিকাংশ সময়ই খেলা করিয়া কাটাইতেন। সঙ্গীত-চর্চ্চায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কোথাও গান বাজনা হইলে, তিনি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে তিনি বিনা সাহায্যে নিজে নিজে সাধনাদ্বারা সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠেন।

কলিকাতার দুই ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে ভাগীরথী তীরোপরি এক সুরম্য উদ্যান মধ্যে দ্বাদশটী কালী মন্দির স্থাপিত আছে। ইহা মাড়বারবংশীয়া রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক বহুব্যয়ে ১২৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। রামকুমার বাবু এই কালিকাদেবীর পূজার্চ্চনাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় রামকৃষ্ণের বয়স আঠার বৎসর। উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত জয়রাম বাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

রামকুমার বাবুর মৃত্যুর পর, রামকৃষ্ণ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। তিনি ভীতচিত্তে অতি যত্নে ভক্তির সহিত মায়ের পূজাদি সম্পন্ন করিতেন। এই সময় তাঁহার যোগ-শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, তিনি উদ্যানের উত্তরাংশে থাকিয়া তত্রস্থ পঞ্চবটী বৃক্ষের তল-দেশে আসন প্রস্তুত করিয়া যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং কাম রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া কামিনী ও কাঞ্চন একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইনি সকল সম্প্রদায়কেই সমজ্ঞান করিতেন। ইঁহার সম-দর্শিতা-গুণে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি ব্রাহ্ম, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকলেই ইঁহাকে ভালবাসিত। ইঁহার বৈরাগ্যভাব, ব্রহ্মজ্ঞান, প্রেমভক্তি ও সরলতা প্রভৃতি দর্শনে সকলেই ইঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। ইঁহার স্বতন্ত্র কোন উপাসনা পদ্ধতি ও তদ্দ্বারা শিষ্য-করণের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া বোধ হয়; কেননা, ইনি গুরু-গিরি ভাল বাসিতেন না; কিন্তু ইঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া বোধ হইত যে, ইঁহার কোনরূপ সাধনা ছিল। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ইঁহার সেই সাধনার ফল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। ইনি বলিতেন, যেমন বাঁশ, দড়ি, মই, সিঁড়ি প্রভৃতি দ্বারা ছাদের উপর উঠা যায়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য নানারূপ পন্থা আছে। অতএব সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাব অতীব দূষণীয়। ইনি বাহ্য-আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। ইঁহার উদার ভাব ও মধুর উপদেশে বিশেষতঃ সহজ সামান্য কথায় ও

দৃষ্টান্তে অনেকের মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হইত, অনেক নাস্তিকও ইঁহার সহবাসে পরিশেষে আস্তিক হইয়াছিল। কিন্তু এখন ইঁহার যত ভক্তবৃন্দ দেখা যায়, ইঁহার জীবদ্দশায় ইহার এক চতুর্থাংশও ছিল না।

পরমহংসদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গলনালীতে একটী স্ফোটক হইয়া উহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহার ভীষণ-যন্ত্রণায় তরল খাদ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য তিনি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। ক্রমে স্ফোটক এরূপ ভীষণতর হইয়া উঠিল যে, তিনি তখন কোন দ্রব্যই আর আহার করিতে পারিতেন না। গুরুদেবের এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও অনাহারে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে দেখিয়া শিষ্য-মণ্ডলী ভীত হইয়া সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতাস্থ বাগ্‌বাজারে আনয়ন করেন। এখানে চিকিৎসায় বিশেষ সুফল না হওয়ায় পুনরায় তাঁহাকে কাশীপুরের একটী বাগান বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে থাকিয়াই তিনি ১২৯৩ সালে ৩১ সে শ্রাবণ রবিবার ৫২ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরপুরে গমন করেন।

রামকৃষ্ণের শিষ্য সম্প্রদায়কে "রামকৃষ্ণ মিশন" কহে। ইহাঁরা গুরুদেবের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ভারতে তিনটী 'মঠ' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার সন্নিকটে হাওড়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীকূলে বেলুড় নামক গ্রামে জাহ্নবী-তটোপরি একটী 'মঠ' সন ১৩০৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠে প্রাত

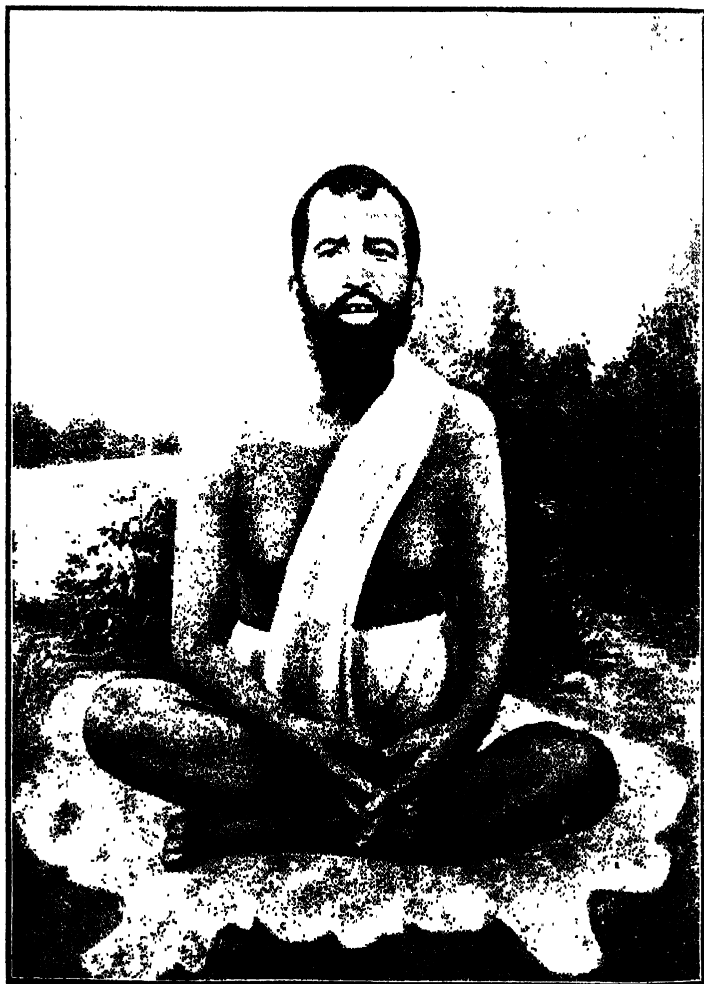
বৎসর ফাল্গুন মাসে পরমহংসদেবের মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন তথায় বহুলোকের সমাগম ও দীন দুঃখীদিগকে খাওয়ান, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য হইয়া থাকে। ইহাকে "বেলুড় মঠ" বলে। এই মঠে পরমহংসদেবের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ অস্থি, পাদুকা, পুথি প্রভৃতি বহুযত্নে সংরক্ষিত ও শিষ্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রত্যহ নিয়মিত পূজা ও পাঠ হইয়া থাকে।

এ ছাড়া কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত "মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম" ও মান্দ্রাজের সমুদ্রতীরে "মান্দ্রাজ মঠ" সংস্থাপিত হইয়াছে। বেলুড় মঠের ন্যায় এখানেও শিষ্য-মণ্ডলীর দ্বারা সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ইঁহার কথিত বচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু ইনি লেখা-পড়া জানিতেন না বলিয়া হউক, অথবা যে কারণে হউক, ঐ সক-লের মধ্যে কোন কোনটীতে মতভেদ লক্ষিত হয়। যাহা হউক, এই ভক্তপ্রবর যে তাঁহার অনেক শিষ্যকে ভক্তি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধুনাতন বিবেকানন্দ ও শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি ইঁহারই শিষ্য। ইঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত জীবন-চরিত অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়।

বচন বা উপদেশ

পরমহংসদেবের উপদেশ মনের সহিত মিশে, প্রাণের সহিত



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পৃঃ—২২৫

কথা কয়, আবার ঘোর সংসারীরও বৈরাগ্য উদয় হয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

১। একদিন পরমহংসদেব নেংটা তোতাপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে রোজ ধ্যান করিবার আবশ্যক কি?" তাহাতে তোতাপুরী উত্তর করিলেন, "ঘটী যদি নিত্য না মাজা যায়, তাহা হইলে কলঙ্ক পড়ে। সেইরূপ প্রত্যহ ধ্যান না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "যদি সোণার ঘটী হয়, তাহা হইলে কলঙ্ক পড়ে না, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ হইলে আর সাধন ভজনের দরকার হয় না।"

২। চিকের ভিতরে বড় লোকের মেয়েরা থাকিয়া যেমন বাহিরের সকলকে দেখিতে পায়, অথচ তাদের কেউ দেখিতে পায় না। ভগবান ঠিক সেইরূপে সকলের ভিতরে বিরাজ করেন ও সকলকে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখিতে পায় না।

৩। মায়া আর জলের পানা দুইই সমান। পানা যেমন ঠেইয়ে দিলে স'রে যায়, আবার একটু পরেই সেই স্থান পরিপূর্ণ করে। মায়াও তেম্‌নি, যতক্ষণ ধর্ম্ম বিচার কর সাধু সঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই, আবার পরক্ষণেই বিষয় বাসনারূপ আবরণে আবৃত করে।

৪। পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে, যেমন মটর গজ্‌ গজ্‌ করে, সেইরূপ বদ্ধ জীবের বিষয় বাসনা সর্ব্বদা তাদের

ভিতর গজ্ গজ্ করে। তাদের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্মকথা ভাল লাগে না।

৫। কুমীরের গায়ে অস্ত্র মার্‌লে যেমন অস্ত্র ঠিক্‌রে যায়, গায়ে বসে না, তেম্‌নি বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, সব ব্যর্থ হয়, তাদের প্রাণে বেঁধে না।

৬। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র সমান হইলেও যেমন জল ও আর্শির ভিতর বেশী প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তেম্‌নি ভগবান সকল হৃদয়ে সমান বিকাশ হইলেও সাধুহৃদয়ে বেশী প্রকাশ পায়।

৭। যেমন সকল পিঠের ঠোল এক রকম হইলেও পুরের বিভিন্নতা থাকে, কাহারও ভিতর নারিকেল, কাহারও ভিতর ক্ষীর ইত্যাদি; সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ পুর অর্থাৎ গুণ হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

৮। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু কেউ বা খুব পণ্ডিত হয়, কেহ বা পূজা করে, কেহ বা রাঁধুনী হয়, আবার কেহ বা বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি দেয়।

৯। যদি কাহারও প্রকৃত অনুরাগ হয় ও সাধন ভজন করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সদ্-গুরু আপনি প্রাপ্ত হন। গুরুর জন্য তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান বা চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না।

১০। পঞ্জিকায় বিশ আড়া জলের কথা লেখা আছে, কিন্তু পঞ্জিকা

নেংড়ালে তার এক ফোঁটাও পাওয়া যায় না; তেম্নি পুঁথিতে ধর্ম্মকথা অনেক লেখা থাকে, শুধু প'ড়লে হয় না, সাধন চাই।

১১। বালককে যেমন রমণসুখ বুঝান যায় না, সেইরূপ মায়া মুগ্ধ বিষয়াসক্ত সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বুঝান যায় না।

১২। 'তাক্ তেরে কেটে তাক্' বোল মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু হাতে বাজান বড় কঠিন। সেই রকম ধর্ম্মকথা বলা অপেক্ষা কার্য্যতঃ করা বড় কঠিন।

১৩। হিন্দুস্থানী মেয়েরা ৪।৫টী জলের কলসী মাথায় ক'রে নিয়ে যায় ও রাস্তায় আত্মীয় লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে গল্প করে, ভাল মন্দ কথা কয়, কিন্তু তাদের মন সর্ব্বদা মাথার কলসীর উপর থাকে, পাছে প'ড়ে না যায়। ধর্ম্মানুরাগী পথিকদেরও সেইরূপ সকল সময় ভগবানে মন রাখ্‌তে হবে, যেন মন সে পথ থেকে বিচলিত না হয়।

১৪। দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক যেমন সংসারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া সকল কাজকর্ম্ম করে, অথচ সর্ব্বদা তার মন প্রাণ সেই উপপতির উপর প'ড়ে থাকে এবং তার জন্যই ভাবে, কখন সে আস্‌বে, কখন তার সঙ্গে দেখা হবে। সেই রকম তোমরাও সংসারে থাকিয়া সকল কাজকর্ম্ম কর, কিন্তু মন সর্ব্বদা যেন সেই ভগবানের উপর থাকে।

১৫। অনেকে সাংসারিক সুখের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, কিন্তু দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে পড়িলে বা মরবার সময় সব ভুলে যায়।

কিরূপ জ্ঞান—যেমন পোষা টিয়াপাখী সারাদিন "কৃষ্ণ রাধা" "কৃষ্ণ রাধা" বুলি বলে, কিন্তু বিড়ালে ধ'রলে তখন "কৃষ্ণ রাধা" বুলি ভুলে গিয়ে নিজের জাতীয় বোল ক্যাঁ ক্যাঁ ক'র্‌তে থাকে।

১৬। নৌকা জলে থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু জল যেন নৌকার ভিতর না ঢোকে। সেইরূপ সাধক সংসারাশ্রমে থাকুক তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাংসারিক ভাব সাধকের মনের ভিতর যেন না থাকে।

১৭। কচি বাঁশ যেমন সহজে নোয়, পাকা বাঁশ নোয় না, জোড় ক'রে নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। তেম্‌নি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরের দিকে টেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরে টানতে গেলে, মন ঈশ্বর ছেড়ে পালায়।

১৮। মানুষের মন ঠিক সরিষার পুঁটুলী। সরিষার পুঁটুলী একবার ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেলে যেমন তোলা কঠিন, তেম্‌নি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে প'ড়লে, তখন মন স্থির ক'রে সংসার ভাব ত্যাগ করা বড় শক্ত হ'য়ে পড়ে। বালকের মন সংসারে ছড়ায় নি, কাজেই অল্পে স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের মন ষোল আনা সংসারে ছড়িয়ে প'ড়েছে, কাজেই তাদের মন ঈশ্বরের দিকে টানা বড় কঠিন হ'য়ে পড়ে।

১৯। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন করিলে, উত্তম মাখন উঠিয়া থাকে, বেলা হ'লে তেমন হয় না। সেইরূপ বাল্য

কাল হইতে যারা ঈশ্বর-পরায়ণ ও সাধন ভজন করে, তাদের ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে।

২০। পুকুরে অল্প জল থাকিলে যেমন আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়. বেশী নাড়্‌লে জল ঘোলা হ'য়ে যায়; তেম্‌নি যদি ভগবানকে পেতে চাও, তবে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে ধীরে সাধন ভজন কর। শাস্ত্র লইয়া মিছে তর্ক বিতর্ক করিও না, কারণ ক্ষুদ্রমতি মানবের মন অল্পতেই গুলিয়া যায়।

২১। কোন ব্যক্তির মনে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করতঃ নির্জ্জনে গিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিতে থাকেন। এইরূপে একাধিকক্রমে বার বৎসর তপস্যার পর কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় বাড়ী আসিলেন। বহুদিন পরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে পাইয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করতঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এই বার বৎসর কাল তপস্যার ফলে তুমি কি জ্ঞানলাভ করিয়াছ। তাহাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া সম্মুখে একটী হস্তীকে দেখিয়া তাহার গাত্রস্পর্শ করতঃ বলিলেন, "হাতী তুই মরে যা," হাতী অমনি তাঁহার অঙ্গস্পর্শে মৃতবৎ হইয়া গেল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রস্পর্শ করিয়া যেমন বলিলেন, "হাতী তুই বাঁচ," অমনি তৎক্ষণাৎ হাতী বাঁচিয়া উঠিল।

পরে বাড়ীর সন্নিকটে নদীর ধারে গিয়া মন্ত্রবলে নদীর এপার হইতে ওপারে চলিয়া গেলেন, আবার ঐরূপ ভাবে

নদী পার হইয়া আসিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে, তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিন বৃথা তপস্যা করিয়াছ, হাতীর মরা বাঁচায় তোমার কি লাভ হইল? আর কঠোর তপস্যা করিয়া নদীর পারাপার মাত্র যাইতে শিখিয়াছ। উহা ত আমরা বিনা তপস্যায় এক পয়সা খরচ করিয়া পারাপার হইয়া থাকি।" আত্মীয়দের নিকট এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল; তিনি ভাবিলেন, যথার্থই আমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বল কি হইল। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সচ্চিদানন্দ লাভের জন্য পুনরায় বহির্গত হইয়া নির্জ্জনে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

২২। সতীর পতির প্রতি, কৃপণের ধনের প্রতি ও বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি যেরূপ টান, সেইরূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হইবে, তখন ভগবান লাভ হইবে।

২৩। লোকে বিষয় লাভ হ'ল না, ছেলে পুলে হ'ল না ব'লে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান লাভ হ'ল না বা তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি অঞ্জলি দেওয়া হ'ল না, এ কথা ব'লে কৈ কেউ ত এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলে না।

২৪। যার প্রকৃত তৃষ্ণা পায়, সে কি সম্মুখে গঙ্গা দেখিয়া গঙ্গাজল ঘোলা বলিয়া অন্যত্র পরিষ্কার জল পান করিতে যায়? তেম্‌নি যার প্রকৃত ধর্ম্ম তৃষ্ণা নাই, সে ইহলোকে কোন ধর্ম্মই ঠিক

করিতে পারে না। কাজেই সে এ ধর্ম্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম্ম ঠিক নয় প্রভৃতি বলিয়া গোলমাল করিয়া বেড়ায়। প্রকৃত তৃষ্ণা থাকিলে অত বিচার করা চলে না।

২৫। প্রকৃত সত্ত্বগুণী যারা, তারা কিরূপ ভাবে কার্য্য করে জান? তারা রাত্রে মশারির ভিতর ধ্যান করে। সকলে মনে করে সে ঘুমোচ্চে, কিন্তু তা নয়, যখন সকলে ঘুমোয় তখন সে পরকালের কাজ করে। তারা বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা লোক দেখান ভাব একেবারেই পছন্দ করে না।

২৬। নিজে মর্‌তে হ'লে যেমন একটী নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মার্‌তে হ'লে ঢাল তরোয়াল চাই। তেমনি অনেক শাস্ত্র না প'ড়্‌লে ও অনেক তর্ক যুক্তি ক'রে লোক্‌কে বোঝাতে না পার্‌লে লোক-শিক্ষা দেওয়া যায় না, কিন্তু নিজের শিক্ষা বা ধর্ম্মলাভ সামান্য বিদ্যায় কেবল মাত্র একটী কথার বিশ্বাসেই হয়।

২৭। পাপ আর পারা দুই সমান। পারা যেমন লুকিয়ে খেলেও হজম ক'র্‌তে পারা যায় না, একদিন না একদিন গায়ে ফুটে বেরোবেই, তেমনি পাপ ক'ল্লেও একদিন না একদিন তাহার ফল ভোগ ক'র্‌তেই হবে।

সাধক কমলাকান্ত

কমলাকান্ত একজন প্রসিদ্ধ সাধক ও বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কাল্‌না গ্রামে ১১৮০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কমলাকান্তের পিতা তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাই উহা কালে অঙ্কুরিত হওয়ায়, তিনি সাত্ত্বিক, অভিমানশূন্য ও পরম দেবীভক্ত হইলেন। তাঁহার গুণ-গরিমা শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ১২১৬ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে নিজ রাজসভায় সভাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন।

রামপ্রসাদের ন্যায় কমলাকান্ত নিজে পদাবলী রচনা করিতে ও দেবীর সম্মুখে তাহা গান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। কথিত আছে, কেহ তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোন সুর ও তালে একটী শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করতঃ নিজে গাহিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি পদাবলী গান করিয়া কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকল বর্দ্ধমানবাসী নরনারীকে এক সময়ে মাতাইয়া গিয়াছেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তাঁহার পদাবলী শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার ইষ্ট নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন এবং তত্রস্থ কোটালহাট নামক গ্রামে একটী সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে তথায়

বাস করিতে অনুরোধ করেন। ফলতঃ মহারাজের প্রার্থনা পূর্ণ হইল।

কমলাকান্ত সস্ত্রীক সেই বাটীতে আসিয়া মহোল্লাসে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র গুরুদেবের সাধন ভজনে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া পূজাদির ব্যয় স্বরূপ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ৺শ্যামা পূজার দিবস গুরুদেবের বাটীতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মায়ের পূজাদি ও দীন দুঃখীদিগকে খাওয়ান প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করাইতেন। সেই দিবস তাঁহার শত্রু মিত্র, আস্তিক নাস্তিক সকলেই তথায় একত্রিত হইয়া মায়ের পূজাদি দর্শন ও কমলাকান্তের ভক্তিগাথা শ্রবণ করিতেন।

একদা কোন ব্যক্তি কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত জানিয়া রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কামিনী কাঞ্চনে অনুরক্ত থাকিয়া কিরূপে সাধন ভজন করেন।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—রমণী-হৃদয় সরলতা, কোমলতা, ধর্ম্ম-ভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার। রমণী সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে সতত যত্নবতী। রমণী স্নিগ্ধ, প্রেমময় ও কমনীয়গুণে বিভূষিতা। সেই একমাত্র রমণী-হৃদয় পুরুষের উগ্র ও কঠোর প্রকৃতি সংযমিত করিতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" অর্থাৎ সাধ্বী রমণী মাত্রেই সেই মহাশক্তি স্বরূপিণী জগদম্বার অংশোদ্ভূতা। সুতরাং সতী সাধ্বী স্ত্রী সংসারে সাধন ও ভজন পথের সমধিক সহায়-স্বরূপিণী আনুকূল্য-রূপিণী, কদাচ বিঘ্নদায়িনী

নহেন। এরূপ সাধন ভজন সহায়িনী প্রিয়ান্তরঙ্গিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী কখনও "কামিনী-কাঞ্চনের" কামিনী হইতে পারে না। সে "কামিনী" স্বতন্ত্র।

কমলাকান্ত সাংসারিক মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া বিবেক-স্রোতে ভাসিয়াছিলেন। কথিত আছে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, মুখাগ্নি প্রদান কালে তিনি নৃত্য করিতে করিতে নিম্ন লিখিত পদটী রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন ;—

"কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার কৃপায় হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা।
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

একদিন রাত্রিকালে কমলাকান্ত "ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা" নামক মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমরবে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি বুঝিলেন, আর কোন মতে নিস্তার নাই। তখন তিনি নির্ভীক চিত্তে পরমানন্দে মাতিয়া

নিম্ন লিখিত পদটী রচনা করতঃ শ্যামা মাকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছিলেন ;—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদ কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা॥

তাঁহার করুণ ভক্তি রসামৃত পদ শ্রবণ করিয়া দস্যুগণ বৈরভাব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ পলায়ন করে।

কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য উদ্যত হন। কিন্তু কমলাকান্ত তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া নিম্ন লিখিত পদটী গাহিলেন ;—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব॥"

এই গানটী গাহিতে গাহিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, কমলাকান্তের মৃত্তিকাস্থিত তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়

হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের পুত্র রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষার পর, আরবী ও পারসী শিক্ষার্থ পাটনায় গমন করেন, তৎপরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও পরিশ্রমগুণে অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। ষোড়শ বৎসর বয়সেই রামমোহন কৃত-বিদ্য হওত গৃহে প্রত্যাগত হন।

এই সময় ইংলণ্ডীয় লোকের সহিত পরিচয় হওয়ায়, তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায়গুণে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, হিব্রু, লাটিন ভাষাগুলিতে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। এ ছাড়া আরো দুই একটী ভাষায় তিনি কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করেন।

অতঃপর ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া, ইনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া ইনি বীতশ্রদ্ধ হন। বৌদ্ধেরা ইঁহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। এইরূপে চারি বৎসর কাল দেশে দেশে ভ্রমণ করতঃ ইনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হন। তৎপরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি সংসারী হন ; কিন্তু সাংসারিক

অর্থকষ্ট হওয়ায়, ইনি রংপুর কালেক্টারিতে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, নিজগুণে সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন।

এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করতঃ বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা উপস্বত্বের একটী ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। এইরূপে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ইনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদে থাকিয়া, শেষে কলিকাতা আগমন করেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ বিষয়ক পুস্তকাদি বাঙ্গালা, আরবী ও পারসী ভাষায় প্রকাশ করিয়া সাধারণে বিতরণ করেন। ইহাতে তিনি সাধারণের বিরাগভাজন ও স্বীয় জননীরও নিকট যথোচিত তিরস্কৃত হইলেন।

অতঃপর তিনি পঞ্চোপনিষদের মূল ভাষ্য বঙ্গানুবাদ, বেদান্ত সূত্রের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রচারিত করিতে লাগিলেন। এই সময় দেশময় সকলেই সাকার উপাসক ছিল। রামমোহন নিজের সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তাগুণে তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরে নিরাকার উপাসনা-প্রথা জাগরূক করিয়া দিলেন। অনেকেই রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। মনস্বী রামমোহন তাহার সদুত্তর ও সদ্‌যুক্তি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার নিরাকার পরব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থরাজি বিতরিত হওয়ায় দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তৎপরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় কমল বাবুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা

করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধাদি প্রকাশ, আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ইনি সামাজিক আন্দোলন করিয়া, অনেককে স্বমতে আনয়ন করেন।

ইঁহাকে নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইঁহার চেষ্টায় সতীদাহ রহিত হয়। ধর্ম্মের জন্য ইঁহার প্রাণ বাস্তবিক কাঁদিয়াছিল।

বহুদিবস হইতে হিন্দুদিগের সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আদেশে সহমরণ প্রথা নিবারিত হয়।

সেই সময় "ইণ্ডিয়ান গেজেটে" তাঁহার প্রশংসা এইরূপে লিখিত হয়,—"রাজা রামমোহন জাতি, পদ ও মান্যে স্বদেশীয় সকলের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু দেশহিতৈষিতা, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বিষয়ে তিনি পৃথিবীর সকলের শ্রেষ্ঠ।"

ইনি দিল্লীর মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হন ও তৎ-প্রদত্ত রাজা উপাধি লাভ করেন। ইনি ফ্রান্সের প্যারিস নগরে গিয়া তত্রস্থ ফ্রান্সপতি ফিলিপের সহিত দুইবার একত্রে আহার করেন ও বিশেষ সম্মানিত হয়েন। অবশেষে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ২টা ২৫ মিনিটের সময় উনষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইংলণ্ড দেশীয় বৃষ্টল নগরে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ইঁহার দুই পুত্র—বাবু হরিমোহন রায় ও বাবু প্যারীমোহন রায়। তাঁহারা এক্ষণে কলিকাতা ও অন্যান্য অনেক দেশের ভূম্যধিকারী ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী।

চাঁদ সওদাগর

গন্ধবণিক্‌কুলে সমুৎপন্ন চম্পাই-নগরবাসী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী চাঁদ সওদাগর মনসামঙ্গল ও মনসার ভাসান প্রভৃতি আখ্যায়িকা সমূহের নায়ক নখিন্দরের পিতা ও বেহুলার শ্বশুর। ইনি পরম শৈব ছিলেন। দৈববশে মনসাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাদ হয়। মনসা দেবী কুপিতা হইয়া প্রতিহিংসাবশে সাধুর ছয় পুত্রকে বিনাশ করেন। সাধু ইহাতেও বিচলিত না হওয়ায় দেবী তাঁহার চৌদ্দডিঙ্গা কালীদহে ডুবাইয়া দিলেন; সওদাগর কিছুতেই দেবীর পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দেবী মনসার কোপে নিরন্ন অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও উদর নিবৃত্তি করিতে পারেন না, এরূপ কষ্টে পড়িয়াও শিবভক্ত সওদাগর কোনরূপ বিচলিত হইলেন না। ক্রমে তাঁহার নখিন্দর নামে এক পুত্র জন্মিল। মনসা নখিন্দরকে বিবাহ রাত্রিতে সর্প দ্বারা বিনষ্ট করিলেন। সাধু ইহাতেও বিচলিত হইলেন না দেখিয়া দেবী শঙ্খচিলরূপে সওদাগরের জটাস্থিত শিবজ্ঞান হরণ করিলেন। এবার চাঁদ সওদাগর প্রকৃতই দরিদ্র হইলেন।

সওদাগরের পুত্র-বধূ সায়বণিক-দুহিতা বেহুলা স্তব-স্তুতি দ্বারা দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃতস্বামী ও ভাসুরদিগকে জীবিত করিলেন এবং জলমগ্ন চৌদ্দডিঙ্গা পুনরুদ্ধার করিয়া শ্বশুরালয়ে

আগমন করিলেন। চাঁদ সওদাগর দেখিয়াই আনন্দ সাগরে ভাসমান, অগত্যা মনসার পূজায় সম্মত হইলেন, সওদাগরের বাড়ীতে মনসার পূজা হইল, দেখাদেখি সকলেই দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চাঁদ সওদাগর প্রাতুর্ভূত হন। চম্পাই নগর বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত, উহার বর্ত্তমান নাম কস্‌বা। তথায় ৫।৬ হাত লম্বা প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এবং সেতেল পর্ব্বত ও গাঙ্গুরে নদী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তথায় কোন বণিক বাস করিলে সর্পদষ্ট হইবে, এইরূপ প্রবাদ আছে।

কবিকুল-কেশরী বিদ্যাপতি

মিথিলার অন্তর্গত কমলানদীর তীরস্থিত গড়বিসপী গ্রামে গণপতি ঠাকুরের ঔরসে অনুমান ২৪১ লক্ষ্মণ সম্বতে কবিকুল-কেশরী বিদ্যাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জীবনচরিত জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক পদাবলীতে রাজা শিবসিংহের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। রাজা শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে "অভিনব জয়দেব" উপাধি দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যে মিথিলাপুরী গৌরবের আধার হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ পরম শৈব ছিলেন। বিদ্যাপতিও কৈলাসনাথ বাণেশ্বর দেবকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, বিদ্যাপতির ভক্তিবলে ভক্তাধীন মহাদেব ছদ্মবেশে তাঁহার দাসত্ব করিয়াছিলেন।

একদা বিদ্যাপতির ভৃত্য উগনা পিপাসাতুর বিদ্যাপতিকে স্বীয় জটা হইতে গঙ্গাজল বাহির করিয়া দিলে, বিদ্যাপতি বিস্মিত হইয়া আগ্রহের সহিত কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভৃত্যরূপী শিব তাঁহাকে বলিলেন—"বৎস! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি,—কিন্তু ইহা প্রকাশ করিও না। প্রকাশ করিবামাত্র তোমার গৃহ পরিত্যাগ করিব।" বিদ্যাপতির পত্নী অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ও মুখরা ছিলেন, তিনি ভৃত্য উগনাকে কোন

জিনিষ আনিতে আদেশ করিলে উগনার তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইল। পত্নী এই তুচ্ছ অপরাধে ভৃত্যকে লগুড়াঘাতে শাসন করিতেছেন দেখিয়া বিদ্যাপতি ছুটিয়া আসিলেন, পত্নীর হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "কি করিলে, কাহার অঙ্গে প্রহার করিলে? উগনা ভৃত্য নয়, উগনা সাক্ষাৎ শিব"। ভৃত্যরূপী শিব অবসর বুঝিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মিথিলায় তাঁহাকে সকলেই শৈব বলিয়া জানে। বিদ্যাপতি যৌবনে "কীর্ত্তিলতা" ও "কীর্ত্তিপতাকা" নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে "পুরুষ পরিকা" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, রাজা শিবসিংহ একবার সম্রাটের কোপে পতিত হইয়া বন্দী হন ও দিল্লীতে নীত হন। রাজকবি বিদ্যাপতিও রাজার সঙ্গে দিল্লী-গমন করেন। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব কবিত্বে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া রাজাকে মুক্তিদান করেন। বিদ্যাপতির এইরূপ অনেক কীর্ত্তিকলাপ আছে।

বিদ্যাপতির একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, নাম হরপতি। ৩২৯ লক্ষ্মণ সম্বতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বাজিতপুরে পুত্র হরপতির সম্মুখে কবিকুল-চূড়ামণি ঠাকুর বিদ্যাপতি মানবলীলা সংবরণ করেন।

সাধক-প্রবর চণ্ডীদাস

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে দুর্গাদাস বাকৃচী নামে জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে দুর্গাদাস বিবাহ করেন। অনুমান ১৩২৫ শকে শ্বশুরালয়ে দুর্গাদাসের এক পুত্র হয়, এই নব জাত বালকই আমাদের সাধক-প্রবর চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের বাল্যাবস্থায়ই দুর্গাদাস পরলোক গমন করেন, পতি-পরায়ণা পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। চণ্ডীদাস বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, বিদ্যালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া যথাকালে চণ্ডীদাসের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিয়া দিলেন। চণ্ডীদাস যৌবনের প্রারম্ভেই দেবী বিশালাক্ষীর পূজারি পদে নিযুক্ত হইয়া স্বর্গীয় পিতার অনুকরণে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। রামমণি নামে একটী যুবতী রজক-রমণী দেবীর মন্দির মার্জ্জনা করিত। রামমণির পবিত্র ভক্তি ও আচারে সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীদাস তাহাকে স্নেহ করিতেন। তান্ত্রিক-প্রধান দেশে তখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিলেও বৈষ্ণবগণের সংসর্গে শাক্ত চণ্ডীদাসের মন রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে আকৃষ্ট হইল, তিনি একদিন বিশালাক্ষীর মধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভেদজ্ঞান দূর হইল, গঙ্গা যমুনায় মিশিয়া গেল—কালী কৃষ্ণ এক হইল।

একদা নিশীথে বিশালাক্ষীর আদেশে কোন ডাকিনী আসিয়া চণ্ডীদাসকে আত্মপরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক বলিল—"দেবীর আদেশ,—তুমি কৃষ্ণলীলা প্রচার কর"। পরে ডাকিনী চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম শুনাইল এবং রামমণির সহিত প্রবর্ত্ত হইয়া "সহজ ভজন" সাধনের উপদেশ দিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। চণ্ডীদাস সেই রাত্রেই শান্তিময়ী প্রতিমা রামমণির কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"শুন রজকিনী রামী !
ও দু'টী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।

চণ্ডীদাস রামীকে রাধারূপে কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-লীলার আস্বাদ গ্রহণ করিলেন, তিনি বাহ্য-জ্ঞানশূন্য, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। লোকে ইহাতে উভয়েরই অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত বিপদে বিপন্ন হইয়া রামমণি চণ্ডীদাসের নিকট অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিলে চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, আমাদের "শ্যাম-কলঙ্কী" অপবাদই ভাল। সমাজের কঠোর শাসনে তাঁহারা আর দেবী-মন্দিরে স্থান পাইলেন না, গ্রামের প্রান্তভাগে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সহজ সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্নচিন্তায় ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং রামমণি দুই চারিদিন পরে আসিবেন বলিয়া ভিক্ষার জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। চণ্ডীদাস অনশনে থাকিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মণের এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়াও গ্রামবাসী কেহই

তাঁহার শুষ্ককণ্ঠে একবিন্দু জল দান করিল না—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যমযন্ত্রণা দেখিতে লাগিল। তৃতীয় দিবস প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল—ব্রাহ্মণের প্রাণ-পাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

নিজেদের অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শবদেহ স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি সংযোগের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বিয়োগ-বিধুরা রামমণি উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল। রামীর বিলাপে চণ্ডীদাস সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। উপস্থিত লোকজন সকলেই প্রাণভয়ে পলাইল, রামী তখন আনন্দে নাচিতে লাগিল। চণ্ডীদাস বলিলেন—"এ দেশে রব না সই! দূর দেশে যাব"। তিনি রামীর সঙ্গে কুটীরে আসিলেন, রাত্রি প্রভাতেই অন্যত্র যাইবেন স্থির করিলেন।

এদিকে বিশালাক্ষী দেবী গ্রামের নেতা বিজয় নারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, "অরে পিশাচ! তোরা আমার সেবক সেবিকাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া উৎপীড়ন করায় তাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। যদি মঙ্গল চাস্, সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রসন্ন কর্"। চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামবাসী সকলকে লইয়া চণ্ডীদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চণ্ডীদাস অমনি সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। চণ্ডীদাসের ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইল—সকলেই তাঁহার নিকট পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য রত্ন। তিনি প্রেমকে 'পিরীতি' বলিতেন।—প্রেমকে 'জগৎ' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। নিজের ইষ্টদেবকে কখনও গোয়ালিনী, কখনও বা নাপিতানী সাজাইয়া বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

চণ্ডীদাস যেমন উচ্চদরের সাধক ও কবি ছিলেন, তেমনি উচ্চদরের গায়কও ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। ১৩৯৯ শকে মহাত্মা চণ্ডীদাস বৃন্দাবন-ধামে দেহরক্ষা করেন। অদ্যাপি বৃন্দাবনে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। রামমণিও বৃন্দাবন ধামেই মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিল।

কবিরাজ গোবিন্দ দাস

চৈতন্য-দেবের সহচর চিরঞ্জীব সেন নামে কুমারনগর-নিবাসী জনৈক বৈদ্য কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই অবস্থান করেন। সুনন্দার গর্ভে চিরঞ্জীবের রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। গোবিন্দ দাস প্রথম বয়সে শক্তির উপাসক ছিলেন। পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। আচার্য্যের অনুরোধে গোবিন্দ গীতামৃত রচনা করেন। গীতামৃতের সুমধুর রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া আচার্য্য তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দান করেন। জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিতগণও গোবিন্দের গীতামৃত দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

গোবিন্দ দাস সঙ্গীত মাধব নামে একখানি অপূর্ব্ব নাটক রচনা করেন। উহাতে তিনি মাতামহ দামোদর সেনের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নরোত্তম বিলাসে দেখা যায়, গোবিন্দ দাসের পুত্র দিব্য সিংহও একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। অনেক পদাবলীতে গোবিন্দ দাসের ভণিতা দৃষ্টিগোচর হয়। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে একাধিক গোবিন্দ দাসের নামোল্লেখ আছে, মিথিলা অঞ্চলেও গোবিন্দ দাস নামে পদাবলী রচয়িতা একজন কবি

ছিলেন, সুতরাং সমস্ত পদাবলীই চিরঞ্জীবের পুত্র গোবিন্দ দাসের বলিয়া বোধ হয় না।

জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র ও আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে কবিরাজ গোবিন্দ দাসের একবার বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিবার অভিলাষ হয়। গোবিন্দ নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেন। গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ তখন বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। গোবিন্দ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

গোবিন্দ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে লইয়া মহা মহোৎসব করিয়াছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী

দয়ানন্দ সরস্বতী একজন কর্ম্মী মহাপুরুষ। গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশস্থ প্রসিদ্ধ মর্ভিনগরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক ব্রাহ্মণ-বংশে ইনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। আজ পর্য্যন্তও ইঁহার পিতার নাম জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন, শিবপূজা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। স্থানে স্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি স্বোপার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নামকরণ সময়ে ইনি স্বীয় পুত্র দয়ানন্দকে মূলশঙ্কর নামে অভিহিত করেন।

মেধাবী মূলশঙ্কর পঞ্চমবৎসর বয়সেই বেদ-সংহিতা ও ভাষ্যাদি মুখস্থ করিয়া জনসমাজে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিতেই ইঁহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মূলশঙ্কর বেদ-সংহিতায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেও ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। একদা শিবচতুর্দ্দশী সমাগত হইলে পিতা পুত্রকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন যে, "বাবা! আজ তোমাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। অতএব তুমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্করের মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবে।" মূলশঙ্কর পিতার

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিলেন। রাত্রি সমাগত হইলে তিনি পিতার সহিত শিবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত আসিয়া যথাবিধি পূজা সমাপন করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর; জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। মূলশঙ্কর পিতার নিকট বসিয়া আছেন। কতকগুলি মূষিক আসিয়া শঙ্করকে নিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিতেছে এবং তদীয় গাত্রোপরি অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, ধার্ম্মিক মূলশঙ্কর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তাত! ইনিই কি সেই কৈলাশ-নাথ ভূতভাবন ভবানীপতি মহাদেব?" পিতা বিস্মিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "কেন, তোমার এরূপ প্রশ্নের কারণ কি?" তখন মূলশঙ্কর অতি বিনীতভাবে পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, ইনি ত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, কিন্তু ইহার গাত্রোপরি এই দুষ্ট মূষিক-গুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে কেন? ইহার কারণ আমি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।" পুত্রের প্রশ্ন শুনিয়া পিতা বড়ই সমস্যায় পড়িলেন, সাধ্যানুসারে বুঝাইবার চেষ্টার ক্রটী করি-লেন না। মূলশঙ্কর কিন্তু কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, পরন্তু উপযুক্ত উত্তর না পাইয়া ব্রতভঙ্গ ভয়ে কুণ্ঠিত হইলেন না, তিনি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দৈবী বিচিত্রা গতি! ইহার অব্যবহিত পরেই মূলশঙ্করের একটী ভগিনী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। ভগিনী-বিয়োগে মূলশঙ্কর বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি

আপনাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিয়া স্থির করিলেন যে, সংসার মিথ্যা, সমস্তই মায়াময়। আজ হউক, দুদিন পরে হউক, সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হই-তেই হইবে। অতএব এখন সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি।

মূলশঙ্কর ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। পিতা পুত্রের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু যে হৃদয়ে বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্বলিত, সংসার বাসনা তথায় স্থান পাইবে কেন? মূলশঙ্করের হৃদয়ে সংসার বাসনা স্থান পাইল না, পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আর রাখে কে? মূল-শঙ্কর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যে স্থানে প্রসিদ্ধ যোগী লালা-ভকৃত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সিদ্ধপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার প্রকৃত তথ্য জানি-বার জন্য কিছুকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। পরে তাঁহাকে একজন প্রকৃত যোগী পুরুষ জানিতে পারিয়া মূলশঙ্কর যোগ-পরায়ণ লালা-ভকতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারই নিকটে দীক্ষিত হন। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল—দয়ানন্দ শুদ্ধ চৈতন্য। নামের সহিত মূলশঙ্করের বেশভূষাও পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি

গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। এই হইতেই মূলশঙ্কর জগতে দয়ানন্দ নামে পরিচিত হইলেন।

প্রতি বৎসরই পৌষমাসে এই সিদ্ধপুরে একটী মেলা বসিয়া থাকে। মেলা উপলক্ষে এস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। মহাত্মা দয়ানন্দ মেলায় আসিয়া সিদ্ধপুরুষদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। একদা দয়ানন্দ ভগবান নীলকণ্ঠ দেবের মন্দির মধ্যে সমাসীন হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে কয়েকজন দ্বারবান। দয়ানন্দকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং যুগপৎ হর্ষবিষাদে মগ্ন হইলেন। পরে কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া দয়ানন্দকে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

দয়ানন্দ প্রমাদ গণিলেন। জনকের তিরস্কারে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিচলিত হইলেন না। কিন্তু পিতা আদেশ করিতেছেন, "গৃহে ফিরিয়া যাও" ইহা মনে করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কি করেন, অগত্যা পিতার আদেশে সম্মতি জানাইয়া স্বীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে দয়ানন্দ আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতা মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। সকলেরই আনন্দ, দয়ানন্দের পিতা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, পুত্র কখন পলায়ন করে। অবশেষে তিনি কয়েকজন প্রহরিকে দয়ানন্দের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

দয়ানন্দ যারপর নাই চিন্তিত, ক্ষণ কালের জন্যও শান্তিলাভ

করিতে পারিতেছেন না। পারিবেনই বা কিরূপে? তিনি যে এখন আনন্দময় নিত্য সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত, অনিত্য সংসার বাসনা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? তিনি যে সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কাজেই সর্ব্বদা পলায়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

যাহার যেরূপ ভাবনা, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। একদা দয়ানন্দ বসিয়া আছেন এবং কিরূপে রক্ষকদিগকে ভুলাইয়া পলায়ন করিবেন ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ প্রহরিগণ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল। সুযোগ পাইয়া দয়ানন্দ আর কাল বিলম্ব করিলেন না, তখনই পলায়ন করিলেন। প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ভয়ে দয়ানন্দ দিবসে পথ চলেন না, বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া অনাহারে দিনমান অতিবাহিত করেন, রাত্রিকালে পথে চলিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। যখন আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিলেন, তখন দিবারাত্রি পথ চলিয়া আহম্মদাবাদ হইয়া বরদায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক চানদ কল্যাণীতে গমন করিলেন। তথায় তিনি জোয়ালানন্দ পুরী এবং শিবানন্দ গিরিনামক দুইজন প্রসিদ্ধ যোগীর নিকট যোগ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন করিয়া চানদের নিকটবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। দয়ানন্দ পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এখন অবসর বুঝিয়া স্বীয় উৎকণ্ঠা নিবারণ করি-

লেন্। তিনি পূর্ণানন্দের নিকটে গমন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই সময় হইতেই ইনি 'দয়ানন্দ সরস্বতী' নামে জন-সমাজে পরিচিত হইলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। সাধুসংসর্গ মানসে দয়ানন্দও তথায় আগমন করেন। অনন্তর কাশী, এলাহাবাদ, কাণপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মথুরাধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় ইঁহার বয়স ৩৪ বৎসরের অধিক হয় নাই। দয়ানন্দ মথুরাধামে আগমন করিয়া বিরজানন্দ স্বামী নামক জনৈক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই মহাপুরুষের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন ইনি কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন, তাহার ফলে ইঁহার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই মহাপুরুষ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন; গুরুমুখে শুনিয়া শুনিয়াই ইনি সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া শ্রুতি নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার বয়স ৮১ বৎ-সরের উপর ভিন্ন নীচ নয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দয়ানন্দ বিরজানন্দের নিকট অধ্যয়ন ও যোগশিক্ষা করেন। পরে দয়ানন্দ আগ্রায় আগমন করেন। দয়ানন্দ যখন বিরজানন্দের নিকট শিষ্য-ভাবে উপস্থিত হন, তখন বিরজানন্দ বলিয়াছিলেন—"বাবা! মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছ, কিন্তু হৃদয়ে উহার প্রভাব বিদ্যমান থাকিতে সনাতন আর্য্য গ্রন্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইবে না। অতএব ঐ সমস্ত একেবারে মুছিয়া ফেল এবং আমার নিকট পুনরায় পড়িতে আরম্ভ কর।

বেদে দয়ানন্দের অচল বিশ্বাস! বেদ ব্যতীত অপর কিছুতেই তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। ইনি মূর্ত্তি-পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, মূর্ত্তি-পূজার খণ্ডন করাই ইনি প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বারাণসী-ধামে তত্রত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার বিচারের দিন ধার্য্য হয়। দুর্গাবাড়ী দুর্গা-মন্দিরের সমীপবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে বিচার-সভার অধিবেশন। বিচার আরম্ভ হইল, ফলে দয়ানন্দ পরাজিত হইলেন।

১৮৭২ সালের ৩০এ ডিসেম্বর দয়ানন্দ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া নানাস্থানে নানারূপ বক্তৃতা করিয়া ফরাক্কাবাদে গমন করেন। অবশেষে ইনি ভারতের বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩০এ অক্টোবর আজমীর নগরে দেহরক্ষা করেন।

দয়ানন্দ "আর্য্যোদ্দেশ্য রত্নমালা" নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

নরহরি সরকার ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে যে নবস্রোত প্রবাহিত হয়, ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুরই তাহার আদিগুরু বা প্রথম প্রবর্ত্তক।

কাটোয়া সন্নিহিত বৈষ্ণবের মহাতীর্থ পুণ্যভূমি শ্রীখণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশে এই মহাপুরুষের জন্ম। বাঙ্গালায় বৈষ্ণব কবিদিগের আসন অতি উচ্চ। নরহরি সরকার এ সকলেরই পথ-প্রদর্শক। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নারায়ণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, কনিষ্ঠ নরহরি। নরহরি যে অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার ধ্যানটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর সহিত সরকার ঠাকুরের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। সরকার ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভু হইতে ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন। এজন্য অনেকে অনুমান করেন, ১৪০০ শকই ইঁহার জন্মাব্দ।

নারায়ণ পরম ভাগবত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ গৌড়ের রাজবৈদ্য, আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। সুতরাং নারায়ণ সস্ত্রীক নিরাপদে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। নরহরি তাদৃশ পিতা মাতার আদর্শে অতি শৈশবেই কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন। কোথাও নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বালক নরহরি সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া সেই স্থানেই বসিয়া থাকিতেন। মাতার কোলে বসিয়া যখন

বিশ্রাম করিতেন, তখনও তিনি মাতার নিকট কৃষ্ণলীলার গল্পই শুনিতেন; এইরূপে তাঁহার কোমল-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল।

তখন নবদ্বীপের বড় সম্মান। অতবড় পণ্ডিত সকল জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে এক অভিনব গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের ন্যায় পণ্ডিতের দেশ বাঙ্গালায় আর ছিল না। নবদ্বীপে আসিয়াই সকলকে অধ্যয়ন করিতে হইত। বিদেশস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীও নবদ্বীপে আসিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে পরিণামের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেন। অন্যথা তিনি জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির জ্ঞানের প্রবেশ-দ্বার নবদ্বীপ। নরহরি বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের অঙ্গ-সংস্থানাদি দর্শন করিয়াই জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। শুভদিনে শুভ-ক্ষণে নরহরি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

একদা সরকার ঠাকুরের সহিত গৌরাঙ্গ দেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়াই তিনি আত্মহারা হইলেন। গৌরাঙ্গও নরহরির অপূর্ব্ব জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ফলতঃ উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নরহরি গৌরাঙ্গকে প্রাণের দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। বালক নরহরিকে পাইয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই সুখসাগরে ভাসিল। ঘরে ঘরে মহোৎসব আরম্ভ হইল।

পাঠ সমাপ্তির পর নরহরি যথাসময়ে গৃহে ফিরিলেন। পিতা

মাতা আত্মীয় স্বজনের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক চৈতন্যের অপূর্ব্বলীলা ও বিরাট মহিমাদির বিচিত্র চিত্রগুলি স্বীয় কোমল-হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। গৌরপ্রেমে মত্ত নরহরি শ্রীখণ্ডে হাটে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নরহরির নামকীর্ত্তনে শ্রীখণ্ড এক অভিনব ভাব ধারণ করিল। মিলনাকুলা সতীর পতিসমাগমের ন্যায় তিনি চৈতন্যদেবের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভাবাবেশে একেবারে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজ পুলকিত ও বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। বৈষ্ণবগণের ধারণা হইল—ইনি সামান্য ভক্ত নহেন, রাধিকার সখী মধুমতী।

এই সময় নরহরিকে দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরির অবস্থা তখন—

"গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে, কুলশীল তার সব ভাসিয়া যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে"।

ইহাতে বৈষ্ণবগণ আর সন্দেহদোলায় আরোহণ করিলেন না। সকলেই বুঝিলেন,—নরহরি রাধার সখী মধুমতীই বটে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

একদিন ঠাকুর নিত্যানন্দ পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া সত্যপরীক্ষার্থ শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরির নিকটে উপস্থিত হন। নরহরি তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে প্রভু নিত্যানন্দ মধু পান করিতে চাহেন। নরহরি প্রভুকে একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন। উপ-

স্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই সেই পুষ্করিণীর জল পান করিলেন, জল মধুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দ আবেগের সহিত দৌড়িয়া গিয়া নরহরিকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ভক্তগণ নরহরির পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা হইতেই উক্ত পুষ্করিণী মধুপুকুর নামে বিখ্যাত হইল। শ্রীখণ্ডে অদ্যাপি উহা বিদ্যমান আছে।

ইহার পর দেশ বিদেশ হইতে অনেকেই আসিয়া নরহরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইবার নরহরির মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে চলিল। এতদিন যাহা অতি যত্নে পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা পাইয়া জীবন জনম সফল জ্ঞান করিয়াছেন, সেই চির-বাঞ্ছিত প্রেমামৃত বিলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রাণে আর ধৈর্য্য মানে না। তিনি একদিন সমস্ত শিষ্যগণের সমক্ষে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুইত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নি সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হ'লে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পূরাইবে প্রভু॥

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত ও যথেষ্ট সম্মানিত। এই প্রকার

কিম্বদন্তী আছে, ইনি চৈতন্যদেবের চামর ব্যজন করিতেন এবং গৌরাঙ্গের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত রঘুনন্দন খুল্লতাত নরহরিকে বঙ্গভাষায় গৌরলীলা প্রকাশের জন্য পদাবলী রচনা করিতে সাতিশয় উৎসাহিত করেন। সরকার ঠাকুরও সর্ব্বপ্রথমেই গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে এক অভিনব ভূষায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত ৪ খানি লীলাগ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত,' 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটল' এবং 'নামামৃত সমুদ্র' সাধকোচিত ভাষায় ও ভাবে পরিপূর্ণ। ভক্তপ্রবর নরহরি গৌরের মহিমা বঙ্গভাষায় অঙ্কিত করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরে গোবিন্দ দাস, লোচন দাস প্রভৃতি ভক্তগণ বঙ্গভাষায় গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেরই পথপ্রদর্শক ঠাকুর নরহরি।

চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া লীলাচলে প্রস্থান করিলে ঠাকুর নরহরি অত্যন্ত কাতর হইলেন। অনন্তর জাজি গ্রামবাসী প্রধান শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরামর্শে তিনিও লীলাচলে গমন করেন। গৌরাঙ্গ নরহরিকে পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এই হইতে প্রতিবৎসর রথের সময় পুরীধামে উভয়েই উভয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন।

চৈতন্য দেবের ইচ্ছানুসারে পুরুষোত্তমে একটী সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত হয়। উহা সপ্তদলে বিভক্ত। সরকার ঠাকুর উহার এক দলের নেতা হইলেন; সুতরাং গৌরাঙ্গ সন্দর্শনে অনেক সময়ই

বঞ্চিত হইতে হইত। গৌরাঙ্গ নরহরিকে মধ্যে মধ্যে শ্রীখণ্ডে পাঠাইয়া দিতেন। নরহরি গৌরাঙ্গের অদর্শনে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশেষে তিনি শ্রীখণ্ডের এক নির্জ্জন স্থানে একটী উপাসনামন্দির নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি (কাষ্ঠময়) স্থাপন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।

এই দেব-মন্দিরের সম্মুখে চান্দ্র কার্ত্তিক-দ্বাদশী তিথিতে সরকার ঠাকুর নরহরি সজ্ঞানে দেহ-রক্ষা করেন। প্রতিবৎসর ঐ দিনে এস্থানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। নরহরি-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি অদ্যাপি শ্রীখণ্ডে বিদ্যমান আছেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও শ্রীখণ্ডে বিরাজমান আছেন।

লোচন দাস

বর্দ্ধমানের দশক্রোশ উত্তরে কোগ্রাম নামে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ইহাই মহাত্মা লোচন দাসের জন্মভূমি। কমলাকর নামক জনৈক বৈদ্যের ঔরসে সর্ব্বানন্দী দেবীর গর্ভে গৌরভক্ত লোচন দাস পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লইয়াই যেন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোচনদাসের মাতুলালয় তাঁহার স্বগ্রামেই অবস্থিত। পিতামাতার একমাত্র সন্তান লোচন পিতামাতার স্নেহে এবং মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত ও মাতামহী অভয়া দেবীর সমধিক আদরে বিদ্যাশিক্ষার তত অবকাশ পান নাই, হাসি খেলার মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রভাত-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকর বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। সংসারে কোনরূপ অভাব অভিযোগ না থাকিলে সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদিগকে প্রায়ই উদাসীনতা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। সুতরাং পুত্রের শিক্ষা অপেক্ষা পৌত্রমুখ সন্দর্শন-লালসাই কমলাকরের পক্ষে প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। কমলাকর মহাকুলীন, অনতিকাল মধ্যেই পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। একাদশবর্ষীয় বালক লোচন মাতাপিতার একান্ত অনুরোধে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপিণী বধূকে পাইয়া লোচনের পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু বিবাহের পর বালিকা

বধূ যে কয়েক দিন গৃহলক্ষ্মী রূপে কমলাকরের গৃহ আলোকিত করিয়াছিল, ততদিন লোচনের মুখে কেহ আনন্দের রেখাটীও দেখিতে পাইল না। লোচন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শ্রীখণ্ডে অতি ধূমধামের সহিত রাসোৎসব সম্পন্ন হইত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বালক লোচন দাসও শ্রীখণ্ডে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। তথায় ভক্তপ্রবর নরহরির বিশ্ব-জাগরণ মন্ত্রে তাঁহার মোহচমক ভাঙ্গিল। লোচনের লোচনে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, তিনি আর দেশে ফিরিলেন না, নরহরির নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীখণ্ডেই বাস করিতে লাগিলেন। নরহরি গৌরভক্ত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত, পুত্র লোচন তাঁহারই শিষ্য হইয়াছে, শুনিয়া কমলাকর স্ত্রীর সহিত আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ নরহরির মধুর উপদেশে লোচ-নের লোচন প্রস্ফুটিত হইল, সংসারে আসক্তিমাত্র রহিল না; তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনের পথে অগ্রসর হইলেন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতা, প্রাণপ্রতিম প্রণয়িনী, সাধের জন্মভূমি, আত্মীয় স্বজন সমস্তই বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া, লোচন দাস গৌরাঙ্গপ্রেমে আত্মহারা হইলেন। নরহরি আপন চরিত্র আদর্শ রাখিয়া শিষ্যচরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন।

বালিকা বধূ এখন আর বালিকা নয়, ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করি-য়াছে, সে এখন পূর্ণযুবতী। পরিণয় রজনীর শুভদৃষ্টি ব্যতীত স্বামি-

সন্দর্শন আজ পর্য্যন্তও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। এত দীর্ঘকাল অতীত হইল, লোচন দাস তাহার সংবাদটীও লন নাই, যুবতী এখন আপনাকে প্রকৃতই অসহায় মনে করিল, জনকোলাহল তাঁহার পক্ষে বিষময় হইল, সে সর্ব্বদাই নীরবে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

পুত্রবধূর এতাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া বৃদ্ধ কমলাকর ও বৃদ্ধা সর্ব্বানন্দী দেবী বড়ই বিচলিত হইলেন। পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা নরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নরহরি লোচনকে অনেক বুঝাইয়া অবশেষে জোড় করিয়াই তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে সম্মত করিলেন। আমোদপুর কাকুট গ্রামে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী। লোচন বিবাহের পর এই প্রথম শ্বশুরালয়ে চলিলেন।

গ্রামে প্রবেশ করিতেই লোচন এক অনিত্য-সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। লোচন শ্বশুরবাটীর পথ অবগত নহেন, তিনি যুবতীকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অমুকের বাড়ী কোন পথে যাইব?" তরুণী পথিকের বদনপানে একবার মাত্র চাহিয়া অঙ্গুলী সঞ্চালন-পূর্ব্বক ইঙ্গিতে একটী সঙ্কীর্ণ-পথ দেখাইয়া দিল এবং নিজে অধোবদনে অন্যপথে চলিয়া গেল। লোচন শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিলেন।

বহুকাল পরে জ্যোৎস্না-পুলকিত বাসন্তী রাত্রিতে লোচন একটী নির্জ্জন কক্ষে স্বীয় প্রণয়িনীকে দেখিতে পাইলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল। কিন্তু হায়! একি? প্রণয়ের প্রথম আভাসেই বিধাতা

দাদ সাধিলেন! লোচন দেখিলেন, পথিমধ্যে পূর্ব্বদৃষ্টা যুবতীই তাঁহার পত্নী!—যাহাকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন। যুবতী যখন বুঝিল, সেই অপরিচিত পান্থই তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, তখন তাহার নয়ন হইতে অজস্র মুক্তাবিন্দু ঝরিতে লাগিল। যুবতী বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। লোচন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তরুণীর করুণ চাহনিতে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব, নিস্পন্দ। বহুকাল পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বাসনায়ই যেন চন্দ্রদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, রাত্রি প্রায় অবসান। এইবার তাহাদের কথা ফুটিল। স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া রমণী অনেক কথা কহিল। কথার আর শেষ হয় না, লোচনও অনেক কথা বলিলেন। অবশেষে রমণী ভোরের বেলায় বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে লোচনকে বলিল,—"আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জীবনে কখনও ভগবচ্চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নাই, শয়নে স্বপনে জাগরণে সকল সময়ই তোমাকে ভাবিয়াছি, তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তোমাকে স্পর্শ করিবার অধিকার আমার না থাকিলেও সেবা করিবার অধিকারে বঞ্চিত হই নাই, অতএব আমাকে এভাবে ফেলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, সঙ্গে লইয়া চল।" বস্তুতঃ তাহাই হইল, লোচন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পত্নীসহ দেশে ফিরিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর লোচন সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিয়া গ্রামের প্রান্তসীমায় একটী পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

পত্নীসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুবক যুবতী কখনও আত্মবিস্মৃত হন নাই, উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-প্রেমে উভয়েই আত্মহারা। যুবকের উপদেশে যুবতীর মোহ ভাঙ্গিল, সে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া জগতে আপন প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। কুটীরে বসিয়া লোচন যখন "চৈতন্য মঙ্গল" গান করিতেন, যুবতী পার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিত; কখনও বা মনের আবেগে স্বামীর সহিত গাহিয়া উঠিত। যুবতী ভাবাবেশে বিহ্বলা।

পত্নী যাহাতে সাধনার সহচরী,—আত্মার সঙ্গিনী হইতে পারে, লোচন সেই রূপেই তাহাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। যুবতীর ভাব দর্শনে লোচন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। আজ তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হইল,—দাম্পত্য-প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইল,—লোচনের আর আনন্দের সীমা নাই,—তিনি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী যুবতী পত্নীকে সাধনার সহচরী বলিয়াই মনে করিলেন।

পত্নীর প্রতি লোচনের অনুরাগ কখনও কম ছিল না, লোচন—সংযত, সতী রমণীও তাঁহারই অনুকরণে চিরাভ্যস্ত, তাই নবদম্পতী যুবক যুবতী হইলেও ধর্ম্মপথ হইতে একপদও বিচলিত হয়েন নাই। লোচন দাস বিরচিত "চৈতন্য মঙ্গল" নামক মহাকাব্যে তাঁহার পত্নীর প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লোচন দাস স্বীয় গুরু নরহরির অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষায় 'গৌরলীলা' প্রকাশ করেন।

লোচন দাস—ত্রিলোচন, লোচন ও লোচনানন্দ, এই তিন

নামেই পরিচিত। ইহার রচিত চৈতন্য মঙ্গলে চৈতন্য দেবের সমস্ত লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চৈতন্য মঙ্গল পাঁচালী-রূপে গীত হইয়া থাকে। চৈতন্য মঙ্গল—বৈষ্ণবের সাধনের ধন, ইহার ভাষা ভাব সমস্তই মধুময়। ইহা ব্যতীত "দুর্লভ সার" "রাগ-লহরী" "বস্তুতত্ত্ব-সার" "আনন্দ লতিকা" "প্রার্থনা" "শ্রীচৈতন্য-প্রেমবিলাস" এবং "দেহনিরূপণ" নামে সাতখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ ইনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

লোচন দাস ৬৬ বৎসর বয়সে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ পৌষ দেহরক্ষা করেন। কোগ্রামের কুনুই নদীর তীরে তাঁহার সমাধি স্থান। ভক্তগণ প্রতিদিন এই সমাধির পূজা করিয়া থাকেন। সমাধি স্থানটী এমন সুন্দর—সুসজ্জিত যে, দর্শনমাত্রেই মনপ্রাণ শীতল হয়, বৈরাগ্য আসিয়া স্বতঃই মানবের মন অধিকার করিয়া বসে।

লোচন যে সকল ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, তাহা "লোচনের ডাঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ। লোচনের তিরোভাব উপলক্ষে অজয় নদের তীরবর্ত্তী সেই প্রসিদ্ধ "লোচন ডাঙ্গায়" তিনদিন ব্যাপিয়া একটী মেলা বসে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী মেলায় আসিয়া যোগদান করেন। লোকে উহাকে "উজানীর মেলা" বলিয়া থাকে।

নিশ্চল দাস

বিখ্যাত দিল্লী-সহরের অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে কিহুডৌলী নামে যে গ্রাম আছে, উহাই মহাত্মা নিশ্চল দাসের জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম তারুজী দাস এবং মাতার নাম লছমী।

নিশ্চল দাস দাদুপন্থী। দাদুপন্থীগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসক। নিশ্চল দাস মহাত্মা তুলসী দাসের সমসাময়িক লোক, কিন্তু ইঁহার জন্মসময় বা বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই।

বাল্যকাল হইতেই মহাত্মা নিশ্চল দাস ভগবান রামচন্দ্রের পদে আত্মমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা নিশ্চ-লের মাতা তাঁহাকে মরিচ আনিবার নিমিত্ত কোনও দোকানে পাঠা-ইয়া দেন, পথিমধ্যে তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পান, সন্ন্যাসী নিশ্চলকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, এ বালক সামান্য নহে। তিনি তাঁহাকে নানারূপে ভুলাইয়া আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন। এদিকে পুত্রের অদর্শনে পিতামাতার আর দুঃখের সীমা রহিল না। অনেক অনুসন্ধানেও পুত্রের সংবাদ পর্য্যন্ত না পাওয়ায় তাঁহারা শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ৭।৮ দিনের পর দেখা গেল, নিশ্চল বিজন বনমধ্যে একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে রাম-নাম করিতেছে। তারুজী সংবাদ পাইয়াই তথায় গমন করেন এবং বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন।

এই গ্রামে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, নিশ্চল দাস তাঁহারই নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। যতই পড়িতে থাকেন, জ্ঞান-পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন,—"আত্মজ্ঞান লাভই জীবের সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়"।

নিশ্চল ত্রয়োদশ বর্ষে বিবাহ করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পতিপরায়ণা সাধ্বী জননীও স্বামী বিয়োগ-দুঃখ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না, অল্পদিন মধ্যেই সতী পতির সহিত মিলিত হইলেন। নিশ্চল ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বীয় প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিছুদিন কাশীধামে অবস্থান করিয়া জন্মভূমি কিহড়ৌলীতে আগমন পূর্ব্বক তথায় 'গুরুদ্বার' নামে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান আছে।

নিশ্চল দাস স্বীয় শিষ্য-মণ্ডলীকে 'আত্মতত্ত্ব' শিক্ষা দিবার নিমিত্ত "বিচার সঞ্চার" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর পুস্তক আর আছে কি না সন্দেহ।

নিশ্চল দাস কেবল যে ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা নহে। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কথকতা করিয়া জনসমাজে বেদান্তমত প্রচার করেন। তিনি "বৃত্তিপ্রভাকর" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি হিন্দিভাষায় "আত্মজ্ঞানবোধক" একখানি গ্রন্থ

রচনা করেন। কঠোপনিষদের একটী টীকাও ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

রাম সিংহ নামক জনৈক ধার্ম্মিক রাজা স্বীয় মহিষীর সহিত ইঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, রাজ্ঞীকে বেদান্তের মত বুঝাইবার নিমিত্তই বিচার সংঞ্চারের সৃষ্টি।

নিশ্চল দাস দ্বাদশ বর্ষ কাল একাসনে বসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। অবশেষে তিনি সম্বৎ ১৯২০ সালে দিল্লী সহরেই পরলোক গমন করেন।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী

দক্ষিণাবর্ত্তের অন্তর্গত কল্যাণী গ্রামে সঙ্গমলাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে যমুনা দেবীর গর্ভে মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গমলালের পৈতৃক বাসস্থান আর্য্যাবর্ত্তের রৌড়ীগ্রাম। কিন্তু বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি কল্যাণী গ্রামে সবসুখ-রাম নামে একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সঙ্গমলালকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বীয় ভগিনী যমুনা দেবীকে ইঁহার করে সমর্পণ করেন।

যমুনা দেবীর তৃতীয় গর্ভজাত সন্তান স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভজাত সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশুদ্ধানন্দের এক বৎসর বয়সে সঙ্গমলাল ইঁহার নামকরণ করেন। তাহার ফলে লোকে ইঁহাকে বংশীধর বলিয়া জানিত। বংশীধর বাল্যকালেই মৃগীরোগাক্রান্ত হন, এজন্য ইঁহার মাতাপিতা সদাই বিষণ্ণ ছিলেন।

ক্রমে বংশীধর চারি বৎসরে পদার্পণ করিলেন। একদা বালক বংশী "আমার বই কৈ?" বলিয়া মাতাকে অত্যন্ত ত্যক্ত করায় যমুনাদেবী তাঁহাকে একখানি পুস্তক আনিয়া দেন। বালক "ইহা আমার বই নয়" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে সবসুখ-রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তুমি বালক, বই দিয়া কি করিবে"?

বংশী বলিলেন, "বই পাইলেই আমার রোগ সারিবে। কিন্তু সে বই পর্ণকুটীরে আছে"। সবসুখ-রাম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পর্ণকুটীরে?" বংশী আর কিছু বলিলেন না।

কল্যাণীর ২১।২২ মাইল দূরে ঔরাৎ নামক গ্রামে কীর্ণানদীর সঙ্গম স্থান। ঐ নদীসঙ্গমে স্নান করিবার নিমিত্ত প্রতি চৈত্রমাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। সবসুখ-রাম পরিবার বর্গের সহিত স্নান উপলক্ষে তথায় আগমন করেন। বালক বংশী উহার নিকটস্থ একটী পর্ণকুটীর দেখাইয়া মাতুলকে বলেন যে, "আমার বই ঐ পর্ণকুটীরে আছে"। তখন সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তন্মধ্যস্থ যোগীকে অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিলেন যে "এই বালক কি বলিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনিলে কৃতার্থ হইব।" বালক বংশী কিছুকাল অনিমেষ নয়নে যোগীকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে বলিলেন, "এই কুটীর মধ্যে আমার বই আছে"। বালকের কথায় যোগী মহাপুরুষও বিস্মিত হইলেন। যোগীর আদেশে সবসুখ-রাম অনেক অনুসন্ধানের পর চালের বাতা হইতে একখানি অতি পুরাতন হস্তলিখিত তালপাতের পুঁথি প্রাপ্ত হইলেন। বংশী উহা দেখিয়াই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

এই ব্যাপারে যোগী বড়ই বিস্মিত হইলেন। সবসুখ রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! স্বর্গীয় গুরুদেব যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখন তিনি আমাকে ইহা অনুসন্ধান করিতে বলেন। কারণ ইহা পাইলেই তিনি উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে



বিশুদ্ধানন্দ স্বামী

পৃঃ—২৭৩

পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বহু অনুসন্ধানেও ইহা মিলিল না। গুরুদেব তখন জীবনে হতাশ হইয়া শেষ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই বালকের কার্য্যকলাপে বোধ হইতেছে, এই বালকই আমার গুরুদেব। ইঁহার জন্মান্তরীয় স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবেই বিদ্যমান আছে। ইনি কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।" বালক বংশীধরও বইখানি পাইয়াই রোগমুক্ত হইলেন। বংশীধরের বাড়ীর নিকটে ভট্টজী নামে একজন শিক্ষক বাস করিতেন, বালক উঁহার নিকট পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হন। অধ্যয়ন কালে ইনি একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। ইহা দেখিয়া ভট্টজী ইঁহাকে শ্রুতিধর বলিতেন।

বংশীধরের সাত বৎসর বয়স হইতে না হইতেই সঙ্গমলাল মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার স্ত্রীও অল্পদিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। ১৩ বৎসর বয়সে বংশী ফার্সী ও মারহাট্টি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে অশ্বারোহণ ও শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়া নবাবের একটী দুর্দ্দান্ত অশ্বের শাসনে নিযুক্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অশ্বের প্রকৃতি সংযত করিয়া দেন। ঘোড়াটী কয়েকদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় নবাব বংশীকেই উহার কারণ বিবেচনা করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন। কারাগারে থাকিয়াই ইনি নশ্বর সংসারে বীতশ্রদ্ধ হন। কারামুক্ত হইয়া মাতুলালয়ে আসিলেন বটে, কিন্তু একদা একখানি পত্রদ্বারা মাতুলকে সংসারের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে নিষেধ সূচক অনুরোধ করেন এবং গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিকক্ষেত্রে

আসিয়া ১৭ বৎসর বয়সে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক মহাদেবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। এই সময়ে তাঁহার কামনা পূর্ণ হয়। ইহার পরে তিনি বিঠুর, হরিদ্বার, কনখল, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া হৃষীকেশে আগমন করেন। তথায় গোবিন্দস্বামী নামক একজন যোগীর নিকটে প্রায় ১৫ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে রত থাকেন। পরে কাশীধামে আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে গোড়স্বামীর নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন ইঁহার নাম হয়—বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

গোড়স্বামী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। গুরুদেবের আদেশে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গুরুদেবের গদিতে বসেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে অক্ষুণ্ণভাবে গদির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের ন্যায় মীমাংসক পণ্ডিত তৎকালে আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। ফ্রান্স, জার্ম্মান প্রভৃতি হইতে বৈদেশিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বামীজীর মীমাংসা শ্রবণ করিবার মানসে উৎসুকচিত্তে স্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে আসিতেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে যোগাসনে বসিয়া জীবনব্রত উদ্‌যাপন করেন।

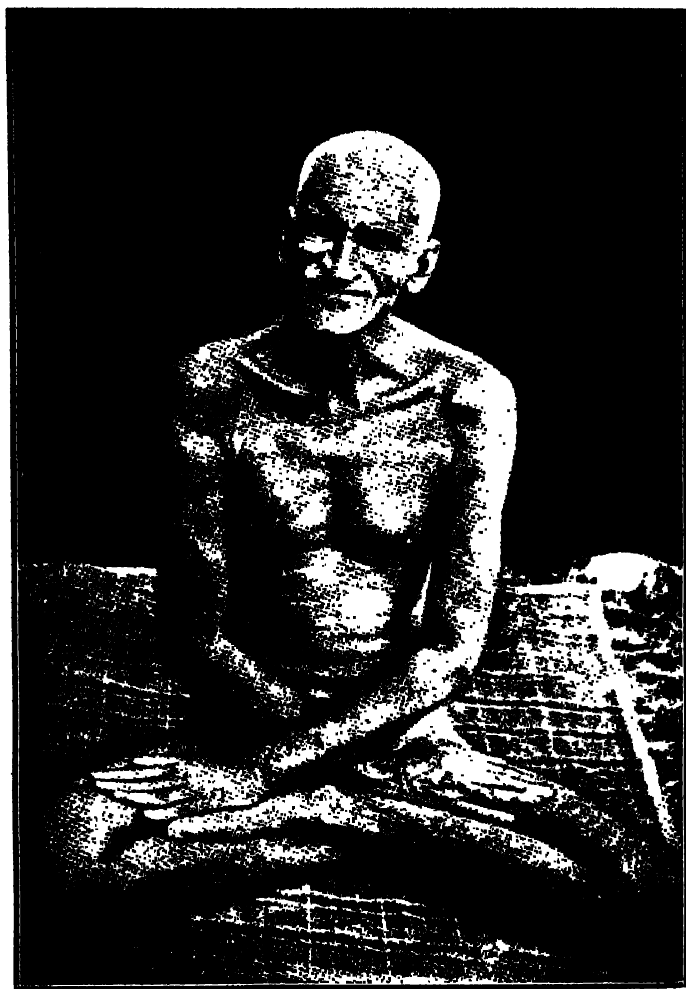
শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

কাণপুরে মৈথেলালপুর নামে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, উহাই মহাত্মা ভাস্করানন্দের জন্মভূমি। মিশ্রলাল মিশ্র নামক সামবেদীয় জনৈক কণোজ ব্রাহ্মণ ইঁহার পিতা। ১৮৯০ সম্বতের আশ্বিনী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নিশীথ সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মিশ্রলাল নামকরণ সময়ে পুত্রকে মতিরাম নামে অভিহিত করেন। গর্ভাষ্টমে মতিরামের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিয়া শাস্ত্রানুসারে মিশ্রলাল পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেন। মতিরাম স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প কালের মধ্যেই একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মতিরাম পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৭ বৎসর বয়সে মতিরামের একটী পুত্র জন্মে, কিন্তু পুত্রটী শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মতিরাম বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীতে আগমন করেন এবং তথায় উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অনন্তর গুজরাট মালব দেশে সাত বৎসর কাল থাকিয়া বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে পুনরায় উজ্জয়িনীতে আসিয়া পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীকে প্রাপ্ত হন। পূর্ণানন্দ মতিরামকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করেন। সপ্ত-

বিংশতি বৎসর বয়সে মতিরাম শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া কাশীধামে দুর্গা-বাড়ীর সন্নিহিত আনন্দবাগের আশ্রমে কিছুকাল বাস করেন। পরে কাণপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ গমন করেন। অনন্তর ভাস্করানন্দ কৌপীন মাত্র পরিধানপূর্ব্বক ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আনন্দবাগের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। বদরিকাশ্রমে যাইবার সময় পথিমধ্যে বেদান্তবিদ্ সাধু অনন্তরামের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব আলোচনায় পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ ১৯২৫ সম্বতে আনন্দবাগে আসিয়া কৌপীন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তত্রত্য জন সাধারণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গাত্রবস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, "যে বস্তু একবার ত্যাগ করা যায়, তাহা আর গ্রহণ করা উচিত নয়"। ভাস্করানন্দ নির্জ্জন স্থানে বাস করাই নিরাপদ মনে করিতেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে ইঁহার গুণগরিমা এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, ইনি যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় তীর্থযাত্রীর ন্যায় সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হইত। ইঁহার লক্ষাধিক শিষ্য ছিল। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত সভ্যগণও ইঁহাকে সবিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ তপঃপ্রভাবে অমানুষী ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও নিজে তাহা প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে



ভাস্করানন্দ সরস্বতী

পৃঃ—২৭৭

সময় সময় তাহার কিছু কিছু আপনা হইতেই প্রকাশ পাইত। কাশী-ধামে শীতলপ্রসাদ নামে স্বামীজীর একটী শিষ্য তাঁহার পুত্র দ্বিতল ছাদ হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিয়া গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু গঙ্গাজল হাতে লইয়া শিষ্যকে বলি-লেন, "বাবা! এই গঙ্গাজলটুকু তোমার পুত্রকে খাওয়াইয়া দিলেই সে পুনর্জ্জীবন করিবে, কোন চিন্তার কারণ নাই"। বস্তুতঃ শীতলপ্রসাদ পুত্রকে স্বামীজী প্রদত্ত গঙ্গাজলটুকু খাওয়াইবার পরই বালক পুনরায় জীবন লাভ করিল। এইরূপ অনেক ঘটনা আছে, যাহাতে স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতা সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে কোন ব্যক্তি ভাস্করানন্দের নিকট দীক্ষিত হইবার মানসে উপস্থিত হইয়া আপন মনোভাব প্রকাশ করেন। তাহাতে ভাস্করানন্দ বলেন, "তুমি তোমার মাতা পুত্র স্ত্রী প্রভৃ-তিকে না বলিয়া গোপনে আসিয়াছ। তাহারা তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর; অতএব এখনও তোমার দীক্ষিত হইবার সময় হয় নাই।" আগন্তুক ভাস্করানন্দের কথায় বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি। ভাস্করানন্দ বলিলেন—তাহারা তোমায় এ কার্য্যে অনুমতি দেয় নাই, তুমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তোমার সংসার ত্যাগের আরও একটী কারণ আছে, তাহা বলিলে তুমি লজ্জিত হইবে। অতএব ঘরে ফিরিয়া যাও।

আগন্তুক ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন—আমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি, আমাকে দীক্ষিত করুন। তখন ভাস্করানন্দ বলিলেন—ভাল, তোমার পার্শ্বের বাটীস্থ কোন রমণীর প্রতি তুমি আসক্ত হইয়াছিলে, তাহারই কথায় তোমার এই বৈরাগ্য সঞ্চার।

আগন্তুক ভাস্করানন্দের চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কিসে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহার প্রার্থনা করেন। ভাস্করানন্দ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অবশেষে বলিলেন, 'আচ্ছা তোমাকে দীক্ষিত করিব, কিন্তু এখনও কিছুকাল তোমাকে সংসারে থাকিতে হইবে।' আগন্তুক তাহাতে সম্মত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন এবং যোগ-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী ১৯৫৬ সম্বতে ৬৬ বৎসর বয়সে ২৫এ আষাঢ় রবিবার নিশীথ সময়ে সমাহিত অবস্থায় দেহরক্ষা করেন। কেহ কেহ বলেন—বিসূচিকা রোগই স্বামীজীর দেহাবসানের কারণ।

স্বামীজী যে রাত্রিতে দেহরক্ষা করেন, ঐ রাত্রিতে সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে আজই যে তাঁহার শেষ সমাধি, তাহা আশ্রমস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন। দেহ রক্ষার পর শিষ্যগণ তাহা গঙ্গা-জলে স্নান করাইয়া গঙ্গাতীরেই দাহ করেন। দাহান্তে অস্থি ও কিছু ভস্ম প্রস্তরপাত্রে স্থাপন করিয়া আনন্দবাগে সমাধি স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন—স্বামীজীর দেহ দাহ করা হয় নাই, ভাগীরথীতে স্নান করাইয়া প্রস্তর পাত্রে সংস্থাপন-পূর্ব্বক সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

গয়াপ্রসাদ নামে কাণপুরবাসী জনৈক ভক্ত শিষ্য স্বামীজীর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার প্রধান শিষ্য স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ "ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ সাধারণের কল্যাণ-কামনায় "স্বারাজ্য সিদ্ধিনায়ক" নামক প্রাচীন গ্রন্থের টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। উহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় জাজ্বল্যমান আছে।

হরিদাস সাধু

মহারাষ্ট্রের কোন ক্ষুদ্র-পল্লীতে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী হরিদাস সাধু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বাল্য জীবনের সবিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতে পারা যায় না। পনর কি যোল বৎসর বয়সে বাটীর নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে তৈলঙ্গদেশবাসী একজন কুবের-পন্থী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া হরিদাস তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা সন্ন্যাসী হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। হরিদাসও সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন।

হরিদাস পুষ্করে গিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া আপন গুরুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ফলে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনসমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত জেসল্মীর নামক স্থানে ভূগর্ভে আসন বন্ধন পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করেন। ঐ স্থানের পরিমাণ দীর্ঘে দুই হাত, দেড় হাত প্রস্থ এবং দুই হাত গভীর। হরিদাস সমাধিস্থ হইলে তাঁহার শিষ্যগণ সমাধি-গর্ত্তের উপর বৃহদাকার দুই খণ্ড প্রস্তর দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করেন। জেসল্মীরের রাজমন্ত্রী ঈশ্বরীলাল উহার উপরে মৃত্তিকার

লেপ এবং গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা গাঁথাইয়া দেন। এমন কি, সন্দেহ বশতঃ তিনি গৃহের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরিগণও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একমাস পরে তাঁহাকে উঠাইয়া দেখা গেল, সাধু পূর্ব্বের ন্যায়ই আছেন, কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এই অসাধারণ যোগবল দেখিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। হরিদাস ধ্যানে বসিলে একদা তাঁহাকে সিন্ধুকে পূরিয়া তের দিন যাবৎ গৃহ মধ্যে রাখা হইয়াছিল। অমৃতসরে মৃত্তিকার ভিতরে চারি মাস কাল থাকিয়া হরিদাস তথা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের নিকটে হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হন এবং তাঁহাকে লাহোরে আনয়ন করেন। সাধুকে পরীক্ষা করাই রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য, রাজা হরিদাসকে সমাধিস্থ হইতে বলায় হরিদাস সমাধি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজাদেশে তখনই তাঁহাকে একটী সিন্ধুকে বদ্ধ করা হইল। সিন্ধুকটী শীল মোহরাঙ্কিত করিয়া বার দ্বারীর মধ্যে মৃত্তিকাতে পূতিয়া রাখা হইল, পরে ঐ স্থানে যব বুনিয়া দেওয়া হইল। একমাস দশ দিন পরে বীজগুলি যখন গাছে পরিণত হইল, তখন সিন্ধুকটী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া হরিদাসকে তাহা হইতে বাহির করা হয়। ম্যাগ্‌গ্রেগর, মরে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, দেহে জীবন নাই। এই লোক যদি জীবিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যে লোক সৃষ্টি করিতে পারে, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। হরিদাসের শিষ্যগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন, কিছুকাল পরেই তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন হইল। ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই অবাক্। সাধুর অলৌকিকত্বে আর কাহারও অবিশ্বাস রহিল না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সাধুর সম্মানার্থ কয়েকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ভেক প্রভৃতি কতকগুলি জীব আছে, তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কত শত বৎসর কাটিয়া যায়, তথাপি তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কিন্তু উহাদিগকে যদি আলোতে আনা হয়, তাহা হইলে বায়ু সেবন করিয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। যোগীরাও যোগে বসিলে দীর্ঘকাল যাবৎ জড়বৎ পড়িয়া থাকিতে পারেন।

হরিদাস যোগবলে জলের উপর দিয়া হাটিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং শূন্যমার্গে অবস্থান বা বিচরণ করিতে পারিতেন।

হরিদাস সাধু কত বয়সে কোন স্থানে দেহত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে তাঁহার মৃত্যু অতি আশ্চর্য্য-জনক। একদিন হরিদাস নিজের মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী জানিতে পারিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন যে, আমি এইবার যে সমাধিস্থ হইব, ইহাই আমার শেষ সমাধি; শত-চেষ্টা করিলেও আর আমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। ইহা বলিয়া তিনি সমাহিত অবস্থায়ই দেহরক্ষা করিলেন।

মহাত্মা বামা ক্ষেপা

বীরভূমের অন্তর্গত তারাপুরের সন্নিকটে অটলা নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সর্ব্বানন্দের দুই পুত্র ও দুইটী কন্যা। পুত্র-দ্বয়ের নাম যথাক্রমে বামাচরণ ও রামচন্দ্র। এই বামাচরণই বামা ক্ষেপা নামে প্রসিদ্ধ।

বামাচরণ ১২৪১ সালে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতার নাম জানিবার উপায় নাই। বাল্যাবস্থায় ইনি অধি-কাংশ সময়ই খেলা করিয়া অতিবাহিত করিতেন। বালক বামা-চরণের খেলার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া খেলা করিতেন। কালী-পূজার সময় কালী, জগদ্ধাত্রী পূজার সময় জগদ্ধাত্রী, এইরূপ যখন যে পর্ব্ব উপস্থিত হইত, তখন তদনুসারে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সমবয়স্ক বালকগণের সহিত সমস্ত পূজাই নির্ব্বাহ করিতেন। পিতা সর্ব্বানন্দ পুত্রের এই সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। সুতরাং বামাচরণ বাল্য-জীবন সুখেই অতিবাহিত করিতেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালক বাল্যকাল অতিক্রম করিতে না করিতেই সর্ব্বানন্দ স্ত্রীপুত্রের মায়াপাশ ছেদন করিলেন, তিনি পরমপিতা পরমেশ্ব-রের পদে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

পিতার মৃত্যুতে বামাচরণ বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ রামচন্দ্র তখন নিতান্ত শিশু; কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এমন কোন সম্পত্তিও সর্ব্বানন্দ রাখিয়া যান নাই, সুতরাং বামাচরণ কিরূপে সংসার পালন করিবেন, এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তিনি কর্ত্তব্য পথ হইতে একপদও বিচলিত হন নাই। যখন সংসার ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হইতেন, তখন তিনি তারা দেবীর নিকটে ছুটিয়া আসিতেন এবং যুক্তকরে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেন, "মা তারা। তুমি ত সকলের কষ্ট নিবারণ করিয়া থাক, আমাদের কষ্ট কি দূর করিবে না" এই বলিয়া মাকে প্রণাম পূর্ব্বক বাড়ীতে আসিতেন। বাড়ীতে আসিয়া দেখিতেন, যে কোন ভাবেই হউক, তাঁহাদের সে দিনের জন্য এক প্রকার অন্ন-সংস্থান হইয়াছে।

দুই বৎসর কাল এই ভাবেই কাটিয়া গেল। বামাচরণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিত। একদিন বামাচরণের মাতা তাঁহাকে বলিলেন, "বামা! এখন ত তুই ছোট নয়, বিবাহের সময় হ'য়ে এল, পাগ্‌লামিটা ছাড়্, কায কর্ম্মের অনুসন্ধান কর্, আর কতকাল এ ভাবে থাক্‌বি"।

মাতার এই কথাই বামাচরণের প্রধান উপদেশ বা মূল মন্ত্র হইল। তিনি মনে করিলেন—মা আমাকে কায করিতে বলিলেন, আমি বৃথাকাজে সময় নষ্ট না করিয়া প্রকৃত কাযই করিব। এইরূপ স্থির করিয়া একদিন প্রাতঃকালে মাকে বলিলেন, "মা!

তবে আমি কায করিতে যাই"। জননী পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বামা! তুই আমার পাগল ছেলে, লেখা পড়া কিছুই শিখিস্ নাই, তুই আবার কি কায কর্‌বি! তোকে কোথাও যাইতে হইবে না, ঘরে থাক্, চাষ কর্, তাহাতেই আমাদের এক-রূপে দিন কাটিয়া যাইবে। না হয়, গোমস্তার নিকটে একটু লিখিতে শিক্ষা কর্, পরে যা হয় করিস্"। তিনি ভাবেন নাই যে, তাঁহার এক কথায় বামা পাগ্‌লা সুশীল সুবোধ হইবে, তাঁহার মতিগতি ফিরিবে।

বামাচরণ ভাবনায় আকুল! জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বামা! ভাবিস্ কি?" বামাচরণ বলিলেন, "কেন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কোথাও ঠাকুর পূজা করিব; তাহাতে যাহা পাইব, তদ্দ্বারা কোন রূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিব"। মাতা পুত্রকে স্থানান্তরে যাইতে দিতে চাহেন না, পুত্রও কিছুতেই বাড়ীতে থাকিবেন না। অনেক কথাবার্ত্তার পরে স্থির হইল,—বামাচরণ মলুটীতে যাইয়া কাহারও বাটীতে দেবদেবী-পূজায় নিযুক্ত হইবেন।

বামাচরণ যখন পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তিনি মলুটীতে যাইয়া কোন দেবালয়ের পুষ্পচয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি তথাকার পূজকের ভক্তি বিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া একদিন প্রভুকে বলিলেন "মহাশয়! আমি ভক্তি-হীন পূজার আয়োজন করিতে প্রস্তুত নহি, আপনি আমাকে বিদায় দিন"। এইরূপে মলুটীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল হরিষাড়া গ্রামে ভগিনীর বাটীতে অবস্থান করেন। তথা হইতে বাহির হইয়া কয়েক মাস নানাস্থান পর্য্যটন

পূর্ব্বক অবশেষে তারাপুরে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। বামাচরণ তারাপুরে আসিলেন।

তারাপীঠে তখন মোক্ষদানন্দ নামে একজন সাধু প্রধান কৌলিকের পদে সমাসীন। তিনি বামাচরণের কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইলেন। অল্পকাল পরেই মোক্ষদানন্দ পরলোকে গমন করেন, তখন বামাচরণই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসন খানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বামাচরণ এখন নিশ্চিন্ত, তারাদেবীর উপাসনাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, তিনি সর্ব্বদা 'তারা তারা' বলিয়া চীৎকার করিতেন। বামাচরণ প্রকৃতই তারাভক্ত। তারা তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। যাহার বলে বামাচরণ অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করিতেন।

হঠাৎ একদিন বামাচরণের মাতা পরলোকে গমন করিলেন। দেশের নিয়মানুসারে শবদেহ তারাপুরে দাহ করিবার নিমিত্ত নদীতীরে আনীত হইল। তারাপুর দ্বারকা নদীর অপর পারে। কিন্তু প্রবল ঝড়, ভয়ানক তরঙ্গ, নদী পার হয়, কার সাধ্য! সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বামাচরণ কিছুই জানেন না, তিনি তখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন। তিনি হরিধ্বনি শুনিয়া ও আত্মীয় স্বজন সকলকে দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন এবং 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অত বড় যোগীকেও মাতৃশোকে ব্যাকুল করিল। ধন্য মাতৃশোক!

বামাচরণ আর কালবিলম্ব করিলেন না। আপনাকে একটু

আশ্বস্ত করিয়াই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। দর্শকগণ সকলেই স্তম্ভিত, এইবার বামাপাগ্‌লা মরিল! দেখিতে দেখিতে বামাচরণ অপর পারে উপস্থিত হইলেন। শবদেহের নিকটে যাইয়া বলিলেন "তারা মা, আমার মা কি তোর নিকটে স্থান পাইবেন না"। এই বলিয়াই তিনি শবদেহ লইয়া তখনই খরস্রোতে আপনার দেহতরি ভাসাইয়া দিলেন। নদীর উভয়তীরস্থ অসংখ্য লোক এই ব্যাপার দেখিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

মাতৃভক্ত মহাপুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তারাভক্ত বামার নিকট অসম্ভবও সম্ভব হইল, তিনি মাতৃদেহ তারাপুরে আনিয়া মহাসমারোহে সৎকার করিলেন। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা বামাচরণ সেদিন তারানাম বলিতে বলিতে হাটিয়াই নদী পার হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, ধন্য পুত্র! ধন্যা গর্ভধারিণী—মাতা।

বামাচরণের মাতৃশ্রাদ্ধ দিবসেও অবিরত মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছিল। কোনরূপে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের উপায় কি? প্রাঙ্গণ ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগকে বসিতে দিবার স্থান নাই। ব্রাহ্মণগণ আসিয়া সমবেত হইলেন, তাঁহারা দাঁড়ান কোথায়?

বামাচরণ বড়ই বিপন্ন হইলেন। আকাশের ভাব দেখিয়া হতাশ প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তারা মা! তুই কি পাষাণ বাপের মেয়ে ব'লে নিজেও পাষাণী হইয়াছিস্! আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবি না!" দেখিতে দেখিতে আকাশ

পরিষ্কার হইল। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ দান করিয়া সলিলসিক্ত প্রাঙ্গণভূমি মুহূর্ত্তমধ্যে ধূলায় ধূসরিত করিলেন। সমাগত জনগণ অতীব বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন নিরাপদে সম্পাদিত হইল।

ক্রিয়াকাণ্ড সমাপ্ত হইলেই বামাচরণ তারাপীঠে আসিয়া পঞ্চ-মুণ্ডী আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তারা নাম মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত সাধু না হইলে এই আসনে কেহ বসিতে পারে না, বসিলেও ভয় পাইয়া পলায়ন করে; ইহার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

একদা বিষ্ণুপুর-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকুমার বামাচরণের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তারাপীঠে উপস্থিত হইলেন। বামাচরণকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। বামা-চরণ লোক-সংসর্গ ভাল বাসিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"এখানে কেন? আমাদ্বারা তোমার কোন কার্য্য হইবে না"। ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি তথায় থাকিলেন। কয়েক দিন পরে বামাচরণ ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ সুযোগ বুঝিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেব যে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক যোগসাধনা করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চমুণ্ডী আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর, ব্রাহ্মণ দেখেন—বামাচরণ অসংখ্য ভূতপ্রেতের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন এবং নানা-প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণের সাধনা কোথায় চলিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, যোগাসনে উপবেশন

করা অসম্ভব হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাইল। দেখিলেন—বামাচরণ পূর্ব্বের ন্যায় সম্মুখেই উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণকুমার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বামাচরণ বলিলেন "কি বাবা, ভয় পাইয়াছ?" পরদিন প্রত্যূষেই ব্রাহ্মণ নিজের প্রাণটা লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। যাহা হউক, স্থানটীর দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর, দেখিবামাত্রই দর্শকের চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। পূর্ব্বে রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ ও মোক্ষদানন্দ এই আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। বামাচরণ ভিন্ন এ আসনে বসিবার উপযুক্ত লোক তৎকালে আর ছিল না।

বামাচরণ বীর কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি মায়ের অনুগ্রহে অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে মদে মত্ত করিবার জন্য তিন দিন অবিরত মদ্য পান করান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারায় পরিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বামাচরণ কিছুদিন অর্থ সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে কয়েকখানি অলঙ্কার দান করেন। "অস্থিমালাই আমার অলঙ্কার, ইহার প্রয়োজন নাই" বলিয়া বামাচরণ অলঙ্কারগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক ঘটনা বামাচরণের জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল।

একদা হরিদ্বারে জনৈক সন্ন্যাসী একটী লোককে দেখিয়াই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! আজ আমায় দেখিয়া কি নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ

করিলেন ?" সন্ন্যাসী বলিলেন 'বৎস, বলিব কি, মহাবিপদ' ? আগন্তুক বলিলেন, "বাবা, কি বিপদ" ? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "বাবা! এক সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে সর্পে দংশন করিবে।" আগন্তুক ভদ্র লোকটী শুনিয়াই অস্থির হইলেন। বলিলেন "ঠাকুর, উপায় কি ?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! আমাদ্বারা কিছু হইবার নহে। কাশী-ধামে মণিকর্ণিকা-ঘাটে একজন সাধু সস্ত্রীক বাস করেন, তিনি তোমার উপায় বিধান করিতে পারেন। অতএব তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর।"

ভদ্রলোকটী তখনই কাশীধাম যাত্রা করিলেন। মণিকর্ণিকাঘাটে আসিয়া সাধুর সন্দর্শন পাইলেন। সাধু আগন্তুককে দেখিবামাত্রই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন "বৎস? আমি সমস্তই অবগত আছি, তুমি আহার কর, পরে—তোমায় সমস্ত বলিতেছি।"

সাধু আগন্তুককে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া বলিলেন, "বৎস। তুমি যে জন্য আসিয়াছ, তাহা আমাদ্বারা সাধন হইবে না, তুমি তারাপীঠে গমন কর। তথায় বামা ক্ষেপা নামে যে সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, তিনিই তোমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন"। আগন্তুক কি করেন, কাশীধাম হইতে তারাপীঠে আসিলেন। যে দিন তারাপীঠে আসিলেন, সেই দিনই, সেই ভীষণ সপ্তম দিন; তিনি বামা ক্ষেপার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বামা ক্ষেপা তখনও ধ্যানে মগ্ন। বহুকাল পরে সাধু আগন্তুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে? তোর পশ্চাতেই বা কে?" আগন্তুক ভদ্রলোকটী পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়াই হতজ্ঞান

হইলেন ; দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে আসিতেছে। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া বামা ক্ষেপার চরণতলে লুটিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—বাবা রক্ষা করুন, বাবা রক্ষা করুন। এই ব্যাপার দেখিয়া সর্পও আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভীত হইয়াই যেন পলায়ন করিল।

ইহার পরে বামাচরণ আগন্তুক লোকটীকে বলিলেন "বৎস! অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তোমার সর্পাঘাত অনিবার্য্য। তুমি এই গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া তারা মাকে ডাকিতে থাক। গণ্ডীর বাহিরে যাইও না।" ভদ্রলোকটী তাহাই করিলেন। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন ভদ্রলোকটীকে সর্পে দংশন করিল, তাঁহার হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিল। তিনি তদবস্থায়ও মায়ের নাম করিতে ভুলিলেন না, ক্রমে বিষের জ্বালায় অজ্ঞান হইলেন। তখন দেখেন—বামাচরণ একটী স্ত্রীলোকের আঁচল ধরিয়া টানিতেছেন আর বলিতে-ছেন—মা, ইহাকে বাঁচাইয়া দাও। স্ত্রীলোকটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেও বামাচরণ তাঁহাকে ছাড়িতেছেন না। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটীর জ্ঞান হইল, তিনি নিরাময় হইলেন। এ স্ত্রীলোকটী কে? মাতা তারা দেবী ভিন্ন আর কি বলিব। তিনিই পুত্র বামা ক্ষেপার অনুরোধে ভদ্রলোকটীর প্রাণ দান করিলেন। *

বামা ক্ষেপা বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভক্ত যক্ষ্মাকাসে পীড়িত, বহু চিকিৎসায়ও কোন ফল না পাইয়া বামাচরণের শরণাপন্ন হন, বামাচরণ ললিতের

পৃষ্ঠদেশে তিনটী কিল মারিয়া বলিলেন—যা বেটা তুই দূর হ। বস্তুতঃ সেই হইতেই ললিত ব্যাধিমুক্ত হইলেন।

বামাচরণের নন্দানামে একটী সেবা-দাস ছিল। নন্দা কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত। সেবকের কষ্ট দেখিয়া বামাচরণ তাঁহাকে একমুষ্টি শ্মশানের ছাই দিলেন। নন্দা সেই ছাই মাখিয়াই আরোগ্য লাভ করিল।

কর্ম্মবীর বামাচরণ কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ অনেক কার্য্য সমাধা করিয়া ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ ৭৭ বৎসর বয়সে সমাধি অবস্থায়ই ইহ ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

বামাচরণের অভাবে তারাপীঠের এখন আর সে শোভা নাই। এখন আর দিগন্তকম্পী 'তারা তারা' শব্দে বীরভূমের মহাশ্মশান প্রকম্পিত হয় না। আর তাঁহার সুমধুর তারা নামে জনপ্রাণীর কর্ণ-কুহর পবিত্র হইবে না। বামা ক্ষেপা আর ইহ সংসারে নাই, তিনি অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

সংসারের ক্রিয়া-কলাপ শেষ হইয়া আসিয়াছে, শেষের দিন নিকটবর্ত্তী; ইহা বামাচরণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর দিন পূর্ব্বাহ্নে তত্রত্য পাণ্ডা আশুতোষকে এবং অবিনাশচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকটী ভক্তকে বলিয়াছিলেন "ওরে, তোরা আমায় শিমুলতলায় লইয়া যাইস্"। তাঁহারা ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন না অথবা বামাচরণ ক্ষেপা বলিয়াই তাঁহার বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণে মনোযোগী হইলেন না। বামাচরণ এই কথা বলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং মাতৃপদে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিলেন। এই সমাধিই তাঁহার শেষ সমাধি। পরদিন

প্রাতঃকালে সকলে দেখিলেন—বামাচরণ যোগাসনে সমাসীন—কিন্তু তাঁহার দেহে জীবনী-শক্তি নাই, তিনি সমাধি অবস্থায়ই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে শিমুল তলায় নিয়া সেই পঞ্চমুণ্ডী আসনের পূর্ব্বভাগেই সমাধিস্থ করিলেন। সমাধি স্থানে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বামাচরণ কর্ম্মী—বামাচরণ যোগী—বামাচরণ মুক্ত পুরুষ। তাঁহার যশোরাশি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত। তাঁহার স্থূল শরীর বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার যশঃশরীর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, উহা আকল্পান্ত স্থায়ী। আমরা এই মুক্ত মাহপুরুষের উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করি।

মহাত্মা পওহারী বাবা

জোনপুরের অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব বাস করিতেন। অযোধ্যানাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর লছমীনারায়ণ যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী কুর্থাগ্রামে পুণ্যস্রোতা ভাগীরথীর তীরে বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অযোধ্যানাথ মধ্যে মধ্যে গিয়া ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিতেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানাথের একটী পুত্র জন্মে। লছমীনারায়ণ সংবাদ পাইয়া নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিবার জন্য একবার বাটীতে আসেন এবং বালককে সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। গাজীপুরে যাইবার সময় ভ্রাতাকে বলিয়া যান যে, নামকরণ সময়ে ইহার নাম 'রামভজন' রাখিও।

অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠের আদেশ প্রতিপালন করিলেন।—যথাসময়ে পুত্রকে রামভজন নামে আখ্যাত করিলেন। রামভজন তিন বৎসর বয়সে কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ইহার ফলে তিনি দক্ষিণ চক্ষুটী হারাইলেন। পিতা মাতা আদর করিয়া তাঁহাকে শুক্রাচার্য্য বলিয়া ডাকিতেন। যথাকালে অযোধ্যানাথ

পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন। অযোধ্যানাথের তিন পুত্র। গঙ্গারাম, রামভজন ও বলরাম। রামভজনের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন লছ্‌মী নারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত। সংবাদ পাইয়া অযোধ্যানাথ অগ্রজকে দেখিতে আসিলেন। রোগভোগে লছ্‌মী নারায়ণ দুইটী চক্ষু হারাইয়া কুটীর মধ্যে পড়িয়া আছেন। অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠকে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। জ্যেষ্ঠকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। অবশেষে অগ্রজের শুশ্রূষার জন্য পুত্র রামভজনকে তথায় রাখিয়া গেলেন। রামভজন পিতৃব্যের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

কুর্খা গ্রামে বহুপণ্ডিতের বাস। রামভজন অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতের সেবাশুশ্রূষা করেন এবং অবসর মতে ঐ সকল পণ্ডিতদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ক্রমে তিনি বেদান্ত দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। লছমী নারায়ণ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরে গমন করেন। রামভজন পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে বারাণসী ধামে আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা আর তাঁহাকে সংসারে আনিতে পারিলেন না, তিনি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। রামভজন এই হইতে 'আমি' শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে 'দাস' পুরুষ মাত্রকেই 'বাবা' এবং স্ত্রীলোক-দিগকে 'মাইজী' বলিয়া ডাকিতেন। প্রত্যুষে স্নান সমাপনান্তে

নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া রামভজন যখন স্তোত্র পাঠ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন, দেবগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

ক্রমে রামভজন অন্নাহার পরিত্যাগ করিলেন। সামান্য দুগ্ধ কিম্বা বিল্বপত্র কি অশ্বত্থ-পত্রের রস পান করিয়াই দিন যাপন করিতেন। এই সকল ঘটনায় লোকে তাঁহাকে "পরম আহারী বাবা" বলিত। এই নামই ক্রমে লোকরসনায় "পওহারী বাবা" নামে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, তিনি পানাহার কিছুই করিতেন না অথবা সামান্য পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এই জন্য তিনি পবন আহারী কিম্বা পয় আহারী শব্দের অপভ্রংশে "পওহারী বাবা" বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতেন।

জনৈক ভক্ত সাধুর থাকিবার জন্য একটী উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পওহারী বাবা ঐ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা ধ্যান-মগ্ন থাকিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তিন দিন মাত্র গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। ইহার পর বহুকাল যাবৎ তিনি আর দ্বার খোলেন নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। পরে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, উহাতে ভারতের সমস্ত তীর্থের সন্ন্যাসী-গণ নিমন্ত্রিত হইয়া কার্য্যে যোগদান করেন। পওহারী বাবা সমাগত সাধুদিগকে ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে উপবেশন করেন, তিনি আর গৃহদ্বার খোলেন নাই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখে যোগগৃহের দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। দর্শকগণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন,—পওহারী বাবা ঘৃতাক্ত শরীরে হোমকুণ্ডের সম্মুখে যোগাসনে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইল,—অগ্নিদেব সহস্রশিখা বিস্তার পূর্ব্বক সেই পবিত্র দেহ গ্রহণ করিলেন,—অল্পকাল মধ্যেই নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইল,—সব ফুরাইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণ একত্রিত হইয়া পওহারী বাবার ভস্মাবশিষ্ট পবিত্র অস্থি সযত্নে আনয়ন পূর্ব্বক পূতসলিলা ভাগীরথী-বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন পওহারী বাবাকে সংসারে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে,—আমি ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া সংসারে নাককাটা সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করিতে চাই না।

মহাত্মা পওহারী বাবা যে স্থানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাঁহার নির্ব্বাণ স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ তথায় একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উস্থুৎপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের জন্মভূমি। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী। নিবাস শান্তিপুর। আনন্দকিশোরের ভ্রাতা গোপীনাথ গোস্বামী অপুত্রক বলিয়া বিজয়কৃষ্ণকে দত্তকরূপে গোপীনাথের করে সমর্পণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া কাব্য উপাধি-শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। পরে মেডিকেল কলেজে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই অতিশয় ধর্ম্ম-পিপাসু ছিলেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা পাইলে আর তথা হইতে নড়িতেন না, একমনে তাহাই শুনিতেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ ছিল না, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পরিপোষক। ইঁহাদিগের সমাজ-মন্দির—"আদি ব্রাহ্ম-সমাজ" নামে অভিহিত। ব্রাহ্ম-সমাজে বেদ ও উপনিষদাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত; অনেকেই উহা শ্রবণ করিতে তথায় আসিতেন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণও ঐ সকল শুনি-



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পৃঃ—২৯৯

বার নিমিত্ত নিয়মিতরূপে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার কলেজের পাঠ শেষ হইল, তিনি ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দীন-দুঃখীদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাই বিজয়কৃষ্ণের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বতন্ত্র আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্ম পরিবার-বর্গের থাকিবার জন্য তিনি ভারত-আশ্রম স্থাপিত করেন। কেশবচন্দ্র নূতনভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন, ইহা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা ছাড়িতে বাধ্য হইলেন, পরিবার বর্গের সহিত কলিকাতা আসিয়া ভারত-আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কেবল বিজয়কৃষ্ণ কেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া অনেকেই আসিয়া কেশবচন্দ্রের নবধর্ম্মে যোগ-দান করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে লোক আর ধরে না, তিনি নির্জ্জনে থাকিবার জন্য বেলঘরিয়ার নিকটস্থ একটী উদ্যানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের নাম হইল—কেশব-কানন। কেশব-কানন অচিরকাল-মধ্যেই ব্রাহ্ম নর-নারীতে পূর্ণ হইল। ব্রাহ্ম নর-নারীগণ কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিত। এই নব-ধর্ম্মের প্রচার হওয়ায় ব্রাহ্ম-সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইল;—আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ। কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ নামে খ্যাত হইল। এই ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রথম উপাসনার দিবস অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নব-ধর্ম্মে

দীক্ষিত হন, আমাদের বিজয়কৃষ্ণও এই দিনেই উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজার সহিত কেশব সেনের কন্যার বিবাহ হয়। ইহাতে ব্রাহ্ম দলের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়, ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কেশব সেনের দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং বিরোধিদল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি এই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা পরিভ্রমণ কালে বারদীতে জনৈক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মহাপুরুষের অমানুষী শক্তি পরিদর্শন করিয়া গোস্বামী মহাশয় একেবারে স্তম্ভিত হন এবং কিছুকাল ইঁহার সংসর্গে অবস্থান করেন। মহাপুরুষের সন্দর্শন লাভের পর হইতেই বিজয়কৃষ্ণের মতিগতির পরিবর্ত্তন হয়। তিনি আপন আশ্রমের বহি-র্ভাগস্থ আম্রবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দিবানিশি হরিনাম মহামন্ত্র জপ ও নাম সংকীর্ত্তনে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। পরে হিন্দুদিগের অনেক তীর্থ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইঁহার ভাবানুরাগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিল।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়াই

জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহাদের মায়ায় বশীভূত হয়েন নাই। ইঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন। অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সতী সাধ্বীর অভাবেও ইনি অণুমাত্র বিচলিত হন নাই, স্থির চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতা হ্যারিসন্ রোডস্থ ৪৫ নং সংখ্যক ভবনে বাস করিতেন, তখন দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথা প্রভৃতি বহু লোককে অকাতরে অন্ন দান করিতেন। একদা বরিশালবাসী জনৈক বন্ধু ইঁহাকে এক খানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র দান করেন, ইনি তাহা লইয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে একটী লোককে শীতে কষ্ট পাইতে দেখিয়া ঐ শীতবস্ত্র খানি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দান করিলেন। ফলতঃ বিজয়-কৃষ্ণের ন্যায় পরদুঃখে কাতর লোক অনেক কম দেখা যায়।

বিজয়কৃষ্ণ যখন শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন, তখন বলিতেন, দেখ,—সৎসংসর্গই ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ।

দেহ ধারণ করিলে কাম ক্রোধাদি সময়ে সময়ে উদয় হয় বটে, কিন্তু উহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিবে। দমনের চেষ্টা না করিয়া উহাতে যোগদান করিলেই পাপ জন্মে।

ভগবানের নামই ভবরোগের ঔষধ। ভাল না লাগিলেও নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলেই ক্রমশঃ উহাতে রুচি জন্মিবে।

যাহারা সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, তাহারা দানের পাত্র নহে। বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকার প্রভৃতি জনিত যে দান, তাহাও দান নহে

প্রকৃত দাতা দানের পাত্র দেখিলেই দানের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন।—দান করিতে পারিলেই অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

এইরূপ অনেক উপদেশ বাক্য আছে। সমস্ত লিখিতে হইলে সুবৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইতে বিরত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

১৩০৪ সালের ফাল্গুনমাসে দোলপূর্ণিমার দিবসে বিজয়কৃষ্ণ পুরুষোত্তমে উপস্থিত হন। দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৩০৬ সালের ২২এ জৈষ্ঠ রাত্রি নয়টা কুড়ি মিনিটের সময় ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। পুরুষোত্তম প্রাপ্তির পর ইঁহার দেহ নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরদিকে যে উদ্যান আছে, তাহাতেই সমাধিস্থ করা হয়। উহা অদ্যাপি লোক-লোচনের বহির্ভূত হয় নাই।

মৌনী বাবা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত আবুদিয়া নামক গ্রামে রামচন্দ্র ঘোষ নামে একজন হরিভক্ত পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন। রামচন্দ্রের দুই পুত্র, প্যারীলাল ও হীরালাল। সাংসারিক অবস্থা তত ভাল না থাকায় রামচন্দ্র কর্ম্মস্থান পাবনায় গিয়া বাস করেন। পুত্র প্যারীলাল ও হীরালাল তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতে থাকে।

প্যারীলাল পরম ভাগবত, ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগী এবং তাঁহার জীবন অতি পবিত্র; ইহা দেখিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক শিক্ষক প্যারীলালকে অনেক সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন।

ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ সকলও ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এমন সময়ে ইহাদের পিতা মাতা পরলোকে গমন করেন। পিতামাতা পরলোকে গমন করিলে, দুই ভাই প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; সুতরাং হিন্দুসমাজ আর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না। অর্থাভাব বশতঃ প্যারীলালের আর পড়া হইল না। তিনি কনিষ্ঠের পড়িবার বাধা না হয়, এজন্য জলপাইগুড়ি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন তথায় কার্য্য করিয়া রঙ্গপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। প্যারীলাল বিবাহ করিয়া-

ছিলেন বটে, কিন্তু সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও ধর্ম্মজীবনের কণামাত্রও হানি না হয়, এজন্য তিনি সততই সতর্ক থাকিতেন। সংসারের কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, তাহাতেই তিনি ভাবী জীবনের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেন।

দেখিতে দেখিতে প্যারীলালের আরও বার বৎসর কাল চলিয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার পত্নী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, প্যারীলাল শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি প্যারীলালের চিত্তে বৈরাগ্যরাশি ঢালিয়া দিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। প্যারীলাল নির্জ্জনে বসিয়া যোগ সাধনার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই হীরালাল অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্যারীলাল বুঝিলেন,—"দয়াময় ভগবান্ দয়া করিয়া আমাকে অবসর দান করিয়াছেন, ইহাই আমার প্রকৃত সুযোগ, ইহা প্রত্যাখ্যান করা কোন রূপেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। বৃথা কার্য্যে ঘুরিয়া অমূল্য সময়টা নষ্ট করিতেছি কেন? আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। দয়াময় তোমার ইচ্ছা।" প্রকৃত অবসর বুঝিয়া প্যারীলাল সমস্ত ভার কনিষ্ঠের প্রতি অর্পণ করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও প্যারীলালের মন হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিল; তিনি যোগ সাধনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অচিরকাল মধ্যেই প্যারীলাল চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া সাধনোপযোগী একটী গুহা আশ্রয় করিলেন। তিনি তিন বৎসর কাল চিত্রকূটে অবস্থান পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করেন।

পরে প্যারীলাল বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্গত সাধনার প্রশস্ত স্থান ওঁকার নাথে গমন করেন। এখানে আসিয়া একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্যারীলাল এক বৎসর কাল একাসনে থাকিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক জনৈক ব্যবসায়ী প্যারীলালের এইরূপ কঠোর যোগসাধন দেখিয়া যাহাতে তাঁহার সাধনায় ব্যাঘাত না হয়, এজন্য পর্ব্বতগাত্রে একটী গুম্ফ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্যারীলাল ঐ গুম্ফমধ্যে আসন স্থাপন করিয়া আরও দৃঢ়ভাবে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"অধিক বাক্য বলিতে হইলে বৃথা বা মিথ্যাবাক্য বলা হইতে পারে, সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে যাহাতে অল্প বাক্য প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। ইহার একমাত্র উপায় মৌনাবলম্বন। মৌনা-বলম্বনে মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ত নিশ্চিতই আছে, পরন্তু মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ বাগিন্দ্রিয়ের দমন করাই মৌনাবলম্বনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন মুনি ঋষিগণ বোধ হয় এই জন্যই মৌনব্রতকে যোগের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।" এই সকল বিবেচনা করিয়া প্যারীলাল মৌনব্রত অব-লম্বন করিয়াছিলেন। লোকসমাগমের ভয়ে প্রায়ই গুহার মধ্যে থাকি-তেন। কখন যে শৌচাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টি-গোচর হইত না। এইরূপে প্রায় বৎসর কাটিয়া গেল। তখন মৌনাবলম্বী প্যারীলালকে সকলেই মৌনী বাবা বলিয়া ডাকিত। এই-রূপে তিনি জন-সমাজে "মৌনীবাবা" নামে পরিচিত হইলেন।

মৌনীবাবা যোগসাধন করিয়া অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। ওঁকার নাথের মহান্ত নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, "মৌনী বাবার ন্যায় প্রকৃত সাধু আজ পর্য্যন্ত আর একটীও আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হন নাই।" মৌনী বাবা জগতের অনেক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মৌনী বাবা অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যায় রত হওয়ায়, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট কঙ্কালময় হইয়া পড়িলেন; তাঁহাকে আর অধিক কাল কষ্ট পাইতে হইল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা যোগাসনে বসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। এই সমাধিই তাঁহার শেষ সমাধি। তিনি শান্তিদাতা ভগবানে চিত্ত-স্থাপন-পূর্ব্বক যোগসাধন করিতে করিতেই শান্তিময় অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ স্বামী

কলিকাতার অধীন সিমুলিয়া নামক স্থানে হাইকোর্টের এটর্ণী বিশ্বনাথ দত্ত নামে জনৈক কায়স্থ ভদ্রসন্তান বাস করিতেন। নরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র নামে বিশ্বনাথের তিন পুত্র জন্মে। এই নরেন্দ্রই পরিণামে বিবেকানন্দ নামে আখ্যাত হন। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে ২৯এ পৌষ সোমবার ভোর ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডের সময় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে নরেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। নরেন্দ্র বাল্য-কাল হইতেই অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, সুতরাং আমোদ প্রমোদেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হইলেও স্বকার্য্য সাধনে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন জেনারেল এসেমব্লী হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে নরেন্দ্রের ধর্ম্মপিপাসা অতিশয় প্রবল হওয়ায় তিনি কলেজের অধ্যাপক খ্রীষ্টান মিশনারী হেষ্টিংসাহেবের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আশা মিটিত না, তিনি সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম কি,—কোন্ ধর্ম্ম সত্য; ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মের পর্য্যা-লোচনা করিয়াও প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে না পারিয়া তিনি

ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য নরেন্দ্রের জনৈক বন্ধু নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে পরমহংস দেবের নিকট লইয়া যান। নরেন্দ্র বেশ গান করিতে পারিতেন। কিছুকাল পরে শিষ্য গুরুদেবের অনুমতিক্রমে নরেন্দ্রকে একটী গান করিতে বলেন, নরেন্দ্র বন্ধুর অনুরোধে তখন যে দুইটী গান করেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

১ম গীত

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি যতনে ;—
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শমদম দুই জনে॥
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল-প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

২য় গীত

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥

গীত শ্রবণে পরমহংসদেব প্রীতি লাভ করিলেন। নরেন্দ্র প্রায়ই পরমহংস দেবের নিকটে আসিতেন। নরেন্দ্রের মনের সংশয় পরমহংসদেবের সংসর্গে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রের পিতা ১২৯১ সালে পরলোকে গমন করেন। পিতৃ-বিয়োগের পরই নরেন্দ্রের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। একদা তিনি পরমহংস দেবের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, আমি যোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় শিক্ষাদান করুন। পরমহংস-দেব নরেন্দ্রকে বেদ উপনিষদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতে বলায় তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করেন এবং বিরলে বসিয়া যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেন।

মাতার একান্ত আগ্রহেও নরেন্দ্র বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অনুগ্রহে নরেন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী হইলেন

১২৯৩ সালে পরমহংস দেব দেহরক্ষা করেন। এই সময়

নরেন্দ্র গুরুর আদেশানুসারে বিবেকানন্দ স্বামী নাম ধারণ করিলেন। ইহার পরে তিনি হিমালয় প্রদেশস্থ মায়াবতীতে গিয়া যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন রাজপুতানার অধীন আবু পাহাড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন খেতড়ির মহারাজের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। খেতড়ির মহারাজ অপুত্রক ছিলেন, স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে তিনি একটী পুত্রসন্তান লাভ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো সহরে রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেবের সভাপতিত্বে একটী ধর্ম্মসভা গঠিত হইতেছিল। কতিপয় ভারত সন্তানের প্ররোচনায় বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। খেতড়ির মহারাজের সুবন্দোবস্তে তিনি যথাসময়ে নিরাপদে আমেরিকায় পৌঁছিলেন। আমেরিকায় আসিয়াই চিকাগোতে গমন করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদাদি দর্শনে সহরবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত, পরিচয় জানিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক; স্বামীজী একে একে সমস্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং সুমধুর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার সমাদর করিতে লাগিলেন। সভাপতি ব্যারো সাহেব তাঁহাকে তত্রত্য ধর্ম্মসভায় নিমন্ত্রণ করেন। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন।

ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসভার শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলণ্ড



বিবেকানন্দ স্বামী

পৃঃ—৩১০

ও আমেরিকাবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ও ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মের মত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। আমাদের প্রতাপচন্দ্রও সেই মহাসমিতিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচার করিলেন। ইহার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ সোৎসুকচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি ও তর্ক মীমাংসাদ্বারা ভারতবর্ষে যে পুতুল পূজা হয় না, ইহাই সাধারণের মনে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। বিদ্বন্মণ্ডলী ও সভ্যসমাজ তাঁহাকে শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী সভ্যসমাজ তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করিলেন। এমন কি, বোস-টন ইভিনিং ট্রান্‌সক্রীপ্ট নামক সংবাদ পত্র, মহাবোধি সোসা-ইটীর সেক্রেটারী, দি নিউইয়র্ক হেরল্ড নামক সংবাদ পত্র, চিকাগো মহাসমিতির প্রধান সভাপতি রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাইয়া আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিলেন। আমেরিকার নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল তথায় থাকিয়া বক্তৃতার ফলে বহু নরনারীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করান এবং বেদান্ত-শিক্ষা দেন। প্রথমেই তিনি ম্যাডাম্ লুইস্ (Madam Louise) এবং মিষ্টার স্যাণ্ডেস্ বর্গকে (Mr Sandes burg) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করান ও বেদান্ত শিক্ষা দান করেন। আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁহারাই এক্ষণে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ

নামে পরিচিত হইয়া বেদান্তমত প্রচার করিতেছেন। পরে তিনি ১৩০২ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডেও তিনি হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন এবং অনেক শিষ্য শিষ্যা প্রাপ্ত হন, অবশেষে ইংলণ্ডবাসী কয়েক জন শিষ্যের সহিত তিনি ১৩০৩ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

বিবেকানন্দ ভারতে আসিবার সময় সিংহলের রাজধানী কলম্বো হইতে আহূত হন। কলম্বোয় আসিয়া বিবেকানন্দ সুমধুর উপদেশ দানে তদ্দেশবাসী সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন। পরে কান্দি, দাম্বুল প্রভৃতি স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুরাধাপুরে আগমন করেন। তথায় বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের যে একটী শাখা প্রোথিত আছে, সেই বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অসংখ্য শ্রোতার সমক্ষে উপাসনা সম্বন্ধে একটী অতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনন্তর ভাভোনিয়া হইয়া জাফ্‌নায় আগমন করেন, জাফ্‌নায় যাইয়া তিনি তত্রত্য কলেজে আহূত হইয়া কয়েক দিবস তথায় বেদান্ত মত প্রচার করেন। পরে জলযানে আরোহণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের একাংশ পাম্বানে গমন করেন। তথাকার রামেশ্বর মন্দিরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া রামনাদ-রাজার একান্ত অনুরোধে রামনাদে আগমন করেন। রাজাবাহাদুর স্বামীজীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী স্মৃতিস্তম্ভ পাম্বানে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উহার গাত্রে লেখা আছে যে, “স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত মত প্রচার করিয়া ইংলণ্ডবাসী শিষ্যগণের সহিত ভারতে আসিয়া প্রথম যে স্থানে পদার্পণ করেন,

রামনাদের রাজা আন্তরিক ভক্তির সহিত সেই পাম্বানে এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন”।

বিবেকানন্দ এই সকল অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতাবাসী জন-সাধারণ সমবেত হইয়া রাজা রাধাকান্ত দেবের ঠাকুর বাটীতে একটী বিরাট সভার অধি-বেশন করেন এবং ঐ মহাসমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন কলি-কাতায় থাকিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, কামরূপ, শিলং প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শিলংএর চিফ্ কমিশনার কটন সাহেব যাবতীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে সবিশেষ যত্ন ও অভ্যর্থনা দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৩০৭ সালে প্যারিসের ধর্ম্মসভায় আহূত হন। তিনমাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া জাপানে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৩০৮ সালের ২০এ আষাঢ় রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দ ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে চল্লিশ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি মঠ স্থাপন, অনাথাশ্রম স্থাপন প্রভৃতি জগতের মঙ্গল-জনক কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটী স্থানের নাম উল্লেখ করিতেছি। যথা—কলিকাতার

নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ায় সন্নিহিত মায়াবতীতে, ৺কাশীধামে ও মান্দ্রাজে মঠ-স্থাপন; রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে, মুর্শিদাবাদের অধীন ভাবদা গ্রামে অনাথাশ্রম; হরিদ্বারের অন্তর্গত কনখলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য সেবাশ্রম ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ নামক তিনখানি উপাদেয় গ্রন্থ আছে। উহা পাঠ করিলে বিষয়ী লোকেও ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতই এক জন মহাপুরুষ ছিলেন, একথা ভারতবাসী কেন, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাসী সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

মহাকবি কালিদাস

যিনি সরস্বতীর বরপুত্র, যাঁহার জন্য সংস্কৃত ভাষার নাম দেবভাষা, যাঁহার প্রতিভায় সমস্ত সভ্যজগৎ আলোকিত, যাঁহার কবিত্বচ্ছটায় জগৎ বিমোহিত, সেই জগৎ-কবি-রবি কালিদাসের জীবনচরিত প্রবাদ বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া লিখিত হইতেছে, এ কথা শুনিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না মর্ম্মাহত হইবেন? কিন্তু তাহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, লেখাপড়ায় তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না, ক্রীড়া ও কলহাদিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। উজ্জয়িনী-নিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নিরঞ্জন তর্করত্ন তাঁহার পিতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী পৌণ্ড্রগ্রাম-নিবাসী ভৃগুগোত্র-সম্ভূত সদাশিব ন্যায়বাগীশের ঔরসে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। কালিদাসের বয়ঃক্রম যখন ১৪।১৫ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মাতা, যজমান রাজার সাহায্যে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করাইয়া লন। কালিদাস বড় হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ছিলেন। কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে বা পাড়াপ্রতিবাসী কেহ পীড়িত হইলে, তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তাহাদের উপকার করিতেন।

একদিন কালিদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম, বুভুক্ষা-বশতঃ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার মাতা কালিদাসকে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিতে বলিলেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ কালিদাস অরণ্যা-ভিমুখে গমন করতঃ বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন, সেই সময়ে গৌড়ে মাণিকেশ্বর নামে এক ভূপতি ছিলেন। তাঁহার রত্নাবতীনাম্নী একমাত্র কন্যা, যেমন অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, সেইরূপ বিবিধশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতাও লাভ করিয়া-ছিলেন। এই রূপ-গুণের আদর্শভূতা রমণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। কন্যারত্নলাভের আশায় নানা দেশ-দেশান্তর হইতে রাজা, রাজকুমার ও পণ্ডিতগণ গৌড়নগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু বিচারে সকলেই রত্নাবতীর নিকট পরাস্ত হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিবাহার্থী পণ্ডিতগণ ও রাজন্যবর্গ এইরূপ হতাদর হইয়া, স্ত্রীলোকের এইরূপ ধৃষ্টতা অসঙ্গত ও অসহ্য মনে করিয়া সকলে পরামর্শ করিলেন যে, যে কোন উপায়ে হউক, একটা গণ্ডমূর্খের সহিত এই কন্যার বিবাহ দিয়া, তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। রাজা মাণিকেশ্বর, জামাতৃলাভে বঞ্চিত হইয়া, সুপণ্ডিত আনয়নের জন্য যোক্তৃগণকে বিশেষ পীড়ন করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে হইয়া যোক্তৃগণ পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া, কালিদাস যে বৃক্ষের শুষ্ক শাখা

কর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষের তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। ঊর্দ্ধদিকে ঠক্ ঠক্ শব্দ হওয়ায়, তাহারা বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিতে পাইল যে, একব্যক্তি বৃক্ষের একটী শুষ্ক শাখার উপরি-ভাগে বসিয়া তাহার মূলভাগ কর্ত্তন করিতেছে। শাখা কর্ত্তিত হইয়া লোকটী সমেত পড়িয়া যাইবার অগ্রেই, তাহারা কালিদাসকে অবরোহণ করিতে বলিল এবং সকলে উপযুক্ত গণ্ডমূর্খ পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিদাস বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইলে, তাহারা তাহাকে রত্নাবতীর পরিচয় ও রূপগুণাদির কথা বলিল এবং বুঝাইয়া দিল যে, তাহাদের পরামর্শানুসারে চলিলে, সহজেই তাঁহার রত্নাবতী লাভ হইবে। মা যে উনুনের উপর হাঁড়ি চড়াইয়া কাষ্ঠের আশায় বসিয়া আছেন—বিবাহের নামে কালিদাস সে কথা ভুলিয়া গিয়া যোক্তৃগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। যোক্তৃগণের মুখে এইরূপ পাত্রের কথা শুনিয়া অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ রাজবাটীতে আগমন করিলেন এবং কালিদাসকে পণ্ডিতবেশ ধারণ করাইয়া, তাঁহাকে লইয়া রত্নাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, বিচারার্থী এই পণ্ডিতটী আপাততঃ অল্পদিনের জন্য মৌন-ব্রতাবলম্বী আছেন, অতএব সম্প্রতি মৌখিক বিচার না হইয়া সাঙ্কেতিক বিচার হউক।

যখন কালিদাস সভায় প্রবেশ করেন, তখন সভাস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহা-সমাদরে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে রত্নাবতী ভাবি-লেন, অবশ্যই ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, নচেৎ ইঁহারা এরূপ সম্মান

করিতেছেন কেন। বিচার আরম্ভ হইলে, কালিদাস একটী অঙ্গুলী দেখাইলেন; রত্নাবতী ভাবিলেন, কালিদাস বুঝি এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহার উত্তরে তিন অঙ্গুলী দেখাইলেন, অর্থাৎ এক ঈশ্বর হইতে সত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়াছেন। কালিদাস দুই অঙ্গুলী দেখাইলেন। রত্নাবতী ভাবিলেন, কালিদাস বুঝি পুরুষপ্রকৃতির কথা বলিতেছেন। এই প্রকারে কালিদাসের যখন যেরূপ মনে আসিতে লাগিল, তিনি সেই প্রকারে অঙ্গুলী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রত্নাবতী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সকল সঙ্কেতের এমনই চমৎকার অর্থ করিতে লাগিলেন ও কালিদাসের পাণ্ডিত্যের এরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রত্নাবতী পরাজিতা হইলেন। কালিদাস বিচারে জয়লাভ করিলে, মহাড়ম্বরে রত্নাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রে বাসর গৃহে কালিদাস ও রত্নাবতী শয়ন করিয়া আছেন, ইতি মধ্যে একটী উষ্ট্রের শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। শব্দ শ্রবণে রত্নাবতী কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ হইতেছে?" কালিদাস উত্তর করিলেন, "উষ্ট ডাকিতেছে।" রত্নাবতী শুনিবামাত্র এত চমৎকৃত হইলেন যে, প্রথমে তাঁহার বোধ হইল যে শুনিতে ভ্রম হইয়াছে; এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন?" কালিদাস রত্নাবতীর প্রশ্নের স্বর শুনিয়া বুঝিলেন যে, তিনি অশুদ্ধ বলিয়াছেন, একারণ শুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "উট্র ডাকিতেছে।" প্রথমে "র" ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবারে "ষ" উচ্চারণ

করিলেন না। শ্রবণানন্তর রত্নবতী শিরে করাঘাত-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, পণ্ডিতেরা চাতুরী করিয়া ঘোরতর গণ্ডমূর্খের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন।

কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা॥

বিধাতা রুষ্ট হইলে কি অনিষ্টই না করেন, আর তিনি তুষ্ট হইলে কি ইষ্টই বা সাধিত না হয়? যে নিরেট মূর্খ "উষ্ট্র" শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া একবার রকার লোপ ও একবার ষকার লোপ করে, বিধাতা কি না তাহার করেই আমাকে সমর্পণ করিলেন।

কালিদাস, ভার্য্যার ক্রন্দন ও পরিতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। * পরিশেষে অনেক ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সমধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবেই গৃহে আসিব, নচেৎ এজন্মে আর দেশে মুখ দেখাইব না।

দুর্ব্বিষহ শোকের ভার হৃদয়ে ধারণ করতঃ কালিদাস প্রভাত হইতে না হইতেই বাসরগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান

* এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রত্নাবতী কালিদাসকে পদাঘাতে দূর করিয়াছিলেন।

করিলেন এবং দেবী সরস্বতীর ধ্যান করিতে করিতে, অনাহারে সমস্ত দিন যাপন করিয়া হিংস্রজন্তুসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে ক্লান্তশরীর ও শোকসন্তপ্ত-চিত্তে নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার মাতা তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করিয়া বলিতেছেন, "বৎস! আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে দেবী সরস্বতীর ধ্যানে নিমগ্ন হও, নিশ্চয়ই তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বাগ্‌বাণীর কৃপার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সম্মুখে হঠাৎ এক শুভ্রবর্ণা পক্ককেশী রমণীকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই বৃদ্ধা রমণীর প্রশ্নমতে তিনি নিজের সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। তখন মায়াবেশধারিণী বাগ্‌দেবী তাঁহাকে কহিলেন যে "তোমার মাতৃবাক্য সত্য হইবে, তুমি স্নান করিয়া আইস, আমি দেবীর উপাসনামন্ত্র তোমার কর্ণ-কুহরে প্রদান করিব, তুমি সেই মন্ত্রের মাহাত্ম্যে বীণাপাণির কৃপা প্রাপ্ত হইবে।" কালিদাস স্নান করিয়া আসিলে রমণী তাঁহাকে "ব্রহ্ম" নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। কালিদাস অতি মৃদুস্বরে "বেহ্ম, বেহ্ম, বেহ্ম" তিনবার উচ্চারণ করিয়া, নিজের অকৃত-কার্য্যতায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন। দেবী ভারতী হাসিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দেবীর করস্পর্শে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কালিদাসের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া গেল; দেবী তখন দয়া করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই যে সম্মুখে সারস্বত কুণ্ড দেখিতেছ,

ইহাতে তুমি ডুব দাও, ডুব দিয়া যাহা পাইবে, তাহা তুলিয়া লও।” কালিদাস ডুব দিয়া একতাল কাদা তুলিলেন, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহা কি?” কালিদাস বলিলেন, “পাক।” দেবী কহিলেন, “উহা ফেলিয়া দিয়া আবার ডুব দাও এবং যাহা পাইবে, তাহা তুলিয়া আন।” সেবারেও কালিদাস ডুব দিয়া পাঁক তুলিলেন। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহা কি?” কালিদাস বলিলেন, পাঁক।” দেবী কহিলেন, “ইহা ফেলিয়া দাও এবং আবার ডুব দিয়া যাহা পাও, আমার নিকট লইয়া আইস।” কালিদাস ডুব দিয়া একটী পদ্মফুল প্রাপ্ত হইলেন, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা কি?” কালিদাস বলিলেন, “পঙ্কজ”। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে
বামকরে লসদুৎপলমেকম্।
ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে
কর্কশনালমকর্কশনালম্॥

অতঃপর কালিদাস দেবীর বামপদে অকণ্টক-নাল উৎপল এবং দক্ষিণ চরণে কণ্টকিত-নাল পদ্ম সমর্পণ করিলেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়া দেবী এই বলিয়া বরদান করিলেন যে, আমি তোমার জিহ্বাতে বাস করিব। কিন্তু কালিদাস, তুমি কি জান না যে, আরাধ্য নায়িকার স্তব করিতে হইলে, প্রথমে চরণ বন্দনা করিতে হয়, তুমি তাহা না করিয়া, সামান্য নায়িকার ন্যায় প্রথমেই আমার মুখমণ্ডল বর্ণনা অর্থাৎ আমাকে পঙ্কজলোচনা বলিয়া বর্ণনা করিলে; এটী

তোমার বড় অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এই দোষে পরিশেষে তুমি কোন সামান্য গণিকার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া দেবী তাঁহাকে কাশীধামে বিষ্ণু শিরোমণি নামক জনৈক সুধীর নিকট যাইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়া, আকাশপথ উজ্জলকরতঃ অন্তর্হিত হইলেন।

কালিদাসের পথের সম্বল কিছুই ছিল না। তিনি বরণের অঙ্গু-রীয়ক বিক্রয় পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহকরতঃ অতিকষ্টে বারাণসীতে বিষ্ণু শিরোমণির নিকট উপস্থিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কালিদাসের প্রতিভা-কিরণ বিকসিত হইয়া পড়িল—তিনি স্বল্পকালেই বিবিধশাস্ত্রে অত্যাশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অধ্য-য়ন শেষ হইলে, তিনি গুরুদেবের পদধূলি লইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ-করতঃ গৌড়ের রাজসভায় সন্ন্যাসীর বেশে অতি হীন অবস্থায় উপনীত হইয়া, রাজাকে আত্ম-পরিচয় দিয়া তাঁহাকে দৈব-বিদ্যার কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা, জামাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রত্নাবতীর সহিত তাহার পুনঃ সাক্ষাৎ লাভ হইলে, কালিদাসের শাস্ত্র-পারদর্শিতা, বিচারে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অদ্ভুত কবিত্ব দর্শন করিয়া তিনি ভাবিলেন, কোন ছদ্মবেশী পণ্ডিত তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি কালি-দাসকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতা হইলেন। কালিদাস স্ত্রীর নিকট পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া গৃহে ফিরিয়া না আসিয়া, রাজার আজ্ঞাক্রমে বহির্ব্বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কবিত্ব রসে রত্নাবতীকে দ্রবীভূত করিতেই

হইবে। এই নিমিত্ত তিনি কথকের ন্যায় পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন।

রত্নাবতী একদিনও কালিদাসের অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে আইসেন নাই। তিনি বিরলে বসিয়া ভগ্ন আশা বুকে বাঁধিয়া, শোকসাগরে ভাসমান থাকিতেন। অবশেষে তাঁহার সখীগণের অনুরোধে তিনি একদিন কালিদাসের গান শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থানে আসীন হইলেন। কালিদাস ব্রজলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রবণান্তে রত্নাবতীর দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, দৈবশক্তি ব্যতীত সেরূপ বর্ণনাচাতুর্য্য ও রসমাধুর্য্য কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাঁহার মন টলিল, কালিদাসের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—সত্বর-পদে নিজগৃহে যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সখীগণের নিকট কালিদাসকে আনয়নের জন্য বলিলেন। কালি-দাস যথাসময়ে কম্পিতপদে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে, সুখের কল্পনায় ভাসিতে ভাসিতে, বহুদিনের সিঞ্চিত আশালতার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার মনপ্রাণহারিণী রত্নাবতীর নিকট উপনীত হইলেন।

রত্নাবতী তাঁহাকে দেখিবামাত্র "স্বামিন্" বলিয়া কালিদাসের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন;—উষ্ণ অশ্রুজলে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া দিলেন এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য করুণ ভাষায় ও করুণস্বরে স্বামিসন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কালিদাস হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সযত্নে উত্তোলন করিলেন ও রত্নাবতীর নির্দ্দোষিতা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন, উপযুক্ত তরু উপযুক্ত লতা-

ভূষণে জড়িত হইল। কালিদাস পরম সুখে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মাতার জন্য কালিদাসের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মাতার নিকট যাইবার জন্য শ্বশুরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা ও রাণী তাঁহার প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত মনে করায় বিবিধ যৌতুকাদি দান করতঃ কন্যাকে জামাতার সহিত সুসজ্জিত ও চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দিলেন। মহাসমারোহে কালিদাস রাজচতুর্দ্দোলে উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলেন। মাতা, হারানিধি প্রাপ্ত হওত অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া, শিরশ্চুম্বনকরতঃ কালিদাসকে ক্রোড়ে বসাইলেন এবং কালিদাস-প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করতঃ আনন্দে মগ্ন হইয়া মঙ্গলকার্য্যমত পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। পুত্রের যশঃসৌরভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে অনুক্ষণ আমোদিত হইতে লাগিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য, কালিদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বখ্যাতি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সভার এক রত্ন করিলেন এবং কালিদাসই তাঁহার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে লক্ষহীরানাম্নী পরমা-সুন্দরী এক যুবতীকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপপত্নীস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন কখন অতি সংগোপনে ঐ বেশ্যাভবনে যাতায়াত করিতেন; তাহা আর কেহ জানিতে না পারিলেও কালিদাস কিন্তু কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি রাজার অজ্ঞাতে লক্ষহীরার বাটীতে যাইতে লাগিলেন। রাজাও একথা শুনিতে পাইলেন। তাহাতে

কালিদাসের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে গণিকাগারে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সৎ-কার্য্য শতবৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত থাকে, কিন্তু পাপকর্ম্ম তিনমাসের বেশী কখনই গোপন থাকে না। ধর্ম্ম যেন ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য স্কন্ধে ঢাক লইয়া, তাহা ঘোষণা করিতে থাকেন।

যাহা হউক, যত বড় জ্ঞানী, মানী ও বিদ্বান্ হউক না কেন, বেশ্যাসক্ত হইলে লজ্জার সহিত তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-মান সকলই লোপ পাইয়া যায়; সুতরাং মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া তিনি পশুত্ব প্রাপ্ত হন। এই জন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক নারী হইতে একেবারে দূরে অবস্থান করেন! সাধুগণ ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

একদিন কালিদাস ঐ বেশ্যাভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজাকে দেখিয়া ভয়ে কালিদাস পলাইয়া গেলেন। মহারাজ ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষহীরাকে কহিলেন, "তুমি যদি কালিদাসকে বিনাশ করিয়া তাহার মুণ্ড আমাকে না দেখাও, তাহা হইলে আমি তোমার মুণ্ড নিপাতিত করিব। আর যদি তুমি তাহাকে সংহার করিয়া তাহার মুণ্ড আমাকে উপহার দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিব।" লক্ষহীরা তাহাই অঙ্গীকার করিলে, রাজা নিজাগারে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাপের ছায়া স্পর্শ করা বা পাপীদের সহিত ক্ষণকাল বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। কালিদাস এতবড় জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াও মৃত্যুসম্ভাবিতস্থলে আবার গমন করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি পুনরায়

লক্ষহীরার বাটীতে গমন করিয়া, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। এবারে তিনি লক্ষহীরার আলয়ে আসিবামাত্র, লক্ষহীরা তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকে সংহার করতঃ রাজাকে তাঁহার মুণ্ড উপহার দিয়া, লক্ষমুদ্রা পুরস্কার গ্রহণ করিল। এইখানেই কালিদাসের জীব-লীলা সকলি ফুরাইয়া গেল।

কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, নলোদয়, ঋতুসংহার প্রভৃতি খণ্ডকাব্য এবং স্মৃতিচন্দ্রিকা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কালিদাস কেবল কবি ছিলেন না। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কাব্য সকল মধ্যেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

শৃঙ্গারতিলক প্রভৃতি আদিরসপ্রধান কাব্যে কালিদাস বিশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, শান্তিরসাদিঘটিত কবিতা রচনায় ইঁহার ক্ষমতা অল্প ছিল না। যাহা হউক, তিনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে যদি তিনি শান্তিরসে নিমগ্ন থাকিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচয় হইত। তিনি চিত্তকে কলুষিত করায়, তাঁহার পরিণাম বড় শোচনীয় হইয়াছিল। কেননা, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

এ ছাড়া কালিদাসের জীবনী বিস্তারিত অবগত হইতে হইলে "বসাক এণ্ড সন্স" প্রকাশিত "মহাকবি কালিদাস" পাঠ করুন। তাহাতে বিস্তৃত জীবনী, কাব্য-সমালোচনা, সসেমিরার গল্প, রাক্ষসীর প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিস্তারিত লিখিত আছে।

বিক্রমাদিত্য

বিক্রমাদিত্যের সময় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতি যেরূপ হইয়াছিল, এরূপ ভারতে আর কখনও হয় নাই। ইনি খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মালবদেশীয় উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার প্রচারিত সংবৎনামে বিখ্যাত অব্দ অদ্যাপি ভারতে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একজন গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের শাপে গর্দ্দভ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন। দিবসে গর্দ্দভদেহ ও রজনীতে নরদেহ ধারণ-পূর্ব্বক তিনি গন্ধর্ব্বসেন নামে বিচরণ করিতেন। রাজা সুন্দরসেন আপনার কন্যার সহিত ইহার বিবাহ দেন এবং সেই কন্যার গর্ভে বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া দেশ-ভ্রমণে গমন করেন। কিছুদিন পরে ভর্ত্তৃহরি আপনার পত্নীর অসতীত্ব-দর্শনে সংসার পরিত্যাগ করেন। রাজ্য অরাজক হইলে, ইন্দ্র একজন যক্ষকে রাজ্যরক্ষার্থ প্রেরণ করেন। ইহাও কথিত আছে যে, অগ্নিবেতাল আসিয়া পুরী আক্রমণ করিলে, বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পরাস্ত করতঃ স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

এই সময়ে জনৈক ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বিক্রমাদিত্যকে বলি দিবার মানসে ইহাকে কৌশলে সম্মত করিয়া শ্মশানে আনয়ন করে। পরে ইহাকে শিংশপাবৃক্ষলম্বিত শব

আনিতে বলে। ঐ শবে বেতাল আবিষ্ট হইয়া, বিক্রমাদিত্যের নিকট ২৫টী গল্প বলিয়াছিল। পরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ তাপসকে বলি দিয়া বেতালসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সুবাহু রাজার নিকট দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত এক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবন সম্বন্ধীয় ৩২টী গল্প বত্রিশসিংহাসন নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ইনি অনেক অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্‌ ও স্বয়ং একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত সকলকে একত্রিত করিয়া একটী নবরত্নের সভা গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—কালিদাস, বররুচি, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্প্পর, বরাহমিহির। এই সকল পণ্ডিতরত্ন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। রাণা সংগ্রাম-সিংহের পুত্র বনবীর সিংহ ইঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বনবীরসিংহকে রাজপুতেরা অদ্যাপি বিক্রমজিৎ বলেন।

বল্লাল-সেন

গৌড়ে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেনবংশীয় রাজা বল্লাল-সেনই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু ইঁহার জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন।

বিক্রমপুর অঞ্চলে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বল্লাল জাতিতে বৈদ্য, ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে ইঁহার জন্ম। সেক শুভোদয়া গ্রন্থেও ইহাই প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলেন—বল্লাল-সেন কায়স্থ ছিলেন। বল্লাল রচিত দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, সেন রাজগণের শিলালিপি, হরিমিশ্রের কারিকা এবং আনন্দভট্ট-রচিত বল্লাল-চরিতে বল্লাল-সেন চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আনন্দভট্ট বল্লালকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা সদ্‌বংশসম্ভূত ও আচারাদি নবগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক সমাজ সংস্কার করিয়া বল্লালসেন সামাজিক সম্মান যথাযথভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাই বল্লাল-চরিতের প্রধান কার্য্য।

অদ্ভুত-সাগরে দেখা যায়—বল্লাল ১০৯০ শকে অদ্ভুত-সাগর প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং গ্রন্থ সমাপ্তি হইতে না হইতেই তিনি অনন্ত ধামে গমন করেন। পরে লক্ষ্মণ-সেন উহার অবশিষ্টাংশ সঙ্কলন করেন। দান সাগরে লেখা আছে, ১০৯১ শকে অদ্ভুতসাগর সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে, বল্লাল-

সেন ১০৯১ শকে অথবা তাহার অনতিকাল পরেই পরলোকে গমন করেন। আইন-ই-অকবরীর মতে বল্লাল ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। আনন্দভট্ট বলেন—বল্লাল ৪০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ৬৫ বৎসর ২ মাস বয়সে ১০২৮ শকে মানবলীলা সংবরণ করেন। আমরা কিন্তু বল্লাল-লিখিত প্রমাণাদি উপেক্ষা করিয়া ভট্টজীর মতে মত দিতে পারি না। ১০৯১ শক কিম্বা উহার অব্যবহিত পরে বল্লালের দেহাবসান সময়ই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

যা হ'ক্, ইহার মৃত্যুসম্বন্ধে বল্লাল-চরিতে একটী গল্প লিখিত আছে, কিন্তু উহার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। গল্পটী এই—একদা বল্লাল-সেন বায়াতুম্ব নামক জনৈক ম্লেচ্ছের সহিত যুদ্ধযাত্রা কালে তুইটী পারাবত সঙ্গে নিয়া যান এবং মহিষীদিগকে বলিয়া যান যে, এই পারাবত ফিরিয়া আসিলেই আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিবে, সুতরাং তোমরা সকলেই তখন চিতানলে আত্মসমর্পণ করিবে। বল্লাল অতি বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি সেই ঘোরতর যুদ্ধে ম্লেচ্ছ বায়াতুম্বকে নিহত করিলেন এবং যুদ্ধের পর শ্রান্তি দূর করিয়া স্নানার্থ জলাশয়ে অবতরণ করিলেন। এদিকে পারাবত রাজাকে দেখিতে না পাইয়া উড়িয়া আসিল। মহিষীগণ পারাবত দেখিবামাত্র স্বামীর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রণবিজয়ী রাজা বল্লালও গৃহে আসিয়া এই শোচনীয় ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—পতিপ্রাণা সতী রমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন।

নাভাজী

প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জনৈক ডোমের গৃহে ভক্ত-প্রবর নারায়ণ দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই কালে নাভাদাস বা নাভাজী নামে জন-সমাজে পরিচিত হন। ইঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ইঁহার পিতামাতা ইঁহাকে এক বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অগর দাস ও কীল নামে দুই জন বৈষ্ণব ইঁহাকে দেখিতে পাইয়া আপনাদের মঠে লইয়া যান। বালক নাভা নিরাপদে উক্ত মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে নাভাজী অগর দাসের নিকট দীক্ষিত হয়েন এবং গুরুর আদেশ অনুসারে ১০৮টী ছপ্পাই শ্লোকে অপূর্ব্ব ভক্তমাল গ্রন্থ ব্রজ-ভাষায় রচনা করেন। শাহজানের রাজত্বকালে ইঁহার শিষ্য নারায়ণ দাস পুস্তকখানি সরল করিয়া প্রকাশ করেন। প্রিয়দাস ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। প্রিয়দাসের শিষ্য লালাজী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ভক্তউর্ব্বশী নামে আর একটী টীকা রচনা করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ তুলসী রাম ভক্তমাল প্রদীপন নামে ইহার উর্দ্দু অনুবাদ করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস এই পুস্তক অবলম্বন করিয়া প্রিয়দাসের টীকা বিস্তার পূর্ব্বক বাঙ্গালায় ভক্তমাল প্রকাশ করেন। নাভাদাস বা নাভাজী একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ছিলেন।

তানসেন

ভারতে তানসেন একজন অদ্বিতীয় গায়ক। ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু, বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। ভাটের বাঘেলারাজ রামচাঁদ তাঁহাকে সাদরে আপন সভায় রাখেন।

দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন রাজা রামচাঁদ আকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না, বিষণ্ণমনে তানসেনকে বিদায় দিলেন।

তানসেন প্রথমতঃ দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না, সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন, কি তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেন না। অবশেষে একদিন আকবর আপন কন্যাকে তানসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। যুবক যুবতী উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন, কালে উভয়ে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলেন। প্রেমের বন্ধনে তানসেন সম্রাটের আশ্রিত হইলেন। এই হইতেই তিনি যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'তানসেন-পতি আকবর', এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। 'পূর্ব্বে তিনি যে সকল স্বরচিত গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের ভণিতা থাকিত। বিবাহের পর তানসেন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'মিঞা তানসেন' নাম ধারণ করিলেন।

তানসেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। দিল্লীশ্বর আকবর সঙ্গীত-সাধক তানসেনকে সাতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখেন বলিয়া সম্রাট্‌সভায় তানসেনের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। কারণ বাদশাহের দরবারে সঙ্গীত সংগ্রামে কেহই তানসেনকে পরাস্ত করিতে পারিত না। অবশেষে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল যে, তানসেন দ্বারা দীপক রাগ গীত হইলেই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং তাহারা বাদশাহের নিকট দীপক রাগের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। বাদশাহ শুনিয়াই সভাস্থ ওস্তাদগণকে দীপক রাগ গাহিতে আদেশ করিলেন। তখন তানসেন ব্যতীত সকলেই বলিল—আমরা দীপক রাগ অবগত নহি। সম্রাট তানসেনকে আদেশ করিলেন। তানসেন বাদশাহকে অনুনয় সহকারে বলিলেন, দীপক গাহিলে পুড়িয়া মরিব। অতএব যদি আমাদ্বারা আপনার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না। বাদশাহ ছাড়িবার পাত্র নহেন, স্বীয় কৌতূহলের চরিতার্থতা সম্পাদনই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিলেন, জামাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

তানসেন তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কন্যাকে মল্লার গাহিতে আদেশ করিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। পিতার মৃত্যু আশঙ্কায় কন্যার সুর বিকৃত হইল, দীপকানল মল্লারের গুণে প্রশমিত হইল না,—তানসেন নিজের অনলে নিজেই দগ্ধ হইলেন। তানসেনের স্বর-প্রভায় সভাস্থ দীপসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া তাঁহার জীবন প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল। তানসেনের

আদিলীলা ক্ষেত্র গোয়ালিয়রে তাঁহার সমাধি হইল। সমাধির উপরে এখনও একটী বৃক্ষ দেখা যায়। ঐ বৃক্ষের পাতা চিবাইলে সুমধুর কণ্ঠস্বর ও উত্তম গানশক্তি হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী থাকায় অনেক নর্ত্তক নর্ত্তকী গোরস্থানে গিয়া উক্ত পত্র চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

সাধক তানসেন কেবল অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন না; তিনি কতকগুলি নূতন রাগ রাগিণীও সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী, যোগিঞা, দরবারী, কানাড়া প্রভৃতি তাঁহারই কপোল-কল্পিত।

তানসেনের দুই পুত্র। আইন-ই-অকবরী ও পাদশানামায় তাঁহারা যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে আখ্যাত। তাঁহারাও প্রসিদ্ধ গায়ক। গায়কশ্রেষ্ঠ সুরতসেন তানসেনেরই বংশধর। তদ্বংশীয় প্যারসেন অপূর্ব্ব কানুনযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তানসেনের শিষ্য-গণের মধ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিল, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

তানসেনের কন্যা যে মল্লার গাহিবার সময় সুর বিকৃত করিয়াছিলেন, সেই বিকৃত মল্লারই মিঞা মল্লার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হুসেন শাহের রাজত্ব-কালে রামচন্দ্র নামে পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক কায়স্থ-সন্তান বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পাট মহল পরগণায় আগমন করেন এবং সপ্তগ্রামের নবাবের কাছারীতে মুহুরির কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ইঁহারাও তথায় কাননগোই দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলেন। ভবানন্দের কার্য্যদক্ষতা ও কীর্ত্তিকলাপে মুগ্ধ হইয়া গৌড়ের নবাব নসরৎ তাঁহাদিগকে গৌড়ে আনয়ন করেন এবং শিবানন্দকে তত্রত্য কাননগোই দপ্তরের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধ রামচন্দ্র পুত্রগণের সহিত গৌড়েই বাস করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ নিঃসন্তান। ভবানন্দের পুত্র—শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্র জানকী-বল্লভ। শ্রীহরি ও জানকী-বল্লভে এত সদ্ভাব ও ভ্রাতৃ-স্নেহ ছিল যে, সকলেই তাহাদিগকে সহোদর বলিয়া জানিত।

সুলেমান শাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া শ্রীহরিকে "বিক্রমাদিত্য" এবং জানকী বল্লভকে "বসন্তরায়" উপাধি দান করেন। এই হইতে তাঁহারা উক্ত উপাধিতেই প্রসিদ্ধ হইলেন। এই শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যই প্রতাপাদিত্যের জনক।

প্রতাপের জন্মকাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে, স্থির করা বড়ই সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের জন্ম হয়। যাহাই হউক, প্রতাপ জন্ম গ্রহণ করিয়াই বিকৃত রব করিয়াছিলেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াও পিতা ভবানন্দ ও ভ্রাতা বসন্ত রায় এবং প্রতাপের মাতার অনুরোধে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

প্রতাপ পাঁচবৎসর বয়সে বিদ্যাভাসে নিযুক্ত হইয়া আরবী পারসী ও ধনুর্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন এবং শরসন্ধান, অস্ত্র-সঞ্চালন ও অশ্বারোহণ কার্য্যেও বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়া-ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার রাজা নবাব দাউদের নিকট একটী জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন, উহার নাম চাঁদ খাঁ। দক্ষিণ বঙ্গে কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতী নামে দুইটী নদী আছে; উহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই চাঁদ খাঁ নামে পরিচিত। পূর্ব্বে চাঁদ খাঁ নামে জনৈক নিঃসন্তান মুসলমান উক্ত ভূভাগের অধিকারী ছিল বলিয়াই উহা চাঁদ খাঁ নামে অভিহিত। চাঁদ খাঁর মৃত্যুর পর নবাব প্রিয়-সচিব বিক্রমাদিত্যকে উহা দান করেন।

বিক্রমাদিত্য যখন সম্রাট্ আকবরের সহিত নবাবের যুদ্ধ অবশ্য-ম্ভাবী বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি চাঁদ খাঁতে বাস করিবার অভি-লাষে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বয়ের বিয়োগ স্থানে নগর পত্তন ও গড় প্রস্তুত করিয়া গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় স্বজন সকলকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ নগরে স্থাপন করিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত

যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নগর জনমানবে পূর্ণ হইল। বিক্রমাদিত্য যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই পরিজনবর্গকে যশোহরে পাঠাইলেন। ধনকুবেরগণ এমন কি নবাব স্বয়ং নিজ ধনরত্নাদি নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত যশোহরে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মোগল পাঠানের যুদ্ধে নবাব নিহত হইলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় অনন্যোপায় হইয়া রাজা টোডর মল্লকে রাজ্যের যাবতীয় কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিলেন, ফলে তাঁহাদের জায়-গীর বহাল থাকিল এবং তাঁহারা উভয়ে মহারাজা ও রাজা উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া যশোহরে আগমন করিলেন। বিক্রমাদিত্য অসুস্থতা নিবন্ধন ভ্রাতার উপর রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন। কিছুদিন পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজ-কুমারীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হইল।

বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ দেখিয়া যত্নের সহিত শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রতাপ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে রাজা টোডর মল্লের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হইলে তথায় যুবরাজ সেলিমের সহিত তাহার পরিচয় হইল; সেলিম প্রতাপের প্রতি সদয় হইলেন। প্রতাপ ক্রমে মোগল রাজের গৃহচ্ছিদ্র সকল অবগত হইয়া সম্রাট্‌কে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু বাদশাহ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহই করিতেন। কিছুদিন পরে প্রতাপ পিতৃব্য প্রদত্ত রাজস্ব সম্রাট্‌কে না দিয়া জানাইলেন যে, চাঁদ খাঁর খাজনা বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট্ জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ করিলেন, প্রতাপ অনেক অনুনয় করিয়া নিজেই রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বাদশার

মন গলিয়া গেল, তিনি প্রতাপের নামে চাঁদ খাঁ জমীদারির সনন্দ দিলেন এবং প্রতাপকে রাজা উপাধি দিয়া দেশে পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন। অসুস্থ শরীর আরও অসুস্থ হইল, অল্পদিনের মধ্যেই কালকবলে পতিত হইলেন। মৃত্যুকালে জমীদারির দশ আনা প্রতাপকে ও ছয় আনা বসন্ত রায়কে দিয়া গেলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বসন্ত রায় বৈশাখী পূর্ণিমার দিবসে প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং জমীদারি ভাগ করিয়া দিলেন।

প্রতাপ রাজা হইয়াই যশোহরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ধূমঘাটে গিয়া—রাজধানী স্থাপন করিলেন। কালীগঞ্জের নিকট প্রতাপ নগর নামে একটী নগর পত্তন করিলেন। নবাবের অনেক ধনরত্ন যশোহরের রাজকোষে আসিয়াছিল, সুতরাং প্রতাপ অজস্র অর্থব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ শক্তির উপাসক ছিলেন। প্রবাদ আছে যে ভগবতী ভবানী প্রতাপের গুণে মুগ্ধ হইয়া যশোহরে শিলাময়ী রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। প্রতাপ দেবীকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিজালয়ে আনয়ন পূর্ব্বক নবনির্ম্মিত মন্দির মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং দেবীর নাম যশোহরেশ্বরী রাখিয়া তাঁহার সেবার জন্য যশোহরের উপস্বত্ব দান করিলেন।

প্রতাপ সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রাজ্যাভিষেক দিবসে প্রতাপ ও তদীয় মহিষী কল্পতরু হইয়াছিলেন। দানশীলতাই প্রতাপকে সর্ব্বজন-প্রিয় করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভ

করিয়া প্রতাপ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। উহার একপৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীকালী-প্রসাদেন জয়তি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য"। অপর পৃষ্ঠে "বাজৎ ছিক্কা রহিম জররে বঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল" এইরূপ লেখা।

বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) মন্ত্রী রূপ বসুর সহিত সর্ব্বদা পিতৃহন্তা প্রতাপের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাদশাহের সাহায্যে মানসিংহকে বাঙ্গলায় আনিবার সুযোগ পাইলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মানসিংহ যশোহরের পশ্চিমে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানসিংহ যশোহর আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ সহজ পাত্র নহেন, মানসিংহকে অনেকবার হটিতে হইল, কিন্তু তিনি যশোহর পরিত্যাগ করিলেন না। কচুরায়ের পরামর্শে নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহকে নিহত করিতে উদ্যত, এমন সময় কচুরায় আসিয়া প্রতাপকে অন্যায়ভাবে আহত করিলেন, প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। প্রতাপ নিহত মনে করিয়া সৈন্যগণ পলায়ন করিল, মোগল সৈন্যগণ প্রতাপকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। পথিমধ্যে বারাণসীপুরীতে প্রতাপ প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে প্রতাপ মাতৃপূজার উদ্‌যাপন করিলেন।" কচুরায় পিতৃ-হন্তার কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইলেন।

লীলাবতী

ইনি সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া, ইনি তাঁহার নিকট অতি যত্নে প্রতিপালিতা হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। লীলাবতী, বিবাহের পর বিধবা হইবেন, ইহা তাঁহার পিতা জ্যেতিষ-বলে অবগত হইয়া, কন্যার বিবাহ শুভলগ্নে দিবার মনস্থ করেন। শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য পাত্রে একটী ছিদ্র করিয়া, তাহা জলের উপর ভাসাইয়া রাখিলেন। সেই পাত্র জলপূর্ণ হইলেই লগ্ন উপস্থিত হইবে স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু লীলাবতী মুখ নত করিয়া তাহা দেখিতেছিলেন; তাহাতে তাঁহার মুকুটস্থ মুক্তা ঐ পাত্রে তাঁহার অগোচরে পতিত হইয়া, ছিদ্রপথ রুদ্ধ হওয়ায়, জল আর প্রবেশ করিল না। এইরূপে লগ্নের আনুমানিক সময় অতীত দেখিয়া, সকলে অনুসন্ধান করিয়া ঐ মুক্তা দেখিতে পাইলেন। ভাস্করাচার্য্য দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ভবিতব্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া মানবের অসাধ্য।" তৎপরে তিনি লীলাবতীর বিবাহ দিলে, তিনি যথাকালে বিধবা হইলেন। পরিশেষে ভাস্করাচার্য্য, সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতীনামে এক পাটীগণিত করেন। এই গ্রন্থে লীলাবতীও সম্ভবতঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে পিতা প্রশ্ন করিতেছেন ও কন্যা তাহার উত্তর দিতেছেন।

রাণী দুর্গাবতী

রাণী দুর্গাবতী কনোজের অধিপতি চন্দনরাজের দুহিতা, গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপত শাহের সহধর্ম্মিণী। দুর্গাবতী যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন চন্দনরাজ ইঁহাকে রাজপুতানার জনৈক রাজকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী করিবার বাসনা করিলেন; কিন্তু গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপত শাহের কীর্ত্তিকলাপে মুগ্ধ হইয়া কুমারী দুর্গাবতী মনে মনে তাঁহাকে পূর্ব্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। চন্দনরাজ কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও তাহাতে মত প্রকাশ করিলেন না। দলপত শাহ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কুমারী দুর্গাবতী বিজয়লক্ষ্মীর সহিত দলপতের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

যথাসময়ে দুর্গাবতী একটী পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন। রাজা-রাণী উভয়ের আনন্দের সীমা নাই। পুত্র বীরনারায়ণ নামে অভিহিত হইল। বালকের বয়স তিন বৎসর হইতে না হইতেই মহারাজ কালকবলে পতিত হইলেন। স্বামী-শোকে পাগলিনীপ্রায় রাণী দুর্গাবতী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেন এবং রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া রাণী নিজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। রাণী দুর্গাবতী রাজ্য মধ্যে কূপ খনন,

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দিরাদি সংস্থাপন, অনাথাশ্রম স্থাপন প্রভৃতি জগতের অনেক মঙ্গলময় কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। রমণীর মহত্বে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিভাত হইয়াছিল।

তখন প্রবলপরাক্রান্ত মোগলসম্রাট আকবরের বিজয় পতাকা হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু মধ্য ভারতের মধ্যবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী স্বীয় স্বাধীনতায় গর্ব্বিত হইলেও মহানুভব বাদশাহের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাহার প্রতি পতিত হয় নাই। কিন্তু হায়! কালের কুটিল গতি! লোভের বশবর্ত্তী মানব কতদিন স্থির থাকিতে পারে! একজন সামান্য আমীর ওমরাহের ক্ষুদ্র জায়গীর অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর একটী সামান্য রাজ্যের জন্য প্রবল-প্রতাপ বাদশাহের লোভ জন্মিল,—তিনি আজফ খাঁ নামক একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য নিযুক্ত করিলেন। আজফ খাঁ প্রভুর নিয়োগানুসারে গড়মণ্ডল অধিকার করিতে অগ্রসর হইল।

রাণী এ সংবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া যবনকরে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা দেশের জন্য—দশের জন্য রণক্ষেত্রে প্রিয়তম পুত্র সহ স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। প্রজাবৃন্দ সকলেই রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যুদ্ধের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। রাণী দুর্গাবতীও অসুরনাশিনী চামুণ্ডার ন্যায় স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হইলেন। প্রায় আট সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বিসহস্র গজারোহী সৈন্য আসিয়া রণক্ষেত্রে সমবেত হইল।

আজফ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই,—যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণীর সৈন্য-সমূহের বিক্রমানলে যবনসৈন্য পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল, অতি কষ্টে আজফ খাঁ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। গড়মণ্ডলবাসী বিজয় নিশান হস্তে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

দিল্লীশ্বর সংবাদ পাইয়া দেড় বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিপুল, সৈন্যসহ পুনরায় আজফ খাঁকেই যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবারও আজফ খাঁ ছত্রভঙ্গ সৈন্যের সহিত নিজের প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। দুইবার পরাজিত হইয়া আজফ খাঁ ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে গড়মণ্ডলে বিশ্বাস ঘাতকতার বীজ বপন করিল। যখন তাহা অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল, তখন আজফ খাঁ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

এবার রাণীর সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প, অপরিমিত যবন সৈন্যের সহিত কতকাল যুদ্ধ করিতে পারিবেন! অরুণোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু জয়ের আশা নাই। এমন সময় রাণীর প্রাণোপম পুত্র বীর-নারায়ণ আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া রাণীকে সংবাদ দিল যে, আপনার পুত্র শেষশয্যায় শায়িত, একবার তাঁহার সহিত দেখা করা আবশ্যক। রাণী সংবাদ শুনিয়াই গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন যে, এখন সাক্ষাৎকারের সময় নয়, আমি ক্ষণকালের জন্যও রণস্থল পরিত্যাগ করিতে পারি না। বীরপুত্র বীরধর্ম্ম পালন করিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বসিয়াছে, এখন

সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, শীঘ্রই সেই দিব্যলোকে উভয়ে মিলিত হইব।

যুদ্ধের বিরাম নাই—ভীষণবেগে চলিতে লাগিল। হঠাৎ একটী শর আসিয়া রাণীর চক্ষু বিদ্ধ করিল, রাণী চেষ্টা করিয়াও তাহা বাহির করিতে পারিলেন না; তখন তিনি ভীমবেগে বিপক্ষদল আক্রমণ করিলেন। যখন দেখিলেন, আত্মরক্ষার আর উপায় নাই, তখন গড়মণ্ডলের অধিস্বামিনী রাণী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের প্রতি একবার শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘূর্ণিত করবাল দ্বারা স্বীয় মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। সৈন্যগণ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। সাধের গড়মণ্ডলও যবন সৈন্যের করকবলিত হইল—সব ফুরাইল।

খনা

খনা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবতী ছিলেন। কথিত আছে, রাক্ষসগণ তাহাদের সবংশে নিধন করিয়া খনাকে লইয়া সিংহলদ্বীপে প্রস্থান করে এবং তথায় তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিতে থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেয়। ইতিপূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার বরাহ নামক পণ্ডিতের একটী পুত্র সন্তান জন্মে। বরাহ গণনা বিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াও ভ্রম বশতঃ পুত্রের শতবৎসর পরমায়ু স্থলে দশ বৎসর মাত্র স্থির করিয়া দারুণ বিষাদে একটী তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া পুত্রকে সমুদ্র সলিলে ভাসাইয়া দেন। পরে ঐ পাত্র ভাসিতে ভাসিতে সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হইলে, রাক্ষসেরা উহা দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয় ও তাঁহাকে মিহির নাম প্রদান করতঃ খনার ন্যায় লালন পালন করিতে থাকে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মিহিরও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাক্ষসেরা মিহিরকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া খনার সহিত বিবাহ দেয়। তৎপরে উভয়ে ভারতবর্ষে আসিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। অনন্তর পিতাপুত্র বরাহ-মিহিরে পরিচয় হইলে, খনা শ্বশুরগৃহে আদরের সহিত গৃহীতা হন। জ্যোতিষে ইনি এতদূর পারদর্শিনী হইয়াছিলেন যে, ইনি অবলীলাক্রমে

জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় বলিয়া দিতে পারিতেন। বরাহ, রাজসভায় জ্যোতিষী ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁহার গৃহে গণনা করাইতে আসিতেন। বরাহ কোন গণনায় অসমর্থ হইলে, খনা গৃহমধ্য হইতে তাহার উত্তর দিতেন। এইরূপে খনার নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া বরাহের যশঃ ক্রমে হীনপ্রভ হইতে লাগিল। কথিত আছে, এই কারণে খনার প্রতি বরাহের দ্বেষ উপস্থিত হয়।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপন সভাপণ্ডিতগণকে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা গণনা করিতে বলায়, সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন। বরাহ পরদিবস নক্ষত্র গণিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, দুঃখিতমনে গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনীতে খনা শ্বশুরকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলে, বরাহ নক্ষত্র গণনা স্থির না করিয়া জলগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা শুনিয়া খনা মাটিতে কয়েকটী অঙ্কপাত করিয়া, নিম্নলিখিতরূপ নক্ষত্রসংখ্যা বলিয়া দিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন।

সাত সাত আরও সাত, সাতে দিয়া ভরা,
ভাত খাসে শ্বশুর ঠাকুর আকাশে এত তারা॥

বরাহ পরদিন রাজসভায় নক্ষত্রসংখ্যা বলিলে, রাজা তাঁহাকে নক্ষত্রগণনার সঙ্কেতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ খনা তাঁহাকে সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন। রাজা, খনাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য রাজসভায় আনিতে আদেশ করেন। কিন্তু কুলবধূকে রাজসভায় উপস্থিত করা অতিশয়

অপমানজনক বোধ করিয়া, বরাহ, মিহিরকে খনার জিহ্বাচ্ছেদন করিতে আদেশ করেন। মিহির নির্দ্দোষী স্ত্রীর প্রতি এ প্রকার গর্হিত আচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। খনা, নিজ মৃত্যুর সময়ও গণনা দ্বারা অগ্রে জানিতে পারিয়া, স্বামীকে পিতার আদেশ পালনে অনুরোধ করেন। জিহ্বা ছেদিত হইবার পর খনার মৃত্যু ঘটে।

খনার-রচিত একটী বচন।

দম্পতির মৃত্যুগণনা।

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে করি সমতা,
তিন দিয়ে হ'রে আন, তাতে মরা বাঁচা জান।
এক শূন্যে মরে পতি, দুই থাকিলে মরে যুবতী॥

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের নামের অক্ষর সংখ্যাকে দ্বিগুণ এবং মাত্রা-সংখ্যাকে (দীর্ঘ স্বরে দুই মাত্রা, লঘু স্বরে এক মাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণে অর্থাৎ হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে অর্দ্ধমাত্রা জানিবে) চারিগুণ করিয়া উভয় অঙ্ককে যোগ কর; তৎপরে সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ বা শূন্য অবশিষ্ট থাকে, তবে পতির মৃত্যু অগ্রে হয়, ২ থাকিলে স্ত্রী অগ্রে মরে।

লক্ষ্মীবাই

ইনি ঝাঁসির রাণী ছিলেন। রাজা গঙ্গাধর রাও ঝাঁসির শেষ রাজা, ইনি তাঁহার মহিষী ছিলেন। গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি অতি অল্প বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণকরতঃ কোম্পানির রেসিডেণ্টকে এই বলিয়া অনুরোধ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই বালককে তদীয় সিংহাসন প্রদান করতঃ লক্ষ্মীবাইকে রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার প্রদান করেন। তৎপরে লক্ষ্মীবাই স্বামীর মৃত্যুর পর সহগমন না করিয়া, দত্তকপুত্রের অভিভাবকস্বরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোম্পানির রেসিডেণ্ট দত্তক পুত্র অগ্রাহ্যকরতঃ ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজাধিকৃত করিতে উদ্যত হইলে, ইনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রেসিডেণ্টের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া শেষে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "মোর ঝাঁসি দেখে নেই?" কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, কোন ফল দর্শিল না। ঝাঁসি ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল। ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন ও কোম্পানির প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিল। তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইনি কোম্পানির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। সৈন্যপরিচালনের ভার ইনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, যোদ্ধৃবেশে অশ্ব-

পৃষ্ঠে সমরে নামিলেন এবং বিপুল পরাক্রমে বিপক্ষসৈন্যকে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কয়েক মাস তুমুলসংগ্রাম চলিল। পরে কল্পিনগরস্থ সেনানিবাস কোম্পানির হস্তগত হইলে ইনি ভগ্নমনোরথ হইলেন; কিন্তু আশা ত্যাগ করিলেন না,—পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ গোয়ালিয়রের নিকট পুনরায় যুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া, জীবন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইনি স্বীয় ভগিনীর সহিত বীরবেশে সৈন্যগণের নেতা হইয়া রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষীয় সেনাপতি সার হিউ রোজ বলিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন। লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে যেখানে বিপদ ও ঘোরতর সংগ্রাম, তথায় বিদ্যমান থাকিয়া সাহস, পরাক্রম ও রণনৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। হঠাৎ বিপক্ষের গুলি আসিয়া তাঁহার দেহে লাগায়, তিনি আহত হইয়া রণস্থলেই জীবলীলা সাঙ্গ করিলেন। সৈন্যগণ রণভূমে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া, ভারতের তেজস্বিনী বীররমণীর দেহ ভস্মীভূত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিল।

পদ্মিনী

পদ্মিনী প্রসিদ্ধ রাজপুত-মহিলা ছিলেন। ইনি চিলোনপতি হামির শঙ্খের দুহিতা ছিলেন। ইঁহার সহিত চিতোরাধিপতির পিতৃব্য ভীমসিংহের বিবাহ হয়। ইনি রূপগুণে অতুলনীয়া রমণী ছিলেন। তৎকালে ইঁহার তুল্য রূপবতী রমণী ভারতে আর কেহই ছিল না।

দিল্লীপতি আলাউদ্দিন, পদ্মিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের সংবাদে বিচলিতচিত্ত হন। তিনি পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য চিতোর অবরোধ করেন। দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিন মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য চিতোরদুর্গ সহজে হস্তগত করিতে পারিবেন; কিন্তু রাজপুতদিগের বীরত্বে তাঁহার সে আশা বিফল হইল। অবশেষে চতুরতা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি পদ্মিনীকে দর্শনমাত্র পরিতৃপ্ত হইয়া, সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভীমসিংহও স্বীকৃত হইলে, আলা দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক, দর্পণে পদ্মিনীকে দর্শন করিয়া এককালে বিমোহিত হইলেন। অতঃপর ভীমসিংহ সম্মান প্রদর্শনার্থ আলার সহিত দুর্গের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত গমন করিলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। তখন আলা, মহাহৃষ্ট হইয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে, তিনি

ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করিবেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া চিতোরবাসিগণ ম্রিয়মাণ হইল। কিন্তু রাজপুতবীর বা রাজপুত-রমণী বিপদাপদে কখন অভিভূত হন না। পদ্মিনী কৌশলপূর্ব্বক পিতৃব্য গোরা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। আলার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তি-লাভার্থ আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন।—তিনি পরিচারিকাবর্গের সহিত যবনরাজ-শিবিরে উপস্থিত হইবেন। শত শত শিবিকা নিরূপিত দিনে দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইল, তন্মধ্য হইতে জনৈক রাজপুতযোদ্ধা অবতরণ করিলে, ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে সেই শিবিকা চিতোরদুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, আলা সন্দিহানচিত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে রাজপুত বীরগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। আলা বিপক্ষদমনে অথবা পদ্মিনীলাভে বিফল প্রযত্ন হইয়া, ভগ্নমনোরথ হওত দুঃখিত মনে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর আলাউদ্দিন, অসংখ্য সৈন্যসহ পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। এবারেও রাজপুতবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিপক্ষসেনার আধিক্যপ্রযুক্ত দিন দিন হীন-বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহাদের শেষ উপায় অবলম্বন করা স্থির হইল। রাজপুতরমণীগণ যবনস্পর্শ অপেক্ষা অগ্নিস্পর্শ সুখজনক মনে করিয়া "জীবনব্রত"

উদ্‌যাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চিতোরবাসিনী মহিলাগণ অতি সন্তুষ্টচিত্তে জ্বলন্তচিতায় ভস্মীভূত হইয়া, যবনহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন। পদ্মিনী-প্রমুখ রমণীগণ সংসারের মায়া কাটাইয়া, আনন্দে পিতা, মাতা, স্বামী-পুত্রদিগের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া, মাঙ্গল্যগীতি গান করিতে করিতে, চিতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জ্বলন্ত-চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলে একযোগে গান করিতে করিতে চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ,
জুড়াবে মোদের প্রাণের জ্বালা॥
শোন্‌রে যবন শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল-শিখায়॥
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই॥
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজি সঁপিব জীবন।

ওই জীবনের শোন কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই ॥
জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ,
পশিব চিতায় রাখিতে মান ॥
ত্মাখ্‌রে যবন ত্মাখ্‌রে তোরা'
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাসি।
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী ॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়,
জ্বলন্ত অনলে সপিবারে কায়।
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ ॥
ত্মাখ্‌রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
ত্মাখরে চন্দ্রমা ত্মাখরে গগন।
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ,
জ্বলদ অক্ষরে রাখ গো লিখি ॥
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও ত্মাখরে,
সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ।
রাজপূত-সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥

অতঃপর মহিলাদিগের পরম ধন সতীত্ব রক্ষার জন্য সকলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মীভূত হইলেন। রাজপুত বীরগণ এই দৃশ্য দেখিয়া, উন্মত্ত হইয়া দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক শত্রুরক্তে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলাউদ্দিন ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণিহীন চিতোর অধিকার করিয়া, পদ্মিনীর ভস্মমাত্র পাইয়া সুখী হইয়াছিলেন।

অহল্যাবাই

অহল্যাবাই মালব প্রদেশের বিখ্যাত রাজ্ঞী। ইনি মলহর রাওর পুত্রবধূ এবং কন্তী রাওর স্ত্রী। পিতা বর্ত্তমানে কন্তীর মৃত্যু হয়। ১৭৬৭ খৃঃ মলহর রাওএর মৃত্যুর পর, তাঁহার পৌত্র মালিরাও মালবের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। নয়মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, অহল্যাবাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, ইনিও সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। অতঃপর তাহাদের সহিত ইঁহার সদ্ভাব হয়। ইনি পুরুষবেশে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে ইঁহার বড় অনুরাগ ছিল। কথিত আছে, যে সময়ে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে রাজকোষে দুইকোটী টাকা মজুত ছিল। ইনি রাজকোষ হইতে বাৎসরিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা নিজে ব্যয় করিতেন। ইনি এই বিপুল অর্থে দেশবিদেশে দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির ও নাটমন্দির ইঁহারই ব্যয়ে প্রস্তুত। উহার ন্যায় উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য ভারতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইনি ধর্ম্মকর্ম্মের সুবিধার জন্য, অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রমাবাই

ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে বোম্বের সন্নিকটে পশ্চিমঘাটের কিছু দূরে গঙ্গামল জঙ্গলে রমা ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত মিশ্র। রমার শিক্ষার ভার তাঁহার মাতার উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম অবস্থায় রমার হস্তে কোন পুস্তক দেওয়া হয় নাই। রমা মাতার মুখে ভাগবতের শ্লোক ও ব্যাখ্যা শুনিয়া, অতি শৈশবেই সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত মুখস্থ করিয়াছিলেন। অনন্ত মিশ্র, অল্পবয়সে প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে তিনি বিস্তর ঋণগ্রস্ত হন। এমন কি, তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়া, স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যা রমাকে সঙ্গে লইয়া, গঙ্গামল ত্যাগ করিয়া সাত বৎসর কাল নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। যখন তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন রমার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। তীর্থভ্রমণকালেও রমা অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। যখন রমার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর, তখন রমার পিতামাতার মৃত্যু হয়।

পিতৃমাতৃহীনা কুমারী কন্যা রমাবাই, নিরাশ্রয়া হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। রমা যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম—ভারতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকুমারীগণকে বিবাহের

পূর্ব্বে সংস্কৃত বা জাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিতা করিয়া, পরে বিবাহ দেওয়া উচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রমা কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃতকলেজ, ট্রেনিং একাডেমি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন্ প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মবিষয়ের বক্তৃতা দিয়া, নিজ অধীত বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাননীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও নবদ্বীপের ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতির সহিত রমা অনেক শাস্ত্রীয় বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। ইহাদের প্রদত্ত উপহার ও সরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা হইয়া রমা এলাহাবাদ গমন করেন।

অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে? এলাহাবাদে রমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কি ভাবিয়া রমা বিপিনবিহারী মেধাবী নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ জনৈক সূত্রধরকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর রমার গর্ভে সূত্রধরজাত এক কন্যা জন্মে। এই কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছে। ইহার নাম মনোরমা। বিবাহের ১৯ মাস পরে রমা বিধবা হন। পরে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম আর্য্যমহিলা সমাজ। সভার উদ্দেশ্য—বাল্যবিবাহ রহিত করা এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করা। বিলাতে গিয়া রমা ইংরাজীতে সুশিক্ষিতা হইয়া, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চেটেলহ্যামের লেডিজ কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসার হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রমা আমেরিকায় যান, এখনও তথায় রহিয়াছেন।

শেঠ-দুহিতা

জগতে জগৎ-শেঠের নাম সর্ব্বজন-বিদিত। এই ধনকুবের জগৎ-শেঠের অসামান্যা নামে একটী কন্যা ছিল, রূপ-লাবণ্যে ইহার সমান কেহ ছিল না বলিয়াই বোধ হয় জগৎ-শেঠ কন্যার নাম "অসামান্যা" রাখিয়াছিলেন।

অসামান্যার রূপলাবণ্যের কথা ক্রমে নবাবের কর্ণগোচর হইল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কুমারীর রূপ-তৃষ্ণার মোহে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইলেন, তিনি রমণীবেশে নিশীথকালে জগৎ-শেঠের প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। নবাব শেঠ-দুহিতাকে দর্শন করিয়াই তাঁহার রূপ-প্রভায় অন্ধ হইলেন, পরিণাম চিন্তা না করিয়াই তাঁহার কোমলাঙ্গে হস্তার্পণ করিলেন। হঠাৎ এরূপ ব্যবহারে ভীতা শেঠ-দুহিতা ব্যাধ-সন্ত্রস্তা কুরঙ্গীর ন্যায় পলায়ন পূর্ব্বক স্বামিসমীপে উপস্থিত হইয়া এই অপমান লাঞ্ছনার কথা বলিলেন। স্বামী শ্রবণ মাত্র শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিয়া পাপিষ্ঠের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। নবাব শেঠ-প্রাসাদ পার হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধৃত হইলেন। চর্ম্মপাদুকা প্রহারে, মুষ্ট্যাঘাতে এবং যবনসুলভ দীর্ঘ শ্মশ্রুর সবেগ সঞ্চালনে কোমলকায় নবাব অতিকষ্টে প্রাণমাত্র লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু এই দুঃসহ অপমান নবাবের হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইল।

একদা শেঠজামাতা রাজপথে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে

যবন-সেনানী আসিয়া তাঁহার মস্তক লইয়া চলিয়া গেল, রক্তমাখা দেহ রাজপথে পড়িয়া রহিল। ইহার অব্যবহিত পরেই রৌপ্য-পাত্রোপরি সমাচ্ছাদিত একটী উপঢৌকন লইয়া জনৈক ভার-বাহিনী অসামান্তার গৃহে উপস্থিত হইল এবং উপহারটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য-ব্যপদেশে বাহির হইয়া গেল। কুমারী কৌতূহল বশতঃ নিজেই পাত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন কি ভয়ঙ্কর! সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড! কুমারী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় সংবাদ পাইলেন—কে তাঁহার স্বামীকে পথিমধ্যে নিহত করিয়া মস্তক লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমারীর হৃৎপিণ্ড যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তিনি সেই সাধের উপঢৌকন ছিন্নমুণ্ডের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিকট চীৎকার পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনেক চেষ্টায় চৈতন্য সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের বিকৃতি দূর হইল না, ক্রমশঃ ঘোর উন্মাদিনীর লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। ধনকুবের জগৎ-শেঠ অজস্র অর্থব্যয়ে বিবিধ চিকিৎসা করাইয়াও কিছুই ফললাভ করিতে পারিলেন না। অসামান্তা প্রকৃতিস্থা হইলেন না। শেঠ-বংশ অশ্রুবিগলিত নেত্রে একবার হতভাগিনী কুমারীকে চাহিয়া দেখিত, আবার পরক্ষণেই রোষকষায়িত চক্ষে পিশাচপ্রকৃতি নবাবের প্রাসাদোপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত।

ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীও নবাবকে পরিত্যাগ করিলেন। পলাশীর যুদ্ধে নবাব পরাজিত হইয়া মুরশিদা-

বাদ হইতে পলায়ন করিলেন। অদৃষ্ট চক্র সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করে, সিরাজ ভগবান গোলায় ধৃত হইয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর-পুত্রের আদেশে মহম্মদীবেগ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ গজপৃষ্ঠে বিলম্বিত করিয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে ভ্রামিত হইল।

শেঠ-দুহিতা নরপিশাচ সিরাজের সেই ছিন্নমুণ্ড শবদেহের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মৃতদেহ কাহার? এখন ইহার উপর এত অত্যাচার কেন?" সখী বলিল—"আপনার স্বামী-হত্যাকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহ! পাপিষ্ঠ পাপের প্রতিফল পাইয়াছে"। অসামান্যা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বহুকালের সেবা-শুশ্রূষায় চৈতন্যলাভ করিয়া শেঠ-দুহিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই হইতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়ের আবেগে সর্ব্বদাই বলিতেন—"ভগবান্ আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য—অসম্পূর্ণ কার্য্য আমি সম্পূর্ণ করিব"।

একদা নিশীথে অসামান্যা একাকিনী সন্ন্যাসিনী বেশে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিলেন—আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, দয়াময় ভগবান স্বয়ং তাহা সম্পাদন করিলেন, সিরাজ নর-পিশাচ ঘোর পাপী হইলেও ভগবানেব দয়ার পাত্র, কারণ তিনি দয়াময়। অসামান্যার হৃদয় সিরাজের কোনরূপ মঙ্গল বিধানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন—যদি সিরাজের কোন ভালবাসার পাত্রের উপকার সাধনে সমর্থ হই, তবে প্রকারান্তরে সিরাজেরই উপকার করা হইবে। পরে শেঠ-দুহিতা ভগবান

গোলায় আসিয়া অবগত হইলেন যে, সিরাজ যখন পলায়ন করেন, তখন মেহেরুন্নিসা নামে একটী ষোড়শবর্ষীয়া গর্ভবতী বেগম মাত্র তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলেন। সিরাজ আদর করিয়া তাঁহাকে গুল (গোলাপ) বলিয়া ডাকিতেন। সিরাজ ধৃত হইলে রমণী অসহায় অবস্থায় তাঁহার অনুসন্ধান-কারিণীর সংবাদ পাওয়ায় প্রসূত কন্যাটীকে লইয়া গোপনে অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

দৈবাৎ একদিন ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাতের মধ্যে সিরাজমহিষী অসামান্যার উপস্থিতি সংবাদ পাইয়াই ভীতভাবে শিশুটীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমানা হইলেন, রাজকুমারী তাঁহাকে অভয়-দান পূর্ব্বক পশ্চাদনুসরণ করিলেন। একজন নাবিককে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া নবাব-মহিষী নৌকায় উঠিলে নাবিক নৌকা ছাড়িয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। সন্তরণদক্ষা শেঠ-দুহিতা উত্তাল-তরঙ্গময়ী নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থিত কন্যারত্নের সহিত সিরাজ-মহিষীকে প্রাণপণ চেষ্টায় তীরে আনি-লেন; চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না।—নবাবমহিষী চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছেন। বালিকাটীর চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু তাহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইল। অসামান্যা বালিকাটীকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন পল্লীমাঝে আসিয়া জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এখনও পূর্ব্ববঙ্গের গৃহে গৃহে অসামান্যা শাপভ্রষ্টা দেবীস্বরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন।

রাণী ভবানী

রাজসাহীর অন্তঃপাতী ছাতিল গ্রামে আত্মারাম চৌধুরী নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম ভবানী রাখিলেন। কন্যা ক্রমে বয়ঃস্থা হইলে ব্রাহ্মণ প্রাণপণ চেষ্টায় নাটোরের রাজা রাম-জীবন রায়ের পুত্র রামকান্ত রায়ের করে কন্যাটী সমর্পণ করেন। দরিদ্রের কন্যা রাজার বধূ হইল! রামজীবন পরমা সুন্দরী পুত্রবধূ পাইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

রাজা রাম-জীবন দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ১১৩৭ সালে (১৭৩৫ খৃঃ) কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। তখন অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্ক যুবক রাম-কান্ত সহধর্ম্মিণী ভবানীকে লইয়া যথাবিধি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। বিধিলিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য! দরিদ্রের কন্যা ভবানী পঞ্চদশবর্ষ বয়সে রাণী হইলেন। রামকান্ত নবীন যুবক, সময় পাইয়া চারিদিক হইতে দুষ্ট লোক সকল আসিয়া বন্ধুভাবে জুটিতে লাগিল, রামকান্ত আত্মীয় বোধে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পতিপরায়ণা রাণী ভবানী এবং প্রাচীন বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারাম ব্যতীত সেই বিশাল রাজপুরী মধ্যে রাজা রাম-কান্তের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেহ ছিল না।

নবীন রাজা রামকান্ত চাটুকার পারিষদদিগের প্ররোচনায় উৎ-

সন্নের পথে অগ্রসর হইলেন। রাণী ভবানী এ সংবাদ শুনিলেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন, তিনি যে পতিগত-প্রাণা সতী, পতির পদসেবা না করিয়া—পতির চরণামৃত পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি পতির কার্য্যে ভালমন্দ বিচার করা সতী রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। এদিকে পতির অধঃ-পতনের পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে লাগিল। রাজপুরীতে যখন যাহা কিছু হউক না কেন, সমস্তই রাণীর কর্ণগোচর হইয়া থাকে, ভবানী এ সংবাদও শুনিলেন। আর কতকাল ধৈর্য্য ধারণ করা যায়; রাণী বিচলিত—চিন্তিত হইলেন।

একদা ভবানী পতিপূজায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার মন বিচলিত হইল; তিনি ধৈর্য্যসহকারে নিত্য কর্ত্তব্য (পতিপূজা) সম্পাদন করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে স্বামীকে ভোজন করাইয়া বিশ্রামার্থ শয্যোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা রামকান্ত অচিরকাল মধ্যেই নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরক্ষণেই রাণী শুনিতে পাইলেন যে, রাজা দেওয়ান দয়া-রামকে অপমান পূর্ব্বক রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া-ছেন। রাণী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন,—স্বামীর নিদ্রাবসানে তদীয় পদযুগল ধারণ করিয়া অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনেক অনু-রোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না—রামকান্ত রাণীর কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, আপন মনে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বে দয়ারামের ভয়ে আমোদ প্রমোদটা গোপনে হইত, এখন

প্রকাশ্যভাবে দিবানিশি অস্বাভাবিক আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। ভবানী আর কি করেন, স্বামীর মঙ্গল কামনায় দিবা রাত্রি ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

এদিকে দয়ারাম মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট রামকান্তের কথা বলিলে, নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য সৈন্যসহ দয়ারামকে পাঠাইলেন। নবাবসৈন্য নাটোরে উপস্থিত হইল; রামকান্ত সংবাদ পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি কি করিবেন? তখন যুদ্ধ করিবার বা পরামর্শ দিবার জন্য সৈন্যগণ কি বন্ধুবর্গ কেহই ছিল না, সকলেই স্বার্থসিদ্ধি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাজা ভাবিলেন—কি ভয়ানক! সকলেই প্রতারক! সকলেই প্রস্থান করিয়াছে। তিনি হতাশপ্রাণে অন্তঃপুরে আসিলেন। রাণীর পরামর্শে রাজা রামকান্ত গর্ভবতী পত্নীকে লইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

জগৎশেঠ নবাবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাজাকে পরামর্শ দিলেন। রাণী প্রথমতঃ দয়ারামকে সন্তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া রামকান্তকে তদনুসারে কার্য্য করিতে বলিলেন। রাণীর পরামর্শে রাজা অল্পকাল মধ্যেই দয়ারামকে সন্তুষ্ট করিলেন। দয়ারাম যত সত্বর পারেন, রাজাকে পুনরায় নাটোরের অধীশ্বর করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। ফলে তাহাই হইল, দেওয়ানের বুদ্ধি-চাতুর্য্যে অচিরকাল মধ্যেই রাজা রামকান্ত পুনরায় রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রামকান্ত আর রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেন না,

প্রাচীন দেওয়ান দয়ারাম ও রাণী ভবানী রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

রাজা রামকান্ত পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির পর ১৬ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি ১১৬৩ সালে (১৭৫৬ খৃঃ) অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। রামকান্তের দুই পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্পদিন পরেই গতাসু হয়, রাণী এক্ষণে একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরীকে লইয়া সংসারী হইলেন। খাজুরা-নিবাসী রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারাসুন্দরীর বিবাহ হয়, কিন্তু রঘুনন্দনও অতি অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সংবরণ করেন। রাণীর সকল আশাই নির্ম্মূল হইল; আর কি করেন, বুদ্ধিবলে নিজেই রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তারাসুন্দরীর রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিতে দূত প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, রাণী স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নবাবসৈন্য আর স্থির থাকিতে পারিল না, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

কিছুদিন পরে রাণী চরিত্রবান্ রামকৃষ্ণকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নারীজাতি হইয়াও অলৌকিক কার্য্য সকল সমাধা করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

রাণী ভবানী ১২০৩ সালে (১৮১০ খৃঃ) ৭৯ বৎসর বয়সে পতির সহিত মিলিত হইলেন।

শিবাজি

ফলতানের নায়ক নিম্বলকর সাহজি ভোঁস্‌লের পুত্র শিবাজি দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার মাতার নাম জিজিবাই। জিজিবাই দৈব দুর্ব্বিপাকে শিবনের দুর্গে গর্ভিণী অবস্থায় বন্দিনী হন। তথায় তিনি ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহস্পতি বারে মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজিকে প্রসব করেন। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে পুত্রের নাম শিবাজি রাখেন।

শাহজি দাদোজি কোণ্ডদেব নামক একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে শিবাজির শিক্ষাভার ন্যস্ত করিলেন। শিবাজি অল্পকাল মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভারতের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন, ইহাই তাঁহার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের অঙ্কুর।

শিবাজি অদ্বিতীয় যোদ্ধা, সুতরাং যুদ্ধ-বিশারদ মালবজাতি তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিল। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে লিপ্ত, তখন শিবাজির বয়স ১৯শ বৎসর; তিনি সুযোগ বুঝিয়া রাত্রিকালে তোরণাদুর্গ অধিকার করিলেন। ইহাই মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি। এই দুর্গের এক স্থান খনন করায় তিনি প্রভূত ধনরত্ন প্রাপ্ত হয়েন, পরে পর্ব্বতোপরি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ 'রায়গড়' নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অল্প-

দিন পরেই চাকন দুর্গ অধিকার করেন। এইরূপে তিনি অনেক বীর-পুরুষদিগকেও স্বপক্ষে আনয়ন করেন। অচিরকাল মধ্যেই শিবাজি চাকন ও নিরার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধিপতি হইলেন।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সে শিবাজি বিজাপুর-নৃপতির সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রীয় নেতাজী পালকর, ফিরঙ্গোজী নরশালে, তানাজী মালসুরে, মোরোপন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি বিখ্যাত বীরগণের সাহায্যে তিনি কাগেরী, তিকোনা, লোহগড়, রাজমাটি, কুবারী, ভোরোপ, ঘনগড়, কোলনা প্রভৃতি দুর্গ সকল অধিকার করেন। এইরূপে শিবাজি কল্যাণ ও কোঙ্কণ প্রদেশের দুর্গ সকল অধিকারে আনিয়া হাবসী রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক কিছুদিন হরিহরেশ্বরে অবস্থান করেন। তথায় জনৈক সম্ভ্রান্ত বীর-পুরুষ তাঁহাকে একখানি তরবারি উপহার দেন, শিবাজি তরবারি খানিকে 'ভবানী' নামে আখ্যাত করিলেন। ইহাই তাঁহার আজীবন সহচর। ভবানী-তরবারি সহ যুদ্ধে উপস্থিত হইলে শিবাজিকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই।

বিজাপুর-রাজ ছল করিয়া শিবাজির পিতা শাহজিকে বন্দী করিলে শিবাজি সহধর্ম্মিণী সইবাইএর পরামর্শে দিল্লীশ্বর শাহজানের শরণ গ্রহণ করেন। শাহজান শাহজির মুক্তির জন্য বিজাপুরে পত্র দেন, শাহজি মুক্ত হইলেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজি জাবলী অধিকার করেন এবং শৃঙ্গারপুরাধিপতি সুরবে রাওকে আপন বশে আনয়ন করেন। সুরবে রাওএর সহিত শিবাজির বন্ধুত্ব হইল, তিনি সুরবে রাওএর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শিবাজির পিতা শাহজি পরলোকে গমন করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সুরাট আক্রমণ করেন ও এককোটি বিশলক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এসময়ে শিবাজি রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং নিজনামে অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। অতঃপর শিবাজি পর্ত্তুগীজদিগকে বশীভূত করিয়া সহসা বারসিলোর নগর আক্রমণ করেন। তখন শিবাজির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ! কারবা নগর-বাসী ইংরাজ বণিকগণও তাঁহাকে বার্ষিক ১১২০৲ টাকা কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজি গোয়া লুণ্ঠন পূর্ব্বক উত্তর কণাড়ায় আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরাধিপতি শিবাজিকে বার্ষিক পাঁচলক্ষটাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পন্‌হালা দুর্গ এবং কারবার প্রদেশের সমুদ্র-কূলোপবর্ত্তী জেলাসমূহ শিবাজির অধিকারভুক্ত হয়। বেদনোরের নরপতিও তাঁহাকে কর-প্রদানে স্বীকৃত হন।

১৫৯৬ শক বা ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা চতুর্থী দিবসে মহা-রাষ্ট্রকেশরী শিবাজি নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে উপবীত গ্রহণ করেন এবং শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে—রাজ্যাভি-ষিক্ত হয়েন। এই দিন হইতেই দাক্ষিণাত্যে শিবশক প্রচলিত হয়। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন জন্য শিবাজি প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন।

শিবাজি বিজাপুর জয় করিয়া হায়দ্রাবাদ, রামগিরি, দেবগড় প্রভৃতি আক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র চৌথ স্থাপন করিলেন। শিবাজি

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিরুদ্ধে প্রতিহিংসানল উদ্দীপিত করিয়া চারি বৎসরের মধ্যে অসীম পরাক্রমে মোগলসেনাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য সকল পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে সুরাট, দক্ষিণে বেদনোর ও হুবলী এবং পূর্ব্বে বেরার, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বেদনোরাধিপতি শিবাজির অধীন সামন্তরূপে অবস্থান করিতেছিলেন।

শিবাজির দুই পুত্র—শম্ভুজি ও রাজারাম। শম্ভুজি কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল হইলেও শিবাজি তাঁহাকে রাজকার্য্য পরিচালনের যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তোমরা দুই ভাই, উভয়ের মধ্যে কদাচ যেন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত না হয়। আমার অভাবে তোমরা পিতৃ-রাজ্য এইরূপে বিভাগ করিয়া লইবে।—তুঙ্গভদ্রা হইতে কাবেরী তীর পর্য্যন্ত তোমার এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত ভূভাগ রাজারাম পাইবে। অতঃপর তিনি মৃত সেনাপতি প্রতাপ রাওএর কন্যার সহিত পুত্র রাজারামের বিবাহ দিলেন। পরে কিছুদিন রাজ্যের কল্যাণকামনায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁহার জানুদ্বয়ে শোথ জন্মে, তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সপ্তাহ কাল রোগ ভোগ করিয়া ১৬০২ শকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে রবিবারে মহারাষ্ট্রকুলতিলক শিবাজী নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপসিংহ

প্রতাপসিংহ চিতোরাধিপতি রাণা উদয় সিংহের পুত্র, রাজপুত-কুলগৌরব মেবারের প্রসিদ্ধ রাজা। রাণা উদয় সিংহের অন্যতমা মহিষী শোণিগুরু রাজকুমারীর গর্ভে প্রতাপসিংহ (রাণা) জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অজেয় চিতোরপুরী আকবরের হস্তগত হইল। উদয় সিংহ চিতোরকে ভীষণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া চারি বৎসর পরে জীবনলীলা সংবরণ করেন। রাণার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল উদয় পুরের নূতন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শিশোদীয় রাজ-সিংহাসনে প্রতাপকেই অভিষিক্ত করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিয়া তদীয় মাতুল ঝালোরপতি এবং মেবারের প্রধান রাণা চন্দ্রাবৎ কৃষ্ণ উভয়ে তথায় আগমন করিলেন। বীর-দ্বয় জয়মল্লের বাহু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গদি হইতে নামাইয়া নিম্নাসনে বসিতে আদেশ করিলেন। পরে প্রতাপকে দেবীদত্ত খড়্গে সুসজ্জিত করিয়া তিনবার ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক মেবারপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

নবীন ভূপতি প্রতাপ জাতীয় প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন,—চিরবৈরী আকবর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি মারবার, বিকানীর, বুন্দিপতি,

অথবা তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সাগরজির ন্যায় মোগল চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া মাতৃস্তন্য কলঙ্কিত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন আকবর শাহের প্রবল প্রতাপ! বস্তুতঃই তখন অনেক রাজপুতবীর বাদশাহের করে স্বীয় কন্যা বা ভগিনী সমর্পণ করিয়া তদীয় অনুগ্রহভাজন হইতেন। প্রতাপ তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সেই পতিত রাজপুতগণের সহিত কখনও আহার বিহার বা কুটুম্বিতা স্থাপন করিবেন না সঙ্কল্প করিলেন। ক্রমে রাজপুতগণও তাঁহার শত্রু হইল, প্রতাপ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না।

জন্মভূমির দুরবস্থা দর্শনে প্রতাপ অত্যন্ত বিষণ্ণ, তিনি সকল প্রকার ভোগ বাসনা ও বিলাস-লালসা পরিত্যাগ করিলেন; স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পানভোজন পাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পতেরা অর্থাৎ পলাশ বা বটপত্রে নির্ম্মিত পত্র-বিশেষ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শয়নার্থ তৃণশয্যা অবলম্বন করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের সাহায্যে রাজ্যের বিধিনিয়ম সকল প্রণয়ন করিলেন। কমলমীরে প্রধান রাজপাট স্থাপিত হইল; নগরটী সকল প্রকারেই শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষণের উপযোগী হইল।

মানসিংহ শোণাপুর জয় করিয়া দিল্লী যাইবার পূর্ব্বে কমলমীরে আসিয়া প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করেন। প্রতাপ উদয় সাগর তটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থ একটী ভোজের অনুষ্ঠান হইল, রাজা ভোজনার্থ আহূত হইলেন; সম্বর্দ্ধনার জন্য তথায় অমরসিংহ দণ্ডায়মান রহিলেন।

মানসিংহ রাণা প্রতাপকে না দেখিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় অমরসিংহ পিতার শিরঃপীড়ার বিষয় জানাইলেন; কিন্তু মানসিংহের সন্দেহ নিরাকৃত না হওয়ায় তেজস্বী প্রতাপ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"যে ব্যক্তি তুর্কি হস্তে আপন ভগিনী সমর্পণ করিয়াছে এবং তুর্কির সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া থাকে, সূর্য্যবংশীয় রাণা তাহার সহিত পান ভোজন করা দূরে থাকুক, তথায় উপস্থিত থাকিতেও পারেন না।" মানসিংহ অবমানিত হইলেন, অন্ন স্পর্শ না করিয়াই আসন হইতে উঠিলেন। যাইবার সময় ইহার প্রতিশোধ লইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন।

সংবাদ সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইল, তিনি আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। লীলাক্ষেত্র হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন। ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ হল্‌দীঘাট-মহা-যুদ্ধের অবসান হয়। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়—সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বের একবিংশতি বর্ষে মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ বর্ষে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ভগবান্ দাস প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ঐ বৎসরেই সম্রাট আকবর মানসিংহকে পাঁচ সহস্র সেনাবল দিয়া কীকার (প্রতাপের অপর নাম) বিরুদ্ধে গোগুণ্ডা ও কমলমীর দখল করিতে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে প্রতাপের পক্ষে রামেশ্বর গোলিয়ারী ও তৎপুত্র শালিবাহন এবং চিতোর-পতি জয়মল্লের পুত্র রামদাস নিহত হন। পরিশেষে প্রতাপও পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে প্রতাপের সহায়

সম্বল ক্ষয় হইতে লাগিল, তিনি মেবার ও চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুতীরস্থ প্রাচীন সগদী রাজধানীতে শিশোদীয় কুলের গৌরব-পতাকা স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সামন্ত ও স্বজনগণের সহিত আরাবলী পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় সচিব ভামশা রাশীকৃত ধনরত্ন লইয়া প্রতাপের চরণে অর্পণ করিল। প্রতাপ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই প্রতাপ উদয়পুর হস্তগত করিলেন। মোগল সম্রাট্ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রতাপ উদয়পুরে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন, চিতোরের 'কাঙরা' গুলি নয়নপথে পতিত হইলেই তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত। বস্তুতঃ প্রতাপের শরীর জীর্ণশীর্ণ হইল, তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও প্রতাপের অন্তঃকরণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতেছিল। সালুম্ব্রাধিপতি তাঁহার ঈদৃশ ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "মহারাজ, অন্তিম সময়েও এরূপ কষ্ট অনুভব করিতেছেন কেন?" উত্তরে প্রতাপ বলিলেন—এত কষ্টে যে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন হইল, তাহা যেন আর তুর্কহস্তে নিপতিত না হয়।

প্রতাপের জীবনে চিতোরের উদ্ধার সাধনরূপ একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি রাজ্যহীন রাণা হইয়া প্রাণপণে মেবারের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। চিতোর লাভ ও স্বজাতির স্বাধীনতা প্রতাপের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা না হওয়ায় তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়াও আজীবন মনোদুঃখে কালযাপন করিয়াছেন।

একারণ তিনি কখনও রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই। সামন্তগণ তাঁহার দুঃখবার্ত্তা অবগত হইয়া অসি স্পর্শে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, "তাঁহারা অমরসিংহের পক্ষপূরণ করিয়া মেবারের সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং যতদিন না মেবার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তদবধি কোন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, ভবযন্ত্রণার অনেক লাঘব হইল। দেখিতে দেখিতে ভারতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রাণা প্রতাপসিংহ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সপ্ত-দশ পুত্রের সমক্ষে অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইলেন; কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

প্রতাপের মৃত্যুর পর চিরন্তন প্রথানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অমর সিংহ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ সেন

লক্ষ্মণসেন অতিশয় পরাক্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। বিখ্যাত কবি জয়দেব ইঁহার সভায় বিরাজ করিতেন।

ইনি বঙ্গের সেনবংশীয় শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গের রাজধানী ছিল। ইনি বৃদ্ধবয়সে মন্ত্রিগণের উপর সমুদায় রাজ-কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। পশ্চিম-ভারত যবনগণের অধিকৃত হইলে, ইনি আপন রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। কথিত আছে যে, ইঁহার প্রধান মন্ত্রী অক্রূর অর্থে অথবা স্তোভবাক্যে বশীভূত হইয়া, "বঙ্গদেশ কলিতে যবন-অধিকারভুক্ত হইবে" বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা প্রতিপাদিত করেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন শাস্ত্রীয় বচনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। শত্রুগণ দেশ আক্রমণ করিলে, পলাইবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল। বখ্‌তিয়ার খিলিজি ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে, অশীতিবর্ষ-বৃদ্ধ রাজা, পরিবারগণের সহিত খিড়কির দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। অতঃপর ইনি বিক্রমপুর উপনীত হইয়া, তথায় জীবনের অবশিষ্টকাল নিরাপদে যাপন করেন।

লক্ষ্মণসেন বঙ্গের খ্যাতনামা নরপতি। ইঁহার পিতার নাম বল্লালসেন। ইনি সেন-বংশীয়রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। লক্ষ্মণ ১১০১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

স্বর্গীয় কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাস কায়স্থ কুলোদ্ভব 'দেব' উপাধি বিশিষ্ট ছিলেন। ইনি বাঙ্গালায় মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের অনেক স্থানে এই দেব উপাধির বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীন কায়স্থেরা দাস বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া ইনিও সকল স্থানে কাশীরাম দাস বলিয়া নিজ নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণী নামে এক পরগণা আছে। ঐ পরগণার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী নামক নদীর সন্নিকট সিঙ্গি নামক এক গ্রাম আছে, উক্ত সিঙ্গি গ্রাম কাশীরাম দাসের বাসভূমি ছিল। মুদ্রাকরের দোষে আজকাল মহাভারতে সিঙ্গি গ্রাম স্থলে সিদ্ধি গ্রাম প্রায় সকল মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এটী সিঙ্গিগ্রাম হইবে, সিঙ্গিগ্রাম ছাড়া আর ইন্দ্রাণী মধ্যে কুত্রাপি সিদ্ধি গ্রাম নাই, এ গ্রাম কাটোয়ার সন্নিকট। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর ও পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত। এই কমলাকান্তের চারি পুত্র ছিল, কাশীরাম দাস তাঁহার তৃতীয় পুত্র।

কাশীরাম দাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই নাই। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস প্রভৃতির রচনা কাশীরাম দাসের পূর্ব্ব-লিখিত, কারণ ইঁহাদের ভাষা অপেক্ষা কাশীরাম

দাসের ভাষা অনেক অংশে মার্জ্জিত, স্পষ্ট, সরল ও ইহাতে শব্দ-গত বৈষম্যও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে কাশীরাম দাসের পুত্র তদীয় পুরোহিতকে নিজ বাস্তু বাটী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানপত্র এক্ষণে গলিত ও ছিন্ন বস্ত্রে আঁটা আছে মাত্র, অনেক স্থলে পড়া যায় না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি কাশী-রাম দাসের পুত্র ১০৮৫ সালে দানপত্র স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, তবে সম্ভবতঃ সন ১০০০ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইলেই প্রায় তিন শত বৎসর হইল কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মহাভারত মধ্যে কোন স্থানে এরূপ উল্লেখ নাই, যদ্দ্বারা ঠিক তিনি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন সময়েই বা গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা জানা যায়। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ ও কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনা অপেক্ষা কাশীরাম দাসের রচনা অবশ্যই আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ উক্ত কবি সকলের রচনায় যত অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দের ব্যবহার এবং ভাষাগত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারতে তত দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থে যত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, অপেক্ষা কৃত আধুনিক গ্রন্থে তত পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক উল্লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা মহা-ভারতে পাঠান্তর অল্প আছে। এই সকল কারণে প্রমাণিত হইতেছে যে, কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী কবি।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর॥"

এইরূপ প্রবাদ আছে যে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কতদূর লিখিবার পর কাশীধাম দাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু সিঙ্গি গ্রামবাসী অনেকের মুখে শুনা গিয়াছে যে, কাশীরাম দাস বিরাট পর্ব্বের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন। সেই জন্যই এবং কাশীধামের সহিত স্বর্গের উপমা দেখাইবার জন্যই কাশী-ধামকে স্বর্গপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ফলতঃ ঐ পর্য্যন্ত লিখিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, এস্থলে এরূপ অর্থ নয়। কাশীরাম দাসের এক জামাতা ছিলেন, তিনি তাঁহার উপর ঐ গ্রন্থ সমাপ্তির ভার দিয়া কাশীরাম যাত্রা করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। জামাতাও বিরাট পর্ব্বের তাঁহার লেখার পর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সমাপ্ত করেন। এই জামাতার লেখা দেখিয়া কেহই পূর্ব্ব লিখিত পর্ব্ব কয়েকটী অন্য ব্যক্তির রচনা বলিয়া ধরিতে পারেন না। এবং ঐ সকল লেখার এমন কোন বৈষম্য নাই, যদ্দারা উহা জামাতার বলিয়া জানা যায়। ফলতঃ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

মহাভারতের ন্যায় এবম্বিধ সুবৃহৎ ছন্দোবন্ধ বিশিষ্ট গ্রন্থ কাশীরাম দাসের পূর্ব্বে বা পরে কেহই রচনা করিতে পারেন নাই।

"শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার॥"

এই শ্লোক পাঠে অনেকে বলেন, যে কাশীরাম কথকতা শুনিয়া মহাভারত রচনা করেন ও তিনি সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু এ কথায় আমাদের বড় আস্থা নাই; কারণ কাশীরাম দাস ব্যাস-দেবের ভূরি ভূরি প্রশংসাতেই তাঁহার সকল ভণিতা পর্য্যবসিত করিয়াছেন।

কাশীরাম দাসের মহাভারত মূল সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ না হউক, ব্যাস-রচিত মহাভারত অবলম্বনে যে লিখিত, এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ কাশীরাম দাসের মহাভারতে এমন কোন স্থল নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। আর তাঁহার রচনা মধ্যে স্থানে স্থানে এমন সকল সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখনী হইতে নিঃসৃত হওয়া সম্ভবপর নহে।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ আট বৎসরকাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও দশ বার জন সংস্কৃতজ্ঞ প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে এবং বিপুল অর্থব্যয়ে যে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সমাপন করিয়া-ছিলেন; সামান্য ধনহীন কাশীরাম দাস বেদব্যাসের আদৌ সাহায্য না লইয়া সেই সমগ্র মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায়, কেবল কথকের মুখে শুনিয়া সমাপন করিয়াছেন, একথা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

কাশীরাম দাস মহাভারত ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই; যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, মহানুভব স্বর্গীয় কাশীরাম দাস খ'ড়ো ঘরের ছেঁড়া চেটায় বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া বেদব্যাসকে যে জীবিত রাখিয়াছেন ও নিজ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ অমৃত-মাখা লেখনী-প্রসূত কবিত্ব-পূর্ণ অবিনশ্বর দুর্ল্লভ-রত্ন দ্বারা দোকানী, পসারী, মুদী, পাকালী, চাষা হইতে গৃহস্থ ধনীর ঘর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট মাতৃ-ভাষা বিশেষ ঋণী—এ কথা কে না স্বীকার করিবে ?

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার পাণ্ডুয়া গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্র মুখটী বংশ-সম্ভূত রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের চারিপুত্র। চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন, দয়ারাম এবং ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে (১১১৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র নারায়ণ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননীর কোপ দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হন। ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দশবৎসর বয়সে ব্যাকরণ ও অভিধানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় তিনি মণ্ডলঘাট পরগণার সারদা নামক গ্রামের কেশরকুণি আচার্য্য বংশীয় নরোত্তম আচার্য্যের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। পরে হুগলীতে আসিয়া দেবানন্দপুর-নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট পারস্যভাষা শিক্ষা করেন।

একদা ভারতচন্দ্র উক্ত মুন্সীদিগের বাটীতে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করিলেন এবং সভায় যাইয়া তাহাই পাঠ করিলেন। এই রচনাই ভারতের প্রথম রচনা। তিনি চৌপদীতে আর একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথিও রচনা করেন,

কোন খানি প্রথম রচিত, তাহা বলা যায় না। তবে শেষোক্ত গ্রন্থে দেখা যায়—"সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ উহা ১১৩৪ সালে লিখিত। অনন্তর ভারতচন্দ্র পুরুষোত্তমে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবন গমনে অভিলাষী হইয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত পদব্রজে খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ৺গোপীনাথ জীউকে দর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এই সময় নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান এবং মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। ভারত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাজ-সভায় উপস্থিত হন ও মধ্যে মধ্যে দুই একটী কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করেন। ভারতের রচনা-নৈপুণ্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করিলেন।

১১৫৯ সালে রাজার অনুমতিক্রমে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ভাষা কবিতায় 'অন্নদামঙ্গল' বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন এবং জনৈক ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইয়া তাহা লিখিতে লাগিলেন। নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ক ঐ সকল পালাভুক্ত গীতের সুর, রাগ ও পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন রাজসভায় তাহা গান করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশে অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর তিনি 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন।

একদা রাজাদেশে ভারতচন্দ্র আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গঙ্গা-তীরে বাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে মূলা-যোড়ে বাস করিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং বাটীর নিমিত্ত ১০০৲ একশত টাকা ও ৬০০৲ ছয়শত টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া মূলাযোড় গ্রাম ইজারা দিলেন। ভারত সহধর্ম্মিণীর সহিত শুভক্ষণে মূলাযোড়-গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভারতের পিতাও মূলায়োড়ে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান-পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রচনা-নৈপুণ্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পারস্য, ব্রজবুলি, হিন্দী, সংস্কৃত ও যাবনিক ভাষাতেও কবিতা রচনা করিয়া তত্তৎ ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৬৮২ শকে (১১৬৭ সালে) ৪৮ আটচল্লিশ বৎসর বয়সে মহাকবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় বহুমূত্র রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও হিন্দী মিশ্রিত বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব চণ্ডী নাটক রচনা করেন। ভারতের তিন পুত্র; তন্মধ্যে মধ্যম পুত্র রামতনু রায়ের পৌত্র অমরনাথ রায় ও তাঁহার দুইটী পুত্র মাত্র বর্ত্তমান আছেন। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।

দাশরথি রায়

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বাদমুড়না গ্রামে ৺দেবীপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ঔরসে ১৭২৬ শকে (ইং ১৮০৪ খৃঃ) দাশরথি রায় জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই শীলাগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন এবং বাঙ্গালা পাঠশালাতেই চিঠা, পৈঠা, খতিয়ান প্রভৃতি জমীদারি সেরেস্তার লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পরিশেষে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইয়া, শাঁকুয়ের নীলকুঠীতে একটী কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ও কবিতানুরাগী ছিলেন এবং ইচ্ছানুযায়ী কবিতা ও সঙ্গীতাদি রচনা করিতে পারিতেন। তৎকালে শীলাগ্রামে জাকাবাই নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের কবির দল ছিল। দাশরথি নীলকুঠীর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া উহাদের দলে সঙ্গীতাদি বাঁধিয়া দিতেন। একদিন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে যৎপরোনাস্তি গালাগালি খাইয়া বাটীতে আসিলে, তদীয় জননী সেই সকল কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়া কহিলেন, "বাবা দাশু! লোকে বংশের মুখোজ্জ্বল হইবার জন্য সৎপুত্র কামনা করে; কিন্তু আমি এম্নি সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম যে, তাহা হইতে আমার বংশের কলঙ্ক হইতে আরম্ভ হইল।" দাশরথি মাতার বাক্যে সেই দিন হইতেই কবির দল ছাড়িলেন এবং

শীলার কতিপয় সমবয়স্ক যুবকের সহিত মিলিত হইয়া, একটী সখের পাঁচালীর দল করিলেন। পরিশেষে ইহাই তাঁহার জীবনোপায় হয় এবং সেই হইতেই তাঁহারও "দাশুরায়" এই নাম খ্যাত হইয়া উঠে।

তিনি বিস্তর সঙ্গীত ও পাঁচালীর পালা রচনা করিয়াছিলেন। বটতলার মুদ্রাকরগণ তাঁহার সমস্ত পাঁচালীগুলি মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৬ খৃঃ) ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিলেন, তিনিও গত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী অদ্যাপি জীবিতা আছেন। দাশরথির সঙ্গীত ও পাঁচালীর ছড়াতে কবিত্বের নূতনত্ব ও ভাবের পারিপাট্য এবং হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসের বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার কবিত্বে বিশেষ লালিত্য ও মাধুর্য্য আছে বলিয়াই তাঁহার সঙ্গীত বঙ্গের দ্বারে দ্বারে গীত হয়। তাঁহার দুই একটী গীত জানেন না, এমন লোক বাঙ্গালায় দেখা যায় না।

রামনিধি গুপ্ত

ইনি জনসাধারণে নিধুবাবু বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতার কুমার-টুলি নামক স্থানে ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি বর্গীর হাঙ্গামায় প্রপীড়িত হইয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী সন্নিহিত চাঁপতাগ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে গিয়া বাস করেন। নিধুবাবু উক্ত হরিনারায়ণ কবিরাজের ঔরসে ১৬৬২ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবুর পিতা, পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পুনরায় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া, একটী পাদ্রির নিকট নিধুকে ইংরাজী শিখিতে দেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি চাঁপতার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক প্রকার পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। ইনি ১৬৮২ শকাব্দায় শুকচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। বিবাহের ২।৪ বৎসর পরেই নিধুবাবু ছাপরার কালেক্টরী আফিসে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ছাপরায় অনেকগুলি হিন্দুস্থানী ওস্তাদ গায়কের সহিত ইঁহার আলাপ হইল এবং তদবধি ইনি সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। ইনি নিজ স্মৃতি-শক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায়বলে অল্পদিনের মধ্যেই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গজল প্রভৃতি কালোয়াতি সুর সকল অনায়াসেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

নিধুবাবু সুপুরুষ ও সুগায়ক ছিলেন। ইনি হিন্দী খেয়াল, টপ্পা,

ধ্রুপদ সকলের সুর ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধুস্রাবী টপ্পাগুলি সমধিক আদরণীয়। ইঁহার প্রণয়-সঙ্গীত ব্যতীত অন্য প্রকার সঙ্গীত অল্পই আছে। সম্প্রতি ১২৭ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "বসাক-প্রেসে" তদীয় জীবনী ও সমালোচনাসহ সমগ্র গীতাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি ১৭৫৭ শকাব্দায় ৯৫ বৎসর বয়সে চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ

হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটিগ্রাম নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ রামপ্রসাদ সিংহের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীর ঠন্‌ঠনে নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষই মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের পিতা। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (১২২১ সালের আশ্বিন মাসে) রামগোপাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

রামগোপাল প্রথমতঃ শারবোরণ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে অধ্যয়নের বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার তাঁহাকে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার উপায় করিয়া দিলেন। তিনি নিরাপদে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামগোপাল হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন হিন্দু কলেজের অনেক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোসেফ নামে জনৈক ইহুদী বণিক্ আপন কার্য্যালয়ে সহকারী নিযুক্ত করিবার জন্য এণ্ডারসন্ সাহেবের নিকট একটী কার্য্যদক্ষ লোক চাহিয়া পাঠাইলেন। এণ্ডারসন্ ডেবিড্ হেয়ারের প্রতি এ বিষয়ের ভার ন্যস্ত করিলেন। ডেবিড্ হেয়ার রামগোপালকেই উপযুক্ত মনে করিয়া তথায়

পাঠাইয়া দিলেন। যোসেফ্ রামগোপালকে পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি-লাভ করিলেন। রামগোপাল সতের বৎসর বয়সে এই প্রথম বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

রামগোপাল অল্পবয়সে ইংরাজী ভাষায় এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার সমান বক্তা আর কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাণিকতলার একাডেমিক এসোসিয়েসন্এ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে বাগ্মিপ্রবর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। রামগোপাল জ্ঞানান্বেষণ নামক পত্রিকার সাময়িক লেখক ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ লুপ্ত হইলে তিনি 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়-পরিত্যক্ত বালকবৃন্দের মানসিক শক্তি পরিচালনের নিমিত্ত রামগোপাল "একুইজিসন্ অফ্ জেনারেল নলেজ্" অর্থাৎ 'সাধারণ জ্ঞান-অর্জ্জন সভা' নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন। এই সভায় রাজনৈতিক বিষয় সকল সমালোচিত হইত। জর্জ্জ টমসন্ ভারতবর্ষে আগমন করিলে, রামগোপাল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করায়, টমসন্ সভায় উপস্থিত হইয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং সভার কার্য্য-কলাপে মুগ্ধ হইয়া সভার উন্নতি বিধানে কৃতসঙ্কল্প হন, সভাটী অনতিকাল মধ্যেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। রামগোপাল পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সভাটীকে "দি বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে আখ্যাত করিলেন।

রামগোপালের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া যোসেফ্ তাঁহাকে এত-

দূর বিশ্বাস করিতেন যে, ইংলণ্ড যাইবার সময় কার্য্যালয়ের সমস্ত ভার রামগোপালের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া যাইতেন। যোসেফ্ ও কেল্‌সেল্ সাহেব এই অংশী দ্বয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা পৃথক্ হইলেন, রামগোপাল এণ্ডারসনের পরামর্শে কেল্‌সেলের নিকট থাকিলেন। কেল্‌সেল্ তাঁহাকে আপনার অংশী করিলেন। "কেল্‌সেল্ ঘোষ এণ্ড কোং" কার্য্যালয়ের নাম হইল। কিছুকাল পরে কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ কেল্‌সেলের সহিত রাম-গোপালের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় রামগোপাল লভ্যের অংশ স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যালয় পরিত্যাগ করিলেন এবং "আর জি ঘোষ এণ্ড কোং" নামে একটী নূতন কার্য্যালয় সংস্থাপন করিলেন। বর্ত্তমান "বৃটিস্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসান্" সভাটী মহাত্মা রামগোপাল ঘোষেরই অসীম অধ্যবসায়ের ফল। রামগোপালের হস্তে অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত ছিল; হুগলী কলেজ সংস্থাপনে রামগোপালই প্রধান উদ্যোগী। পূর্ব্বে দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকগণ সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই শুক্রবার টাউন-হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় ৭।৮ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। রামগোপাল এই বিরাট সভায় এক-খানি কেদারার উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, তাহার ফলেই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ সিবিল্ সার্ব্বিস পরীক্ষায় অধিকারী হইলেন। রামগোপালের অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে এই-রূপ দেশহিতকর অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

রামগোপাল কলিকাতায় একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং জাষ্টিস্ অফ্ দি পিস্ ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর রাম-গোপাল যে রাজভক্তিসূচক বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়াই "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" নামক পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল বাঙ্গালী না হইলে মহারাণী তাঁহাকে সম্মান সূচক "নাইট" পদ প্রদান করিতেন।

রামগোপালের পীড়িত অবস্থায়ই তাঁহার কন্যাটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র সন্তানের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু এ মর্ম্মবেদনা তাঁহাকে অধিক কাল ভোগ করিতে হইল না, কিছুদিন পরেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী তারিখে ৫৩ তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে বঙ্গের গৌরব-রবি রাম-গোপাল ঘোষ চিরকালের জন্য অস্তমিত হইলেন। মৃত্যুর অল্প-দিন পূর্ব্বে রামগোপাল একখানি দানপত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও স্বজনবর্গকে বহু সম্পত্তির অধিকারী করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটিতে ২০০০০৲ কুড়ি হাজার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া যান। রামগোপালের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম শুনেন নাই—এরূপ লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উল্লিখিত মহাত্মা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুকলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ইংরাজী-ভাষায় ও আইন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বদেশের হিতসাধন ও শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যেই ইনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি অশেষগুণে গুণবান্ বলিয়া, রাজ-সকাশ হইতে "ভারত-নক্ষত্র" উপাধি লাভ করেন। ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন-শিক্ষার্থ মৃত্যুকালীন তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। ইঁহার সৎকার্য্য ও তদুদ্দেশে ব্যয় অসম্ভব। ইঁহার এক-মাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ইনি তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে সমস্ত সম্পত্তির অধি-কারী করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মহানগরী কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন, সম্ভ্রমশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি অল্পই ছিল। ইনিও আইনশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ভারতে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ইনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী তারিখে বিলাত যাত্রা করেন ও তথায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক সম্মানিত ও আদৃত হন। ইঁহার বড়মানুষি খরচ দেখিয়া, বিলাতের অধিবাসিগণ ইঁহাকে উল্লিখিত প্রিন্স (কুমার) উপাধি প্রদান করেন। প্রথম ইনি ৮ মাস বিলাতবাসের পর স্বদেশে আইসেন ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিলাত যান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংলণ্ডেই ইনি জীবনলীলা শেষ করেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১০ খৃষ্টাব্দে (সন ১২২৫ সালে) বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ পিতার তৃতীয় পুত্র। দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াই দুর্গাচরণ পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে উত্থিত হইয়া ইতিহাস ও গণিতশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় হইতেই তাঁহার সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস কমিতে থাকে।

দুর্গাচরণ বহুপরিবারের প্রতিপালক পিতার দৈন্যাবস্থা দূর করিবার মানসে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি একুশ বৎসর বয়সে মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

একদা দুর্গাচরণের স্ত্রী হঠাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে দুর্গাচরণ ডাক্তার লইয়া বাটী আসিবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে দুর্গাচরণ অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। ক্রমে শোকের উপশম হইলে, "সুযোগ্য

চিকিৎসকের অভাবই এই বিষময় ফলের কারণ” ইহা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তরভাবে অঙ্কিত হইল, তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুশীলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রেই মনোনিবেশ করিতে হইল। পাঁচ বৎসর কাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া দুর্গাচরণ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হইলেন। এই সময় “মেসার্স জার্‌ডিন্ স্কিনার এণ্ড কোংর” তদানীন্তন মুচ্ছুদ্দি বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকবর্গ প্রায়ই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, দুর্গাচরণ তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন যে, ইহাতেই ইনি আরোগ্য লাভ করিবেন। পরে তখনকার প্রধান চিকিৎসক জ্যাক্‌সন্ সাহেবকে আনান হইল। সাহেব রোগীকে এবং দুর্গাচরণের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দুর্গাচরণের ব্যবস্থাই ঠিক থাকিল। সুব্যবস্থিত ঔষধের গুণে অল্পকাল মধ্যেই রোগী আরোগ্য লাভ করিলেন। সাহেব দুর্গাচরণের করমর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে “নেটিভ্ জ্যাক্‌সন্” উপাধি প্রদান করিলেন। এই হইতেই দুর্গাচরণের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে খাজাঞ্চির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

২৮ বৎসর বয়সে দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর

করিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুর্গাচরণ অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে—ভারতবর্ষের জনৈক গবর্ণর জেনারেলের সহধর্ম্মিণী একদা সঙ্কটাপন্ন নারী-রোগে আক্রান্ত হয়েন, সাহেব ডাক্তারগণের বহু চেষ্টায়ও কোন ফল দর্শিল না। সকলেই স্থির করিলেন—রোগ দুরারোগ্য। অবশেষে দুর্গাচরণ আসিলেন, তিনি রোগীকে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন—"আপনারা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রোগীকে আমার নিকট রাখিয়া গৃহান্তরে অবস্থান করুন"! তখন দুর্গাচরণ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়া গবর্ণর-পত্নীকে রোগমুক্ত করিলেন। ক্ষণকাল পরেই গবর্ণর-পত্নী সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিমুক্ত! দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং ডাক্তার দুর্গাচরণকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আরোগ্যের বিষয় দুর্গাচরণের জীবনে অনেক সংঘটিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ জাতিভেদ মানিতেন না, পৌত্তলিকতায় তাঁহার আস্থা ছিল না, এজন্য পিতার সহিত তাঁহার তত সদ্ভাব ছিল না; তিনি স্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত অন্য বাটীতে থাকিতেন। ক্রমে দুর্গাচরণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, বিশেষতঃ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পরে পুত্রপ্রেরিত পত্র পাঠে অবগত হইলেন যে, কমিশনারগণ এ বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন; ইহাতে দুর্গাচরণের নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু হায়! কালের

গতি রোধ করে, কার সাধ্য! পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই শুভ সংবাদটী আর তাঁহাকে শুনিতে হইল না, তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভীষণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন; ছয়দিবস জ্বর, পরিশেষে কাসরোগে অবসন্ন হইয়া ২২এ ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ দশটার সময় ডাক্তার দুর্গাচরণ পত্নী এবং পাঁচ পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া বায়ান্ন বৎসর বয়সে কালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—চিকিৎসাকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটী খসিয়া পড়িল।

রাজা রাধাকান্ত দেব

১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র ইংরাজী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা মহানগরীর বিখ্যাত রাজবংশে মহারাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দেবের ঔরসে রাধাকান্ত দেব স্বীয় মাতুলালয় সিমলাতে জন্ম-গ্রহণ করেন। রাধাকান্ত বাল্যকাল হইতে বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগী ছিলেন, তিনি অল্পকাল মধ্যেই সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য, ইংরাজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি-বংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্যার সহিত পৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন; ইহার ফলে রাধাকান্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন-সমাজের ১৩শ গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেবই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নীতিকথা ও ইংরাজীর অনুকরণে বানান বহি প্রচার করেন।

জগদ্‌বিখ্যাত শব্দ-কল্পদ্রুম নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াই রাজা রাধাকান্ত সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাকোষের মুদ্রাঙ্কণ শেষ করেন এবং ভারতবর্ষের, ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগী সুধীবর্গকে এই মহাগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। তিনি প্রত্যেক সাহিত্য সভাকেও

স্বীয় সঙ্কলিত এক একখানি মহাকোষ প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক সভাই তাঁহাকে Honorary ও Corresponding Member রূপে গ্রহণ করেন। রুষপতি জার ও ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকও তাঁহাকে সম্মান-সূচক একটী পদকযুক্ত স্বর্ণহার বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের হাত দিয়া পাঠাইয়া দেন। চেনের প্রত্যেক আঁকড়ীতে F VII অঙ্কিত ছিল। রাজা রাধাকান্ত প্রায় ৩৪ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইনি প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট রাধাকান্তকে রাজাবাহাদুর উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধান সমাধা করিয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে উহা উপহার পাঠান। মহারাণী তাঁহার এই অপূর্ব্ব উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ একটী পদক প্রদান করেন। পদকের এক-পৃষ্ঠে মহারাণীর উত্তমাঙ্গ ও অপর পৃষ্ঠে—From Her Majesty Queen Victoria to Raja Radha Kanta Bahadur খোদিত হইয়াছিল। মহারাণীর আদেশ ক্রমে ভারতসচিব সার চার্লস্ উড্ও তাঁহাকে পদকের সহিত সম্মান সূচক একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব Roy, As. Soc. of Great Britain & yreland সভার সদস্য, লিপ্‌জিকের German Oriental Society ও বার্লিনের, Roy. Academy of Sciences, কোপেন. হেগেনের

Roy. Soc. of Northern Antiguarias, সেণ্টপিটার্সবার্গের Imp. Academy of Sciences, বোষ্টনের American Oriental Society ও ভিয়েনার Kaserlichen Academyর সভ্য ছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে পবিত্র বৃন্দাবন ধামে গিয়া বাস করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর ভারত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক আগ্রানগরীতে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়; রাধাকান্ত নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করেন। তখন রাজাদেশে ভারত প্রতিনিধি তাঁহাকে K. C. S. I. উপাধি, ২১ পার্থাসের খিলাৎ এবং সম্মানার্থ হস্তী ও অশ্ব দান করেন। রাজার কণ্ঠস্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম ফ্রেডারিকের প্রদত্ত কণ্ঠহার ভারত-প্রতিনিধি স্বয়ং আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন। শুনা যায়, রাজা দরবার মণ্ডপে প্রবেশ করিলে ভারত প্রতিনিধি তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাধাকান্ত মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রেল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যবর্গকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া দ্বিতল কক্ষ হইতে নিম্নে নামিয়া আসেন, পরে তুলসী-কুঞ্জের ধূলিমধ্যে সমাসীন হইয়া শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি শনিবার অতি প্রাচীন মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র দিল্লীর নবাব্-সরকারে সৈনিক-বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া, রাজা উপাধি ও জায়গীর লাভ করেন। রাজেন্দ্রলাল বাল্য-কাল হইতেই দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, উর্দ্দু, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, লাটীন, ফরাসী ও জর্ম্মাণ-ভাষায় ক্রমে সুপণ্ডিত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী-সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি গভীর গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ সকল লিখিয়া, স্বদেশে ও সমুদয় সভ্যজগতে প্রচারিত করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডি, এল্, উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ইঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ রায় বাহাদুর এবং সি, আই, ই, উপাধি দান করেন। "বুদ্ধগয়া" "ইণ্ডোএরিয়ান" ও "উড়িষ্যার ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইঁহার চিন্তাশীল মস্তিষ্কপ্রসূত। মাতৃভাষার উপরও ইঁহার অভক্তি ছিল না। ইনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুলাই রবিবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ নামে একখানি গণ্ড গ্রাম আছে, ইহাই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম-ভূমি। ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স নবম বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই তদীয় পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতা প্রেরণ করেন; তিনি কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং অপূর্ব্ব ধীশক্তি প্রভাবে অল্পদিন মধ্যেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

পিতা অতিশয় দরিদ্র, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতেই দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সে বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত-রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক এবং তৎপর বর্ষেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইলেন। বিদ্যাসাগরের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সাধারণ বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভারও সমর্পণ করেন; সুচতুর বিদ্যাসাগর উভয়

কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে তিনি ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালাবিভাগে চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল, এই কুড়িটী বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার বিদ্যাসাগরের প্রতিই ন্যস্ত ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাত্মা বিদ্যাসাগরের সাহায্য অবলম্বন করিয়াই স্বীয় রচনা-প্রণালী তাদৃশ প্রাঞ্জল করিতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর আপন জন্মভূমি বীরসিংহে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, দরিদ্র বালক বালিকাগণ উহাতে অধ্যয়ন করিত। রাখাল বালকগণ দিনে আসিতে পারিত না, সুতরাং তাহারা যাহাতে রাত্রিতে আসিয়া পড়িতে পারে, বিদ্যালয়ে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও তথায় স্থাপন করা হইয়াছিল।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীও উহার সমর্থন করেন। তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাণ্ডিত্য প্রভাবে কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন পূর্ব্বক সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা, যাহাতে ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার হয়, তাহাই গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই মহাযুদ্ধে বিদ্যাসাগরই জয়লাভ করিলেন। বিদ্যাসাগরের আবেদন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিদ্যালয়েই সংস্কৃত শিক্ষা

প্রচারের আদেশ দিলেন। তখন বিদ্যাসাগর বালক বালিকাগণ যাহাতে সহজে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, এজন্য সহজ সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক সকল সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ গরীবদিগের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকেই দণ্ডায়মান হন, কিন্তু তিনি প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ ১৮৮৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ হইল। কয়েকটী বিধবা-বিবাহও হইয়া গেল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুলইনস্পেক্টরের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। পরে কিছুদিন অতীত হইলে মেট্রোপলিটন নামে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় নিজ তত্ত্বাবধানেই প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে কলেজ ক্লাস খুলিলেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে স্থাপিত ৫টী বিদ্যালয় ও একটী কলেজ এখনও বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালাভাষা সরল ও সুগম করিবার মানসে বিদ্যাসাগর অনেক পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি রচনা করেন। ১। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ২। বাঙ্গালার ইতিহাস। ৩। জীবন চরিত। ৪। বোধোদয়। ৫। উপক্রমণিকা ব্যাকরণ। ৬। ঋজুপাঠ (তিনভাগ)। ৭। ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম, ২য়, ৩য় ও

৪র্থ ভাগ)। ৮। শকুন্তলা। ৯। বিধবা-বিবাহ (১ম ও ২য়)। ১০। বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)। ১১। কথামালা। ১২। সংস্কৃত প্রস্তাব। ১৩। চরিতাবলী। ১৪। মহাভারতের উপক্রমণিকা। ১৫। সীতার বনবাস। ১৬। আখ্যানমঞ্জরী (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)। ১৭। ভ্রান্তি-বিলাস এবং ১৮। বহুবিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কি না)।

বাঙ্গালাভাষা বর্ত্তমানে যেরূপ বিশুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার আদি প্রবর্ত্তক বা প্রধান কারণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরোপকারিতা ও দানশীলতায় বিদ্যাসাগর সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। ইঁহার দান গুপ্তভাবেই সম্পন্ন হইত। বিদ্যাসাগরের মাতা অতিশয় দয়াশীলা ছিলেন, কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বিদ্যাসাগর সদাশয়া জননীর নিকট হইতে দানশীলতা ও পরদুঃখকাতরতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর পিতামাতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, পিতামাতাই ইঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন। পিতামাতার কথা উত্থাপিত হইলেই পুলকে বা ভক্তিতে বিদ্যাসাগরের হৃদয় প্রেমাশ্রু-পরিপূর্ণ হইত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ভারতবাসীকে চিরকালের জন্য শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র জীবনলীলা সংবরণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই মহানগরী কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নভেম্বর তারিখে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্যারীমোহন সেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন। প্রথমে ইনি মেট্রোপলিটন কলেজে কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠাভ্যাস করিয়া, ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ এপ্রেল তারিখে বালিগ্রাম নিবাসী চন্দ্রকুমার মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী গোলাপসুন্দরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। জর্জ টমসন সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া, ইঁহারও বক্তৃতা করিবার বাসনা বলবতী হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় হইতেই ইনি ধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। তথায় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট—এমন কি মহারাণীর নিকট বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া ও ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা উপহারস্বরূপ পাইয়া, ২০এ অক্টোবর তারিখে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ইনি 'সুলভ সমাচার' প্রচার করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দোকানী, পসারী ও

দরিদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি "কলুটোলা ইভ্‌নিং স্কুল" নামক একটী রজনী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

নির্ভীক, তেজস্বী, ধীর, মিষ্টভাষী ও সত্যনিষ্ঠ কেশবচন্দ্র বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন, সভা, পুস্তকপ্রচার প্রভৃতি দ্বারা বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারি বেলা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটের সময় ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন।

তিনি চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণা বাবু কুচ-বেহারের রাজ-কর্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং জ্যেষ্ঠ কন্যা কুচ-বেহারের মহারাণী হইয়াছেন।

কমল-কুটীরের দেবালয়ের সম্মুখে কেশবচন্দ্রের একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ইটালীদেশীয় বহুমূল্য প্রস্তরে গঠিত। এই কারুকার্য্য-খোদিত পরম মনোহর সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণে দেড় সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ লেখা আছে—

"শ্রীনববিধান।
শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।
জন্ম—সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৬০ শক।
স্বর্গারোহণ—মঙ্গলবার, ২৫ পৌষ, ১৮০৫ শক।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ ধর্ম্ম-বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বহু সভাসমিতির গঠন করিয়া উক্ত ধর্ম্মের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন। পরিশেষে, অধ্যবসায়ের সহিত কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীর বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এল্, এল্, ডি, উপাধি লাভ করেন। ইনি বহু-ভাষায় সুপণ্ডিত ও সদ্‌বক্তা ছিলেন ও অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইনি বহু দীনহীন দরিদ্রদিগকে অন্নদানে পরিতুষ্ট করিয়াছেন এবং অনেক দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইনি বিধর্ম্মী হইলেও পাণ্ডিত্যে ও সৎস্বভাবে হিন্দু-সমাজে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ভারতবাসীদিগকে অকূল-শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া চিরদিনের জন্য কালের কবলে পতিত হন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী

কাশিমবাজার নিবাসিনী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর মুক্তহস্ততা ও দানশীলতার কথা জগতে কে না জানে? মহারাণী স্বর্ণময়ী কুমার কৃষ্ণনাথের স্ত্রী। অতি শৈশবকালেই কৃষ্ণনাথ পিতৃহীন হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার অন্তঃকরণ যে প্রকার উন্নত ছিল, দানেও তিনি তদ্রূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতিহেতু ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারি সমস্ত বিষয়সম্পত্তি উইল করিয়া, গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। ইহাতে যে মহারাণী কেবল-মাত্র অল্পবয়সে বিধবা হইলেন, তাহা নহে—তিনি সাংসারিক অকূলসমুদ্রে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যৎসামান্য স্ত্রীধন ব্যতীত তিনি এখন পথের ভিখারিণী। একজন অতিশয় বুদ্ধিমান, কার্য্যতৎপর আত্মীয় যদি মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন না করিতেন, তবে মহারাণীর ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহা বলা যায় না। এই মহাত্মারই নাম রাজীবলোচন রায়। ইঁহারই পরামর্শে ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট আপন স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির দাওয়া করিলেন ও তজ্জন্য ইঁহাকে অনেক মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। পরে সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রমাণিত হইল যে, যখন কৃষ্ণনাথ উইল করেন, তখন তাঁহার মস্তিষ্ক খারাপ ছিল। পরে মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার স্বামী-ত্যক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ

অধিকারিণী হইয়া, অসীমবুদ্ধিসহকারে জমীদারির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত ইঁহার ন্যায় দানশীলা আদর্শরমণী জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট ইনি মহারাণী উপাধি লাভ করেন ও বংশ-পরম্পরায় মহারাজা উপাধি দিতে গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতমুকুট উপাধিতে ভূষিতা হন। এ পর্য্যন্ত কোন স্বাধীনরাজ্যের মহিষী ব্যতীত এই উপাধি অপর কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্বন্তরির দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বাল্যকালে ডভ্‌টন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া বি, এ, উপাধি গ্রহণ করতঃ বিলাত যাত্রা করেন। তথায় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হইয়া, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইনি প্রথমে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সিলেটে প্রেরিত হন। কিন্তু তথায় ইঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সদরল্যাণ্ড সাহেবের হুকুম অমান্য ও মিথ্যা ডায়েরি লেখা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কর্ম্মচ্যুত হন। সেই হইতে ইনি দেশহিতব্রতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, ভারতহিতৈষী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি-বক্তা। ইঁহার দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। “বেঙ্গলী” নামক সংবাদ পত্রের ইনিই সম্পাদক। এতদ্ভিন্ন ইনি অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। হাইকোর্টের জজ নরিসের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করায়, ইঁহার দুইমাস দেওয়ানী কারাবাসের আজ্ঞা হয়। ইনি ছোটলাটের সভার একজন সভ্য ছিলেন ও সীর উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি ৭৭ বৎসর বয়সে ২১শে শ্রাবণ ১৩৩২ সালে বারাকপুর ভবনে দেহত্যাগ করেন।

রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল

কৃষ্ণদাস পাল ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল। কৃষ্ণদাস প্রথমতঃ ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন করেন, পরে কিছুকাল রেভারেণ্ড মরগ্যান্ সাহেবের শিক্ষাধীনে থাকিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং গৃহে বসিয়া শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর হয়েন।

বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণদাস সংবাদ পত্রসমূহে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কলেজ পরিত্যাগের অনতিকাল পরেই তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল উহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হন এবং নিজেই সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা পুলিশের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অফ্ দি পিস, মিউনিসিপাল কমিসনার এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীর দরবারে তিনি রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন এবং তৎপর বৎসরেই "সি, আই, ই", উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

কৃষ্ণদাস পাল তেজস্বী, মনস্বী, উদার ও অহঙ্কারবিহীন পুরুষ ছিলেন। পরোপকারিতা, মহানুভবতা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই তিনি বাঙ্গালায় মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যপদে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণে সমগ্র বঙ্গ গৌরবান্বিত। প্রকৃত পক্ষে পালবংশাবতংস কৃষ্ণদাস বঙ্গভূমির যে কত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, এজন্য বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

চাকুরীপ্রার্থী হইয়া অনেকেই কৃষ্ণদাসের নিকট আগমন করিতেন। কৃষ্ণদাস সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া যাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, তাহারই উপায় বিধান করিয়া দিতেন।

১৮৬৭ সালে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। উড়িষ্যাবাসিগণকে এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কলিকাতার সেরিফ্ মহোদয়ের উদ্যোগে ঐ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী টাউন হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স মহোদয় সভার সভাপতি। এই দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ড হইতে লর্ড ক্রেনবরো লিখিয়া পাঠান যে, "ভারত ইংলণ্ডের নিকট এজন্য কোনরূপ অনুকূলতা চাহিতে পারেন না।" সুতরাং ভারতের অপরাপর স্থান হইতেই উৎকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। তখন মহাত্মা

কৃষ্ণদাস পাল দণ্ডায়মান হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে উৎকলবাসার আশা-লতাও পুষ্পফলে শোভিত হইতে লাগিল। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় রাজভক্তি-সূচক একটী বক্তৃতা করিয়া, উপসংহারে বলেন যে, যে ভারতবাসীর ধারাবাহিক দানশীলতা জগতে প্রসিদ্ধ, সেই পবিত্র আর্য্যবংশ-সম্ভূত মহানুভবগণ ভারতেশ্বরীর পরম প্রিয় প্রজা-বৃন্দের দুঃখমোচনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভারতের ধনকুবেরগণ জানিতে পারিলে উৎকলবাসীদিগকে আর দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু লর্ড ক্রেনবরোর সংবাদে আমরা একটী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছি ; এজন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। যাহা হউক, লর্ড ক্রেন্‌বরোর উপদেশ মতে—অপরের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া আপনাদিগের উপর নির্ভর করা—স্বাবলম্বন শিক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণদাস পাল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহামান্য গবর্ণর জেনারেলের সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়া প্রথম দিবসেই বলেন যে, আমি কেবল জমীদারদিগের প্রতিনিধি আসি নাই, দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দের এবং দুর্ব্বল পক্ষ সমর্থনের জন্যই এ সভায় আসিয়াছি।

কৃষ্ণদাস পাল একজন বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন, তিনি প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ও অটল অচল বিশ্বাস। কৃষ্ণদাসের দুই বিবাহ। একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া প্রথম পরিণয়ের পত্নী কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপর তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে

কৃষ্ণদাসের একটী মাত্র পুত্র হইলেও সন্তানটী অকালে কালকবলে পতিত হয়।

স্বদেশের উপকার সাধন, দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন, বিপন্নের উদ্ধার, অসহায় প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ—করুণার আকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের জন্য কৃষ্ণদাস 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়া অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শরীরকে রোগের আবাসভূমি করিয়া তুলিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল, তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমেই গুরু-তর ভাব ধারণ করিল, স্মিথ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই (বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালের ৯এ শ্রাবণ) বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের সময় কৃষ্ণদাস পাল ৪৫ বৎসর বয়সে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। বঙ্গের গৌরব-রবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল—সব ফুরাইয়া গেল।

কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর শবদেহ নিমতলা দাহঘাটে মহাসমা-রোহে নীত হইলে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্র নাথ দত্ত, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেব, টরণবুল, কিম্বার প্রমুখ মহোদয়গণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তখন দীন দুঃখী-দিগকে চাউল দাইল বিতরিত হইয়াছিল।

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর কলিকাতাস্থ কলেজষ্ট্রীটে হ্যারিসন রোডের চৌমাথার উপর ইঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র রায় ৺রাধাচরণ পাল বাহাদুরও তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে অণুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুর দিনও তিনি মিউনিসিপালিটির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তথা হইতেই অসুস্থ হইয়া বাটী আসেন ও সেই অসুখেই তাঁহার অতর্কিত মৃত্যু হয়। তিনি মিউনিসিপালিটির কমিশনার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং পুলিশ কোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর ভারত বিভাগে (Indian Section) সম্পাদক ও অন্যান্য নানাপ্রকার জন-হিতকর অনুষ্ঠানে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যখন বাংলায় একদল স্বর্গীয় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগের আন্দোলন করেন তখন তিনি ৺সুরেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী হইয়া রিফরম্ কাউন্সিলের সভ্য হন এবং সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কাঁচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২১৮ সালের ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবার মাতা শ্রীমতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকিলেও কবিতা লেখার সখ বাল্যকাল হইতেই তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তখন গ্রামস্থ প্রায় সকল বালকই পার্সী পড়িত, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদের মুখে পার্সী কবিতার অর্থ শুনিয়া নিজেই বাঙ্গালায় কবিতা বাঁধিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র মহেশচন্দ্র একজন সুকবি, তাঁহার সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের সর্ব্বদাই কবিতার লড়াই হইত।

ঈশ্বরের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পরে হরিনারায়ণ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। হরিনারায়ণ বিবাহ করিয়াই কর্ম্মস্থান শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠিতে চলিয়া যান। নববধূ বাড়ীতে আসিলে হরিনারায়ণের মাতাই তাহাকে বরণ করিতে যান, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া বিমাতার প্রতি একটী রুল ছুড়িলেন, ভাগ্যক্রমে তাহা তাঁহার গায়ে লাগিল না। হরিনারায়ণের অগ্রজ আসিয়া ঈশ্বরকে বিলক্ষণ প্রহার করিলেন, মাতামহ আসিয়া দৌহিত্র ঈশ্বরকে সান্ত্বনা করিলেন। নিজের মাকে ভুলিয়া অপরকে মাতৃ-সম্বোধন

করা ঈশ্বরের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তিনি কাঁচড়াপাড়া পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত জন্মকবি, সর্ব্বদা কবিতার চর্চ্চা করিতেন, কবিতাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, কবিতাই তাঁহার জীবন, সুতরাং বিদ্যা লাভ তাঁহার ভাগ্যে বিশেষ কিছু ঘটিল না, কবিত্বশক্তির পরিচালনেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। ঈশ্বরের শ্রুতি-শক্তিও কবিত্ব-শক্তিরই অনুগামিনী। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তিনি দেড়মাস-মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থসহ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত পঞ্চদশবর্ষ বয়সে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীকে বিবাহ করেন। দুর্গামণি দেখিতে তত সুশ্রী নয়—একপ্রকার হাবা বোবার মত, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে স্ত্রীর সহিত আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঈশ্বর ১২৩৭ সালের মাঘমাসে সংবাদ প্রভাকর নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন, পথুরিয়াঘাটা নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর এ বিষয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সাহায্য করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র মোহনের মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রভাকরও অস্তমিত হয়। তখন ঈশ্বরকে কবিত্ব-শক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক সংবাদ-রত্নাবলী নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা-

খানি কবি ঈশ্বর গুপ্তের সাহায্যে বেশ চলিতেছিল। পরে ঈশ্বরচন্দ্র পুরুষোত্তম দর্শনে গমন করেন। কিছুকাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক জনৈক দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া ১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং ২৭এ শ্রাবণ বুধবার হইতে কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর দৈনিক রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন দৈনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে প্রভাকরই স্বীয় প্রভায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১২৫৩ সালে তিনি পাষণ্ড-পীড়ন নামে আর একখানি সংবাদ পত্র বাহির করেন। তখন ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্ক-বাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য রসরাজ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই রূপে উভয়েই কিছুকাল কবিতার লড়াই করিয়া আপন আপন সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেন। ১২৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সাধুরঞ্জন নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় দশ বৎসর কাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, হরুঠাকুর প্রভৃতি প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবিদিগের জীবন-চরিত, গীত ও পদাবলী সকল প্রকাশ করেন। ১২৬১ সালে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও লুপ্তপ্রায় অনেক কবিতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালী কবি-গণের জীবন চরিতাদি উদ্ধার পক্ষে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখ প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১লা ভাদ্র তাহা সমাপ্ত করেন। পরে হিতপ্রভাকর ও বোধেন্দুবিকাশ নামক গ্রন্থদ্বয় প্রভাকরে মাসে মাসে প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রভাকরে তাঁহাদের প্রথম রচনা প্রকাশিত করেন। তাঁহাদের সাহিত্য-গুরু ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ রচনা সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ দেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আরম্ভ করেন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ মাত্র করিয়াই মৃত্যু শয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ রাত্রি দুই প্রহরের সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিলেন। জননী বঙ্গ-ভাষা তাঁহার একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন। ঈশ্বর চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্রই প্রভাকরের সম্পাদক হইয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ-নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত উকিল ৺রাজনারায়ণ দত্ত তাঁহার পিতা ছিলেন। মধুসূদন জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা শৈশবেই কালকবলে নিপতিত হন। মধুসূদন প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া পরে কলিকাতায় হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরাজী ও পারস্যভাষা শিক্ষা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মধুসূদন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার পিতা একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি পিতৃদত্ত অর্থে ৪ বৎসর কাল শিবপুর বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করতঃ মান্দ্রাজে গমন করেন। সেখানে ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি একজন উত্তম লেখক হইয়া উঠেন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যা, মাইকেলের আন্তরিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন। প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে তিনি "ক্যাপটিভ্ লেডী" এবং "ভিজন্স অব্ দি পাষ্ট" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। অনন্তর মাইকেল "এথিনিয়ম" নামক সংবাদ-পত্রের সহকারী সম্পাদক

হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মাইকেলের দক্ষতা দেখিয়া স্বদেশগমনকালে তাঁহাকেই সম্পাদকের গুরুভার অর্পণ করিয়া যান; তিনিও সুচারুরূপে সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদন মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকের কার্য্য করতঃ ১৮৫৬ খৃঃ সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে নিজ দক্ষতাগুণে তত্রত্য ইণ্টারপ্রিটারের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের অনুরোধে রত্নাবলী নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। মধুসূদন মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন এরূপ শুনা যায়, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগসঞ্চার হয় এবং ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে তিনি শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটিকা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ ও কৃষ্ণকুমারী নাটিকা এই নয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন-পূর্ব্বক প্রকাশ করেন।

এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও মধ্যে মধ্যে মাইকেলের প্রবন্ধাদি বাহির হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষে বদান্যবর মহানুভব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থসাহায্যে মধুসূদন আইন-শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। মধুসূদনের অতিশয় স্বদেশানুরাগ ছিল। মাতৃভূমি পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি বঙ্গভূমির প্রতি বিদায় জন্য যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই ১২৯৬

"My Native Land Good-night !" Byron.

"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবননদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজনে।

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা-জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।”

ইউরোপপ্রবাসী হইয়াও মধুসূদন মাতৃ-ভাষাকে এখনকার বাঙ্গালী-সাহেবদের মত ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বিজাতীয়ের মধ্যে থাকিয়া ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। বঙ্গ-ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা এই প্রথম রচিত হয়। অতঃপর যথাসময়ে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবিবর স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি যেরূপ প্রতিভাবলে সাহিত্যজগৎ উজ্জ্বল করিয়া নির্জীব বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইয়া তাহাকে প্রাণবতী করিয়া গিয়াছেন, আইন ব্যবসায়ে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি শেষ বয়সে হেক্টরবধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদন সংসারে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ অর্থ কষ্ট তাঁহাকে আজীবন ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কিছু ব্যয়বাহুল্যও ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অনেকটা গোল্ড-স্মিথের ন্যায় ছিল বলিয়া, তাঁহার সহিত অনেকে তুলনা করেন। তাঁহার দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বেই পত্নী বিয়োগ হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জুন রবিবারে পত্নী-বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবিকুল-চূড়ামণি মহানুভব মাইকেল মধুসূদন দত্ত দুইটী পুত্রকে অনাথ করিয়া, আলিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ইহলীলা শেষ করেন। মাইকেলের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গভূমি যে মহারত্ন হারাইয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাহার পূরণ হইল না। ইঁহার মৃত্যুতে কবিগণ শোক করিয়াছেন। কবির ক্ষমতা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাও শোক করিয়াছেন। আর বিধর্ম্মী বলিয়া যাঁহারা কবির মর্য্যাদা করেন নাই, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ। মাইকেলের চরিত্র সমালোচনা করা বৃথা; দোষগুণ বিচার যে করে করুক, আমরা তাঁহার প্রদত্ত রত্ন যাহা পাইয়াছি, তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে কি দিতে পারিয়াছি? যাহা লোকে অসম্ভব ভাবিত, মাইকেল তাহার সম্ভব করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বঙ্গ-ভাষায় হইতে পারে কে ভাবিয়াছিল? যাহা হউক, মাইকেলের মৃত্যুতে বঙ্কিম চন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন—

“যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।”

দীনবন্ধু মিত্র

১২৩৬ সালের চৈত্রমাসে দীনবন্ধু মিত্র কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিনী গ্রামই দীনবন্ধুর পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসস্থান, কিন্তু ইহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র চৌবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। কালাচাঁদ দীনবন্ধুকে গন্ধর্ব্ব নারায়ণ বলিয়া ডাকিতেন।

কালাচাঁদের অবস্থা তত ভাল ছিল না, দরিদ্রতানিবন্ধন পুত্রকে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপন না হইতেই অতি সামান্য বেতনে জমীদারি সেরেস্তায় কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। পুত্রের চাকুরী ভাল লাগিল না, তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলেন এবং লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। লঙ্ সাহেবের স্কুল হইতে হেয়ার স্কুলে, পরে জুনিয়ার স্কলারসিপ বৃত্তি পাইয়া হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন ও সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঠ্যাবস্থায়েই দীনবন্ধু রচনা আরম্ভ করেন। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীনবন্ধুর রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বস্তুতঃ

দীনবন্ধুর প্রায় কবিতাই কবিত্বহিসাবে যে ঈশ্বর গুপ্তের ছাঁচে ঢালা, ইহা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু হুগলির বাঁশবেড়ে গ্রামে বিবাহ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ১৫০৲ শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। কার্য্যদক্ষতার গুণে এক বৎসরের মধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের প্রধান সহকারী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাকের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লুসাইযুদ্ধে প্রেরিত হন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমেই 'কমলে কামিনী' রচনা করেন। এই সময় তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

দীনবন্ধু যখন পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষ-রূপে অবগত হইয়াছিলেন। নীলদর্পণ প্রকাশের ইহাই মূলভিত্তি। দীনবন্ধু মানব চরিত্র, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জুইবারিক, জামাই ষষ্ঠী, বিজয় কামিনী, নবীন-তপস্বিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে লঙ্ সাহেব ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ করেন। এজন্য সাহেব তখন কারারুদ্ধ হন, কিন্তু পরে অনেক ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। যাহা হউক, নীলদর্পণ প্রকাশ করিয়া দীনবন্ধু ভারতেশ্বরীর বঙ্গীয় প্রজাবৃন্দের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, সুরধুনী, জামাই বারিক প্রভৃতি গ্রন্থও কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের লেখনী-প্রসূত। তিনি গ্রন্থ লিখিয়াই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণই অর্থাভাব। সর্ব্বপ্রথমে লিখিত কমলে কামিনী তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিম ও দীনবন্ধু উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয়সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তাই দীনবন্ধু বঙ্কিমকে নবীন-তপস্বিনী, বঙ্কিম দীনবন্ধুকে মৃণালিনী উপহার দিয়াছিলেন। বাস্তবিক দীনবন্ধু রচনা-নৈপুণ্যে আপামর সাধারণের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু যে কেবল কবিত্ব হিসাবে উন্নত ছিলেন, তাহা নহে। সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্ব্বব্যাপী স্বাভাবিক সহানুভূতি তাঁহাকে আরও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর রায় বাহাদুর কবিপ্রবর দীনবন্ধু মিত্র ৪২ বৎসর ৮ মাস বয়সে বহু-মূত্ররোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার আটটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্র বাল্যকালেই কলিকাতা খিদিরপুরে আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং জুনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র ও এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পরীক্ষার্থ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সংসারের তাড়নায় তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হইতে হয়। স্বীয় প্রতিভাবলে ঐ কার্য্য করিতে করিতেও তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাবড়া ও শ্রীরামপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন, এই সময়ে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে বিবাহ করিয়া চিরস্থায়িভাবে খিদিরপুরেই বাস করিতে লাগিলেন।

মুন্সেফী কার্য্য আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্র বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য আদেশ করায়

তাঁহার মাতামহী তাহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর হেমচন্দ্র ওকালতীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালত ও পরবর্ত্তী হাইকোর্ট তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল।

ওকালতিতে হেমচন্দ্র যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট উকীল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিলে হেমচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট সিনিয়ার প্লীডার পদে মনোনীত হন, এই সময় হইতেই হেমচন্দ্রের কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে তিনি শান্তিরসে পরিপূর্ণ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইল। ১২৭২ সালের ৩১এ বৈশাখ তিনি 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশ করেন এবং অব্যবহিত পরেই তাঁহার কবিতাবলীর বিকাশ।

অতঃপর হেমচন্দ্রের আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎপর তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বল-রত্ন বৃত্র-সংহার মুদ্রিত হয়। বৃত্রসংহারে কবির কবিত্ব স্থানে স্থানে যেরূপ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদনের উক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বই কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ৺কাশীধামে বসিয়া অন্ধাবস্থায় লিখিত চিত্তবিকাশই কবিবর হেমচন্দ্রের শেষ কীর্ত্তি। কবিবর হেমচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব রচনা! কি গভীর ভাব! পড়িবামাত্রেই পাঠককে আত্মহারা হইতে হয়। এমন সুন্দর সরল প্রাঞ্জলভাষা তাদৃশ কবির লেখনী না হইলে সম্ভবে কি?

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে,
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে !

তারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে !
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

এই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কতদিন ক'রেছি !
কতবার প্রমদার মুখ-চন্দ্র হেরেছি !

পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা আর
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে র'য়েছি !
কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার
সে আমার আমি তার অন্য কারো হব না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলায়,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হ'লো না।

লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হ'য়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।

চিন্তা হ'লো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।
হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল,
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।
তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না;
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—
আরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না?
এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হ'লো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম!
ভাবিতাম আমি দুঃখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল হায়, কেন চ'খে দেখিলাম।
এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিন-মুখী অই তরুতলে রে;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে,
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে,
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে?
সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে;

কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হ'য়েছি, নাথ" !
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।
বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,
শুনিলাম মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে !"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !"

ওকালতী ব্যবসায়ে ও পুস্তক বিক্রয়ে হেমচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও পর-দুঃখ-বিনাশে মুক্ত-হস্ত ছিলেন বলিয়াই একটী কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তাহার ফলে তাঁহাকে বৃদ্ধাবস্থায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে হেমচন্দ্র পরদুঃখে কাতর হইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ অজস্র ব্যয় করিতেন, সেই হেমচন্দ্রই বৃদ্ধ অন্ধাবস্থায় অন্নকষ্টে পতিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালের কি কুটিল গতি ! একদিন যাঁহার অন্ন শৃগাল কুক্কুরে খাইয়াও শেষ করিতে পারিত না, আজ তাঁহাকে কি না অন্নের জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইল ! সময়ে সকলই করিতে পারে ! যাহা হউক, ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ কবিবর হেমচন্দ্রের জ্বালা যন্ত্রণা সব ফুরাইল—তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

১২২৭ সালে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ কুপী গ্রামে কায়স্থ বংশে বঙ্গের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার দত্ত জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। পিতামাতার গুণে অক্ষয়কুমারের মনে আশৈশব সাধু ও ধর্ম্মভাব জাগরূক ছিল। ইনি গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া পার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। দশ বৎসর বয়সের সময় ইনি কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া কলিকাতাস্থ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইলে, ইনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উনিশ বৎসর বয়সে ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনস্থ পাঠশালায় মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে লিখিতে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হন। তৎপূর্ব্বে সেরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ কখন বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই। ইনি দক্ষতার সহিত দ্বাদশ বৎসরকাল ঐ পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। পরে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য, ইনি শিরঃপীড়া রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন। অক্ষয়কুমার পীড়াগ্রস্ত হইয়া, বালীতে উদ্যান-বাটী নির্ম্মাণকরতঃ বাস করিতেন। ইনি উদ্যানের

জন্য নানাবিধ উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি এক সময় বলিয়াছিলেন, উদ্যানটী তাঁহার পাঠের ৪র্থ ভাগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। ইনি পীড়ার নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া ১২৯৩ সালে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মানবলীলা সংবরণ করেন। অক্ষয়কুমারের লেখনী-প্রসূত চারুপাঠ ৩য় ভাগ, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দুইভাগ ও ধর্ম্মনীতি অক্ষয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে হুগলী ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া, শেষে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি "রায় বাহাদুর" এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "সি, আই, ই," উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি কর্ত্তব্যকার্য্য অতি যত্নের সহিত সমাধা করিতেন এবং বিচার-কার্য্যে স্বদেশী, বিদেশী, ধনী, নির্ধন সকলকে আইনের চক্ষে সমান দেখিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি বাঙ্গালাভাষায় পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া "ললিতা" ও "মানস" নামক দুইটী ক্ষুদ্র কবিতা প্রণয়ন করেন। ইহার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহার লেখায় ও কল্পনায় বঙ্গবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে আরো কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া, ১২৭৯ সালে "বঙ্গদর্শন" নামে নূতন ধরণের মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। বহুকাল দক্ষতার সহিত এই পত্রিকার

ইনি সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের উপন্যাসলেখক-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার কয়েকখানি উপন্যাস এত মধুর যে, বিলাতে সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থগুলিও অতি উৎকৃষ্ট এবং গভীর। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ১৩০৯ সালে ২৬এ চৈত্র ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। চব্বিশখানি গ্রন্থ যথা—১। ললিতা মানস ২। দুর্গেশনন্দিনী ৩। বিষবৃক্ষ ৪। আনন্দমঠ ৫। কপালকুণ্ডলা ৬। চন্দ্রশেখর ৭। দেবী চৌধুরাণী ৮। সীতারাম ৯। মৃণালিনী ১০। রজনী ১১। ইন্দিরা ১২। কৃষ্ণ-চরিত্র ১৩। রাজসিংহ ১৪। কমলাকান্তের দপ্তর ১৫। লোক-রহস্য ১৬। পদ্য গদ্য ১৭। কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮। ধর্ম্মতত্ত্ব ১৯। বিবিধ প্রবন্ধ (১ম, ২য় ভাগ) ২০। বিজ্ঞান রহস্য ২১। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ২২। মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত ২৩। যুগলাঙ্গুরীয় ২৪। রাধারাণী।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। ইনি বারেন্দ্র-শ্রেণীয় বাৎস্যগোত্র-সম্ভূত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার গুণে বশীভূত হইয়া তদানীন্তন প্রায় সকলেই ইঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কার্ত্তিকেয় রায় একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ইঁহার সাত পুত্র ও একটী কন্যা। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল এই কার্ত্তিকেয় রায়ের সপ্তম পুত্র। কন্যাটী সর্ব্বকনিষ্ঠা। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ কৃষ্ণনগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহারা সিদ্ধ-শ্রোত্রীয়—সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

দ্বিজেন্দ্র প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই পড়াশুনা করেন। কৃষ্ণনগরের Anglo Vernacular School হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমশঃ তিনি গৌরবের সহিত এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজীতে অনারে এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় সিরেন্সেষ্টার কলেজে প্রবেশ করিয়া কৃষিবিদ্যানুশীলনে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষায় Lyrics of Ind নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন ও ইংরাজী সঙ্গীত বিদ্যা

শিক্ষা করেন ও পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া F. R. A. S, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হন।

দ্বিজেন্দ্র ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালার সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন এবং সমাজে প্রকাশ্য ভাবে গৃহীত না হওয়ায় অতি তীব্র ভাষায় 'একঘরে' নামক পুস্তক রচনা করেন।

বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত হন। তিনি সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে সার্ভে ও সেট্‌লমেণ্টের কার্য্য শিক্ষার্থ গমন করেন। ইং ১৮৮৪ সালের ২১ এ সেপ্টেম্বর তিনি মজঃফরপুরে বদলি হইলেন, কিন্তু তখন তিনি অত্যন্ত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া কিছু কালের জন্য বিনা বেতনে ছুটী লইলেন। ১৮৮৮ সালের ১লা জানুয়ারী কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিলেন। ১৮৯৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়া দিনাজপুরে গমন করেন। ১৮৯৪ সালের ১৮ই অগষ্ট তিনি আবকারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ সালের মার্চ্চ মাসে ল্যাণ্ডরেকর্ডস্‌ এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আবকারী বিভাগের কমিশনরের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। ১৯০২ সালের ২৯ এ নবেম্বর' অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিজেন্দ্রের পত্নী 'একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার (মণ্টু) এবং কন্যা মায়াদেবীকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। দ্বিজেন্দ্র তখন কর্ম্মক্ষেত্রে—বিদেশে ছিলেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়াই এই নিদারুণ শোকে মর্ম্মাহত

হইলেন। কিন্তু শিশু পুত্র কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া শোক সংবরণ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে খুলনায় গমন করেন, তথা হইতে কিছুদিন বহরমপুরে তৎপর গয়ায় কিছুকাল কার্য্য করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি ১৫ মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় 'সুরধাম' নামে বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই বাস করিতে থাকেন। ১৯০৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হন, ক্রমে বাঁকুড়া ও মুঙ্গেরে বদলি হন, এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তিনি ১৯১৩ সালের ১২ মার্চ্চ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে তিনি যে একজন নবরসে রসিক কবি ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার লিখিত "বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত (বহুত আচ্ছা), ত্র্যহস্পর্শ, পাষাণী, তারাবাই, সীতা ও আষাঢ়ে" নামক পুস্তকগুলি বস্তুতঃই হাস্যরসোদ্দীপক। ১৯০৬ অব্দে কবি Crops of Bengal নামে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন। কবি-প্রণীত 'প্রতাপ সিংহ' নামক নাটকই তাঁহাকে নাট্য জগতে জীবিত রাখিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন, সোরাব-রোস্তাম, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, পুনর্জন্ম, পরপারে ও আনন্দবিদায় নামে নাটক এবং মন্দ্র, আলেখ্য ও ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য), Lesson in English (শিশুপাঠ্য পুস্তক) ভীষ্ম, চিন্তা ও কল্পনা, আমার দেশ,



শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়

পৃঃ—৪৪২

আমার ভাষা ও শোকগীতি প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কবিবরের গীতাবলী এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। বস্তুতঃ কবি-বর এই সকল গ্রন্থ ও গীতাবলী প্রণয়ন করিয়া জগতে আপনাকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রের সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী সন্তান হয়, তন্মধ্যে তিনটী শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। দুইটী মাত্র সন্তান (দিলীপকুমার ও মায়া) অদ্যাপি জীবিত আছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অপরাহ্ন ৫টার কিছু পূর্ব্বে কঠিন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্বজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ

আলেকজাণ্ডার—ম্যাসিডনের বিখ্যাত রাজা। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫৬ অব্দে রাজা ফিলিপের ঔরসে এবং ওলিম্পিয়ার গর্ভে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি অতি যত্ন পূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি হোমরের লেখা বড় ভাল বাসিতেন। বিংশতি বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বরাজ্য বিস্তার ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধকরতঃ, এসিয়া জয় করিতে মনস্থ করিয়া, দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করেন। ইনি ক্রমে সিরিয়া, প্যালেস্ টাইন, পারস্য ও ইজিপ্ট জয় করেন। অতঃপর ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তক্ষশীলার রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনকরতঃ পাঞ্জাবের রাজা পুরুকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইনি অনেক কষ্টে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু পুরুর বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি মগধরাজ্য আক্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইঁহার সৈন্যগণ তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে ইনি ব্যাবিলনে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

গ্যালিলিও—বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক ও জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালিস্থ পাইসা নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি পেন্‌ডুলমের গতি আবিষ্কার ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি করেন। ইউরোপে প্রথমে ইনি পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন ও তজ্জন্য অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট নিগ্রহ ভোগ করিয়া ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন ।

হোমর—গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত কবি। ইনি অনুমান ৯ম হইতে ৮ম খৃষ্টাব্দ মধ্যে স্মির্ণা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত "ইলিয়াড" ও "ওডেসি" কাব্য লিখিয়া জগতে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। ইনি শেষজীবনে অন্ধ হইয়া স্বলিখিত কাব্য গান করিয়া জীবনযাপন করিতেন।

সেক্সপিয়ার—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠকবি সেক্সপিয়ার ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে ইনি যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পরে লণ্ডন নগরে গমনকরতঃ নাটক অভিনয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শেষে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে নিজ প্রতিভাবলে ইনি নাটককারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। অতঃপর বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ এবং অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইনি শেষজীবন জন্মস্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। সেক্সপিয়রের রচনা লালিত্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী, প্রাসাদময়ী এবং সর্ব্বোপরি মনস্তত্ত্বনিরসণী এবং ইংরাজী সাহিত্য ও জগতের সাহিত্যের আদর্শ।

মিল্টন——ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি মিল্টন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতি যত্নসহকারে ইনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, প্রথমে ইউরোপের দেশভ্রমণে বহির্গত হন। দেশে প্রত্যাগমন করতঃ শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ক্রম্ওয়েল, ব্রিটিশ রাজ-দণ্ড গ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ইনি গুরুতর পরিশ্রম-পূর্ব্বক অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সমাধা করিয়া-ছিলেন। শেষ অবস্থায় মিল্টন অন্ধ হইয়াছিলেন। অন্ধ অবস্থায়ই ইনি জগদ্বিখ্যাত "প্যারাডাইস্ লষ্ট" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

নিউটন——১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের জন্ম হয়। ইনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া, বিজ্ঞান-শিক্ষা করেন। পরে বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আবিষ্কার করিতে যত্নপরায়ণ হইয়া, প্রথমে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। পরে অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া, ইনি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নিউটন ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরলোক গমন করেন।

ফ্রাঙ্কলিন——১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি আমেরিকার বোষ্টন নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। দরিদ্র-সন্তান ছিলেন বলিয়া, ইনি দশ-বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগকরতঃ অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু ইনি চিরজীবন বিদ্যাচর্চ্চা করতঃ আত্মোন্নতি সাধন ও স্বদেশের উপকার করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যে এবং রাজ-

নৈতিক কার্য্যেও ইহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; বিশেষতঃ বিজ্ঞান চর্চ্চা ইহার প্রিয়কার্য্য ছিল এবং ঘুড়ির সাহায্যে ইনি মেঘের বৈদ্যুতিক তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে বিস্ময়াপন্ন করতঃ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইহজীবন ত্যাগ করেন।

নেপোলিয়ান—ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট্‌ নেপোলিয়ান ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্‌সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পনর বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। পরে দক্ষতার সহিত বিবিধ যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। অতঃপর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের বিদ্রোহ দমন করিয়া, ইনি নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান, ইটালির সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া, তথায় গমন করেন। দেড় বৎসর মধ্যে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া, তাহাদিগকে ইটালি হইতে বিতাড়িত করেন ও তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপিত হইলে, ইনি অদ্বিতীয় লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইজিপ্ট জয় করিতে গিয়া, তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে "কন্‌সল্‌" নাম গ্রহণ করিয়া, স্বদেশের রাজকার্য্যের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ফ্রান্সের বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ফ্রান্সের সম্রাট্‌ পদে অভিষিক্ত হন। ইনি ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৮১১

খৃষ্টাব্দে রুসিয়া দমন করিতে পাঁচলক্ষ সৈন্যসহ যাত্রা করেন। তথায় দারুণ শীতে, অনাহারে এবং যুদ্ধে সৈন্যদল ধ্বংসপ্রায় হইলে, ইনি অবশেষে পঁচিশ হাজার মাত্র সৈন্যসহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহার বিরুদ্ধে দশ লক্ষাধিক সেনাসহ ফ্রান্স আক্রমণ করেন। নিরুপায় দেখিয়া ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজাদিগের অনুমতিক্রমে এল্‌বাদ্বীপে গমন করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান এলবা হইতে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলে, সাধারণ লোকে ইঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া গ্রহণকরতঃ ইহার পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গ ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে ইনি ব্রিটিশ-সৈন্যের সহিত ওয়াটারলুতে সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় ১৮ই জুন তারিখে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার প্রাকালে জর্ম্মাণ সৈন্য ব্রিটিশের সাহায্য করিলে, ইনি পরাজিত হন। পরিশেষে ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, ইনি সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে কারারুদ্ধ হন। তথায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সমাপ্ত